# কুলায় ও কালপুরুষ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সিগনেট প্রেস । কলকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ

আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

গসেন এণ্ড কোম্পানি

৭।১ গ্রাণ্ট লেন

ব্লক

রূপমুদ্রা লিমিটেড

৪ নিউ বউবাজার লেন

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬১ ১ মির্জাপুর স্ট্রিট





দাম ৫'৫০ টাকা

আমার প্রথম শ্রোতাদের মধ্যে

যিনি সহৃগুণে ও অনুকম্পায় অদ্বিতীয় সেই

**শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের**

শ্রীকরকমলে

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| মুখবন্ধ | ... | ... | ক |
| রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা | ... | ... | ১ |
| রবিশস্য | ... | ... | ১৩ |
| ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ | ... | ... | ২৯ |
| স্বর্ধাবর্ত | ... | ... | ৫৫ |
| দিনান্ত | ... | ... | ৬৭ |
| উক্তি ও উপলব্ধি | ... | ... | ৭৫ |
| "অন্তঃশীলা" | ... | ... | ৮৫ |
| "চোরাবালি" | ... | ... | ৯২ |
| "বাংলা ছন্দের মূল সূত্র" | ... | ... | ১১৩ |
| শিল্প ও স্বাধীনতা | ... | ... | ১২১ |
| মনুষ্যধর্ম | ... | ... | ১৩৫ |
| অদ্বৈতের অত্যাচার | ... | ... | ১৫৫ |
| বিজ্ঞানের আদর্শ | ... | ... | ১৭৯ |
| উদয়াস্ত | ... | ... | ১৮৯ |
| আঠারো শতকের আবহ | ... | ... | ২০৫ |
| ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড | ... | ... | ২১১ |
| অনার্য সভ্যতা | ... | ... | ২২৯ |
| পিতা-পুত্র | ... | ... | ২৪১ |
| প্রগতি ও পরিবর্তন | ... | ... | ২৪৯ |

# মুখবন্ধ

অঙ্কশাস্ত্রের এক সার্বভৌম পণ্ডিত একদা আমাকে বলেছিলেন যে যথোচিত শিক্ষা পেলে, আমি হয়তো বিশুদ্ধ গণিতে অল্প-বিস্তর ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারতুম ; এবং আমার মতো কপট বিনয়ী সুদ্ধ মানতে বাধ্য যে উক্ত মন্তব্য দিব্যদৃষ্টির পরিচায়ক নয়, বন্ধুবাৎসল্যের সাক্ষ্য। কিন্তু আমি আবাল্য যুক্তির ভক্ত ; এবং তৎসত্ত্বেও জন্ লক্ আমাকে যেমন বুঝিয়েছেন যে মানুষের প্রতি ভগবানের দয়া যখন অসীম, তখন তাকে তর্কবিদ্যা শেখানোর জন্যে তিনি নিশ্চয় অ্যারিস্টট্ল্-এর দ্বারস্থ হননি, তেমনই এমন বিধানেও আমার সায় নেই যে কবি আর নৈয়ায়িকের পঙ্ক্তিভোজন স্বভাববিরুদ্ধ। আধুনিক বাংলা কাব্যের সঙ্গে ব্যাকরণের অসদ্ভাব বুঝি বা এই অপসিদ্ধান্তের অন্যতম পরিণাম ; এবং এখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথপ্রদর্শক নন বটে, তথাচ তাঁর দৃষ্টান্তেই আমরা আজ নিঃসংশয় যে কবিতার স্বাধিকার সহজ কবিত্বের পরাকাষ্ঠা। অবশ্য আমি যত দূর জানি, বর্তমান বাঙালী সাহিত্যিকদের অধিকাংশ শৈশবে স্কুল পলাতেন না ; এবং পরবর্তী জীবনের অধ্যয়নে তাঁদের অনেকে যদিচ কবিগুরুর সমকক্ষ নন, তবু পাশ্চাত্ত্য নামের খামখেয়ালী উল্লেখে প্রায় সকলের জিহ্বা একেবারে অনাড়ষ্ট। তাহলেও আমাদের মধ্যে লেখা-পড়ার অসামঞ্জস্য বিস্ময়কর ; এবং তার ফলে বাংলা প্রবন্ধই বিপদ্গ্রস্ত নয়, বাংলা কাব্যও অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট্ট।

কপালদোষে আমি কবি বা কোবিদ নই, পল্লবগ্রাহীদের পদাঙ্কচারী ; এবং সেই জন্যে আমার রচনায় সংগঠনের সাক্ষাৎ এখনও দুর্লভ। উপরন্তু একাধিক বিবেচকের বিচারে আমি নাকি দেশদ্রোহী ; এবং এ-অভিযোগ

যতই অলীক হোক, আমার পক্ষে অস্বীকার করা শক্ত যে স্থান ও কালের সঙ্গে সন্ধি পাতাতে না পেরে আমি বহু দিন যাবৎ সোহংবাদের শরণাপন্ন। কিন্তু সেখানে বাদানুবাদ যদিও আপাতত অনাবশ্যক, তবু আমার আত্মদর্শন অনেকান্ত ; এবং তাতে বাহ্যজ্ঞান স্বন্ধ স্বগত অভিভূতির মুখাপেক্ষী ব'লেই, তার সঙ্গতি শুধু স্কিৎসোফ্রেনিয়া-নামক চিত্তভ্রংশের অনন্য প্রতিবন্ধক নয়, প্রাণধারণেরও অদ্বিতীয় প্রকরণ। অর্থাৎ স্বোপলব্ধ বিশ্বরূপে আমরা নিমিত্তমাত্র নই, বীভৎসের জনক, মিথ্যার পৃষ্ঠপোষক ও অমঙ্গলের কর্মকর্তা ; এবং সে-অঙ্গীকারের পরে মৃত্যুর মূল্য যেমন জীবনের সমান, স্বভাব তেমনই অভাবের অন্বয়ব্যতিরেক। তুলনীয় কারণে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রগতিও আজ উভয়সঙ্কটে উৎকণ্ঠিত ; এবং সাম্প্রতিক অস্তিত্ববাদের উৎপত্তিস্থলে দেকার্ত্-কে বসিয়ে তার বয়ঃসংক্ষেপ আমার ইতিহাসবোধে বাধে বটে, কিন্তু সাত্র্-এর মতোই আমি একদা ভাবতুম যে মনুষ্যধর্মের শাশ্বত সমস্যা মার্ক্সীয় ডায়ালেক্‌টিক্-এর সাহায্যে সমাধানসাধ্য। তবে বামাচারে উদ্দেশ্য ও উপায়ের বৈপরীত্য তখনও আমাকে দুঃখ দিত ; এবং বরাবরই আমার সন্দেহ ছিল যে সে-বিরোধের শেষ নেই।

অন্ততঃপক্ষে আমি অবিলম্বে বুঝেছিলুম যে শ্রেণীসংঘর্ষের স্বতঃসিদ্ধি এক বার মানলে, ভাববিলাসই শ্রমিক জগতে আমার একমাত্র প্রবেশপথ ; এবং সেই জন্যে আমি সর্বদা জানতে চাইতুম সাম্যবাদে অবনতের উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, উন্নতের অবনতিও তেমনই অনিবার্য কিনা। আমার আশঙ্কা যে নিছক স্বার্থবুদ্ধির দৈববাণী নয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ লাইসেঙ্কো, ফাদাইয়েভ্ প্রভৃতির অস্থায়ী প্রতিপত্তি ; এবং আমার আস্থা যবেই ম'রে থাক, বুদাপেস্তের সদর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তার ভূত আবার আন্দাজ করেছে যে দু-এক ক্রোর রুষবাসীর অকাল মৃত্যু আর সে-দেশের সাধারণ সমৃদ্ধিবৃদ্ধি তাৎকালিক বটে, তবু যেহেতু কার্য-কারণের ধার ধারে না, তাই খ্রুশ্চোভ্-এর রাষ্ট্র ভূতপূর্ব ব্রিটিশ্ সাম্রাজ্যের মতোই পদানতের শোষণে পরিপুষ্ট। কিন্তু অনুরূপ ঘটনাঘটনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সাত্র্ নাকি এখনও বলেন যে প্রগতি যখন সৎসাহিত্যিকের প্রাণ, তখন সে ক্রমান্বয়ে ভাবতে বাধ্য যে মজুরেরা প্রাগ্রসর, কম্যুনিস্ট্ পার্টি মজুরদের প্রতিভূকল্প,

আর ইতিহাস সার্থক কম্যুনিস্ট্-দের শ্রীক্ষেত্র সোভিয়েট্ সমাজে ও তদনুগত গণতন্ত্রসমূহে ; এবং এমন বিশ্বাস যদি "লে ম্যা সাল্"-প্রণেতাকে সাজে, তবে এতে আমার লজ্জা নেই যে প্রথম পরিচয়ে আমি ধরতে পারিনি মার্ক্স্-এর মত, প্রয়োগে কেন, পরিকল্পনাতেও সংযোগী নয়, বিয়োগী।

ডায়ালেক্টিক্ সমন্বয় শুধু নামে সন্ধি ; এবং আসলে সেই প্রাণপাত দ্বৈরথে উভয় পক্ষের বিলুপ্তি অমোঘ ব'লেই, তার প্রত্যেক পর্যায়ে অনাহূত স্বৈরীদের অন্তর্বিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ মার্ক্স্-এর মতো শুভবাদী ভাবিকথকের কাছে সদসদের নিরন্তর দ্বৈত স্বভাবত অস্বীকার্য ; এবং তিনি যে-প্রবক্তাদের শেষ বংশধর, তাঁদের জাতি যেমন ভগবানের অতিশয় প্রিয়, তাঁরা তেমনই ইহলোকে পাপের চক্রবৃদ্ধি ও তজ্জনিত শাস্তি অনিরুদ্ধ বুঝে পারিপার্শ্বিকের প্রতি অদ্যাবধি বিরূপ। মার্ক্সীয় কর্মীরা আবার আত্ম-নিয়োগের গুণে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির অগ্রদূত ; এবং তাঁরা যেহেতু প্রগতির পথসংক্ষেপে বদ্ধপরিকর, তাই গন্তব্য ব্যতীত অন্য দিকে তাঁদের দৃক্‌পাত নেই, এমনকি কুরুক্ষেত্রের শেষে অর্জুনের পরিদেবনাও সময়াভাবে তাঁদের অসাধ্য। কিন্তু অন্যায় পর্যন্ত সোহংবাদীর নিজস্ব ; এবং সে যদি না চায় যে তার আত্মধিক্কার আত্মহত্যায় ফুরাক, তবে সে চেষ্টা করতে বাধ্য যাতে তার কার্যকলাপে অন্তত অনিষ্টের আধিক্য না ঘটে। অগত্যা সে অনধিকার চর্চায় বিরত থাকতে পারে না ; এবং সে কবি হলেও, তার বিশ্ববীক্ষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির অনুমোদন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উপরন্তু তত্ত্বসন্ধানীর বেলায় কাব্যের সাক্ষ্য সমান মর্যাদাবান ; এবং এ-রকম পরিশীলনের প্রবর্তনা যখন একাগ্র. তখন বিশেষজ্ঞের অবজ্ঞা সত্ত্বেও এর সাধারণ ফল নিশ্চয়ই উপকারী।

প্রকৃত প্রস্তাবে, মার্ক্স্ কেন, যত দার্শনিক অনেকান্ত জগৎকে এক সূত্রে বাঁধার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁদের সকলে অসংখ্য গেরো পাড়িয়েছেন বটে, কিন্তু কেউ সারা সংসারকে বাগ মানাতে পারেননি ; এবং সেই জন্যে তত্ত্বজ্ঞানের বিতরণ যাদের ব্যবসায় নয়, অন্তত তারা নানা মুনির নানা মত মনে রেখে পরিণামী সত্যের অভিমুখে আস্তে আস্তে এগোয়। এ-দিক থেকে দেখলে, মার্ক্স্-বাদ আদ্যন্ত নিরর্থক বা অসার্থক নয় ; এবং ইতিহাসের

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ব্যাপক প্রয়োগের পরীক্ষা না পেরিয়ে থাক, তার সাহায্যে গত এক শ, দেড় শ বছরের বহু ব্যাপারকে সরল লাগে। অবশ্য গোড়ায় গলদ শেষ রক্ষার পরিপন্থী ; এবং যুক্তিই যদিচ অনুরূপ অপচেষ্টার আদর্শ প্রতিকার, তবু জ্যামিতির মূলানুসন্ধান ক'রে একদল ভাবুক উপরন্তু ভজাতে চেয়েছেন যে শুধু স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যের সংক্ষেপ তথা অন্তঃসঙ্গতি যথেষ্ট নয়, নিরবধি কালে ও বিপুলা পৃথ্বীতে খাটাতে খাটাতেই প্রতীত্যসমুৎপাদের ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে একেবারে নিষ্প্রমাদ মানুষ আজ পর্যন্ত জন্মায়নি ; এবং কোপার্নিকাস্-এর পরবর্তী নৌজীবীরাও ধ্রুবতারার নির্দেশেই গন্তব্যে পৌছাত ব'লে, গ্রহ-নক্ষত্রের ভূপ্রদক্ষিণ যেমন আমাদের শিরোধার্য নয়, তেমনই একাধিক ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্য সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের অমোঘ উপসংহার এ-যাবৎ অনাগত।

অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্য ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে বাক্যব্যয় বৃথা ; এবং এ-কথা যেহেতু মার্ক্স্-এরও অবিদিত ছিল না, তাই রাসেল্-এর বিচারে তিনি বের্গ্সন্, ড্যুই প্রমুখ উপযোগবাদীদের পূর্বপুরুষ। অবশ্য উক্ত সাদৃশ্য মার্ক্সীয় দর্শনের পক্ষে ক্ষতিকর নয় ; এবং ভাবনার স্বাধিকার যে মানুষী আত্মপ্রবঞ্চনার চূড়ান্ত, সে-সম্বন্ধে আবার ফ্রয়েড্ মার্ক্স্-এর সঙ্গে একমত। কিন্তু প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞা শুধু যথাযথ নয়, তৃপ্তিকরও বটে ; এবং সন্তোষজনক মিথ্যা শেষ পর্যন্ত অপকারী ব'লে, তার আর যাথার্থ্যের প্রভেদকে যতই দুস্তর লাগুক, সময়ের মুখ চেয়ে অনৃতের অত্যাচার সওয়া স্বল্পায়ু মানুষের পক্ষে শক্ত। তাছাড়া অবিমিশ্র অপলাপ সর্বশক্তিমান একনায়কদেরই শোভা পায় : সাধারণ নর-নারী যে-সকল প্রসঙ্গের সম্মুখীন, সে-সমস্ত পুরোপুরি অপদার্থ নয় ; এবং নব্য ন্যায়ের কণাদেরা যদিচ এমন বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত যার পরে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের প্রত্যেক খণ্ড প্রমাণসাধ্য, তবু তাঁরা সুদ্ধ মানেন যে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা ফলিত বিজ্ঞানের তোয়াক্কা রাখে না। এখানে মনোবিকলনও তাঁদের সাক্ষ্য ; এবং সে-বিদ্যা যেমন দেখিয়েছে যে অবচেতনায় অবিরোধের লজিক্ অচল, তেমনই বিশ্বস্ফীতির আবিষ্কর্তা ডি সিটার লিখেছেন যে আকাশ বঙ্কিম না হলে, তাঁর অনুমান অমূলক, অথচ পরিমেয় শূন্য অন্তত এখনও ঋজু।

অতএব ব্রহ্মাণ্ড সর্ববিধ নিরুক্তির বহির্ভূত ; এবং মার্ক্স্-বাদে শুধু যে বিশ্ববৈচিত্র্যের স্থান নেই, তাই নয়, উপরন্তু তার সাহায্যে জটিল ব্যাপার এত সরল হয়ে আসে যে শ্রমলাঘবের লোভে তার অপপ্রয়োগ এক রকম অনিবার্য। ফ্রয়েড্-এর মনস্তত্ত্বও প্রায় সমান একদেশদর্শী ; এবং হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে মার্ক্স্-এর অনুবর্তন ক'রে তিনি যদিচ ঠিক বলেছেন যে নরলোক নিষ্কাম কর্মের প্রতিকূল, তবু ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভাষ্য যত না অগ্রাহ্য, শিল্প-সাহিত্যের যৌন টীকা ততোধিক অবান্তর। পক্ষান্তরে পরমার্থের পরিভাষা জনান্তিকের জয়ধ্বনি ; এবং বোঝা-পড়া স্বভাবত দ্বিমুখী, এমনকি উক্তি ও উপলব্ধির ক্রোচে-প্রস্তাবিত অদ্বৈত যেকালে স্বতঃপ্রমাণ, তখন প্রাতিস্বিক আদান-প্রদানে সাধারণ্যই মধ্যস্থ। অগত্যা মানুষমাত্র বস্তুস্বাতন্ত্র্যের বশবর্তী ; এবং সম্ভবত সেই জন্যে দুর্মর শ্রেণীস্বার্থের মতো স্বয়ংবশ চিত্তবৃত্তিও জড়বাদে বদ্ধমূল। তবে সোহংবাদী সদা-সর্বদা মনে রাখতে বাধ্য যে বস্তুপ্রভব জ্ঞান সুদ্ধ ব্যক্তিগত ব'লে, দার্শনিকের তথাকথিত প্রমা তার ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাসের নামান্তর ; এবং অবিনয়ের অভাবে সে আর যার শ্রদ্ধা হারাক, অন্তত অকপটের প্রশ্রয় পাবে। কেননা অনিশ্চয়কে ডরায় ধর্মধ্বজেরা ; এবং দেকার্ত্-এর আগেও অগণিত ভাবুক যেমন সংশয়ের দীক্ষা নিয়েছিলেন, তেমনই হিউম্-ই নির্মম মনীষার শেষ প্রতিনিধি নন।

দর্শনাদি যে আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা, তার অন্যতম কারণ আমার মধ্যে উল্লিখিত নিরাসক্তির শোচনীয় অনটন ; এবং শুধু ফ্রয়েড্ কেন, রাসেল্ সুদ্ধ রটিয়েছেন বটে যে মৌল বিশ্বাসের সমর্থনে পরিপক্ব বুদ্ধির নির্বন্ধ সর্বসাধারণের অভ্যাস, তথাচ আমার সঙ্গতি তো আমারই, তদুপরি তা আজও এতাদৃশ অসম্পূর্ণ যে তার দৃষ্টান্ত যেমন অপর কারও উপকারে লাগবে না, তেমনই আমি অবশেষে মানতে বাধ্য যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দূরের কথা, সাহিত্যসংক্রান্ত সামান্যীকরণে পর্যন্ত আমি সচরাচর একচক্ষু, কচিৎ-কদাচিৎ হঠকারীও। অর্থাৎ আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসায় জ্ঞানার্জনী বৃত্তির শুদ্ধি নেই ; প্রধানত নিজস্বের দৈন্য ঘুচবে ভেবেই আমি পরের ধনে পোদ্দার ; এবং সেই জন্যে আমার পাঁচমিশালী মাল-পত্রে কোনও

একচেটিয়া কারবারের কাজ চলবে না। কিন্তু বর্তমান সংগ্রহে ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা যদিও মুখ্য, তবু সনাতন সত্য-সমূহ গৌণত বিপন্ন যুগধর্মের আত্মজৈবনিক বিকারে ; এবং তাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ সমধিক ব'লেই, জড়বাদ আমাকে টানেনি, পুরুষপরম্পরায় বৈপরীত্য-বশতও আমি মরমী প্রাগল্‌ভ্যের জাতশত্রু। প্রসঙ্গত আরও স্মরণীয় যে রুষ বিপ্লবের কাছে আমার প্রত্যাশা ব্রিটিশ্ শাসনের প্রতিক্রিয়ায় যে-আতিশয্য দেখিয়েছিল, তার নিপাত যত স্বাভাবিক, ততই দুর্বিষহ ; এবং তাই আমার বর্তমান হতাশা, বিষাক্ত না হোক, তিক্ত।

তৎসত্ত্বেও সৎসাহিত্যের প্রতি আমার ভক্তি অহৈতুক ; এবং হয়তো প্রাক্তন প্রেরণাই আমাকে আজীবন ভাবিয়েছে যে সংসারযাত্রার দোটানা সংসক্ত ও সাবলীল কেবল কলাক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে যুক্তির যে-সংজ্ঞা অন্তত প্রকারান্তরে আমি ফোটাতে চেয়েছি, তাতে আর উক্ত নির্বিরোধে কোনও প্রভেদ নেই ; এবং এমনকি অ্যারিস্টটল্ সুদ্ধ মানতেন যে বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান যে-কবির ক্ষমতায় কুলায় না, সে প্রতিভায় বঞ্চিত। অর্থাৎ স্বপ্নাদ্য প্রতীকের মতোই উৎকৃষ্ট কবিতার চিত্রকল্প দ্বন্দ্বসমাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ; এবং সাধ থাকলেও, সাধ্যের অভাব-বশত আমি সে-রকমের রচনায় অপারগ বটে, কিন্তু বাংলা ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যেহেতু জন্মগত, তাই উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার শিখতে আমাকে শেক্‌স্‌পীয়র-এর কাছে ছুটতে হয় না, এ-দেশের ঝাঁ ঝাঁ রোদেই আমি চোখ-কানের ঝগড়া মেটাই। তবে মহাকবিরা জানেন যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়ে স্বকীয় বিশ্ববীক্ষার সর্বনাশ সাধে ; এবং সাহিত্য শুধু বিষয়-বিষয়ীর সঙ্কেত নয়, রসসামগ্রীর মায়ামুকুরে দর্শক আবার বহুরূপী। সুতরাং শিল্পবস্তু দ্রব্যগুণের ধার ধারে না ; সে যখন প্রতিভূ, তখন তার নির্বাচনে উদ্দেশ্য ও উপায়ের সমীকরণ অকাট্য ; এবং তার আবিষ্কার যেমন একাগ্র এষণার পুরস্কার, তার মাহাত্ম্য তেমনই আবিষ্কর্তার সচেতন চিত্তশুদ্ধিতে।

অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির অদ্বৈত যে-সাত্ত্বিক সম্বন্ধের পরাকাষ্ঠা, তার প্রত্যেক পর্বে ভাবনা ও বেদনার ঐক্য তো অপরিহার্য বটেই, এমনকি তাতে ইতর-বিশেষের সাযুজ্য অথবা অন্তর-বাহিরের মিলন পার্বতী-

পরমেশ্বরের মতোই নিবিড় ; এবং বাগর্থের উদ্বাহবন্ধনে কালিদাস ও মালার্মে প্রথম ও শেষ ঘটক নন, তাঁদের পূর্বে ও পরে যে-সৎকবিদের দেখি, তাঁরাও সেই বৃত্তির উপজীবী। সুতরাং এ-রকম কোনও ভাব বা আবেগ নেই যা, কায়মনোবাক্যের সহযোগ-ব্যতিরেকেও, কেবল কাব্যরচনার উপযোগী ; এবং ছন্দ ও অনুপ্রাস, উপমা ও রূপক তখনই সার্থক, যখন তদ্দ্বারা প্রাগুক্ত অবৈকল্যের ঐকান্তিক উপলব্ধি অন্যের গোচরে আসে। উপরন্তু বচনমাত্রেই বিশ্লিষ্ট শব্দের উদ্দেশ্যমূলক সন্নিপাত ; এবং যদি মানি যে সাধারণ শব্দ স্বাতন্ত্র্যসূচক, তবে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদির অন্বয়ে হয়তো বা একটা অপ্রাকৃত পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান। কোল্‌রিজ্‌ আবার ভজিয়েছিলেন যে কবিতা শ্রেষ্ঠ শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট বিন্যাস ; এবং সেই শৃঙ্খলায় ইচ্ছাশক্তির স্বাক্ষর যতই স্পষ্ট হোক, কবির শব্দনির্বাচনে ছন্দের প্রভাব আরও পরিষ্কার। অন্ততঃপক্ষে তাই ভালেরি-র বিশ্বাস ; এবং সঙ্গীতে স্বরের অনুক্রম যেমন আত্মনিয়ন্ত্রিত, তেমনই কাব্যের শব্দসমষ্টিও অন্যোন্যনির্ভর ব'লে, তিনি প্রচার করেছিলেন যে উভয়ে সমান স্বাবলম্বী—উভয়ত্র মূল্যের ভিত্তি নিজস্বে।

গণিত উল্লিখিত স্বায়ত্তশাসনের অপর দৃষ্টান্ত ; এবং সে-ক্ষেত্রেও আদিপর্ব যেহেতু উত্তরকাণ্ডের নিয়ন্তা, তাই অঙ্কশাস্ত্র নির্বিকল্প নিশ্চয়ের জন্মভূমি। তবে সেই নির্ব্যূঢ় কল্পনায় যেমন যথাযথের যাতায়াত নেই, তার অনুলাপ তেমনই সত্যাসত্যের অতীত ; এবং মধ্য জীবনে রাসেল্‌ যদিও ভেবেছিলেন যে তার সঙ্গে লজিক্-এর পার্থক্য অস্বীকার্য, তবু এখন তিনি নিঃসন্দেহ যে জগৎপ্রপঞ্চ তার তোয়াক্কা রাখে না, বরঞ্চ বিশ্বপরিচয়ে তার উপদেশ মানা আর কুঠার হাতে জীবব্যবচ্ছেদে নামা একই অপচারের প্রকারভেদ। অবশ্য হেতুবাদে কান না পাতুক, নিসর্গ মোটের উপরে শুভঙ্করীর উপরোধ শোনে ; এবং সংখ্যাতারাই হাইড্রোজেন্‌ বোমার নির্মাতা, তথা মেরু-প্রান্তিক যবের উৎপাদক। কিন্তু তাঁরাও জানেন যে লাঠিমাত্রেই এক গজের চেয়ে বড় বা ছোট বটে; তথাচ ঠিক এক গজের মাপকাঠি যার প্রয়োজন, তার গন্তব্য প্লেটো-র অতিমর্ত্য, যেখানে পিথাগোরাস্‌ নক্ষত্রের নূপুরনিক্বণে মন্ত্রমুগ্ধ ; এবং অনুষ্ণ বসুন্ধরায় বিশদ রূপরেখা আদমসুমারির উপলক্ষ

ব'লে, এমন অনুমান পোষণীয় নয় যে সূর্যলোকেও রাশি সামগ্রীবাচক। ফলত র্যাসেল্ ভালেরি-র মতোই বিশ্বাস করেন যে ন্যায় ও গণিত কাব্য-সঙ্গীতের গোত্র-সম্ভূত ; এবং মানসের নির্বচনে ভাষা সর্বেসর্বা না হ'লে, উভয়ের স্পষ্টোক্তি আমার লেখায় প্রলাপ-প্রহেলিকার ভেক নিত না।

অবশ্য গদ্য আপাতত পরজীবী ; এবং কোল্‌রিজ্-ই বলেছিলেন যে তাতে দ্রষ্টব্য উপযুক্ত শব্দের যথোচিত সংযোজনা। কিন্তু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাও একাধারে বহিরাশ্রয়ী ও মন্ময় ; এবং সাধারণ ভাষায় অসামান্য উপলব্ধির প্রকাশ তো একাধিক বিধেয় বাক্যের অপেক্ষা রাখেই, উপরন্তু সঞ্চারী চৈতন্যে অনুভব যেহেতু অনুষঙ্গপ্রবণ, তাই শুধু সমসাময়িক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অবিচ্ছেদ নয়, ভূত ও ভবিষ্যতের নির্বিরোধ ব্যতীত বর্তমান অবগতি অগ্রাহ্য। অন্ততঃপক্ষে গাছের পাতা যে সবুজ, তা শুনে আমাদের জ্ঞান বাড়ে না ; এবং সেই অতিবস্তু বর্ণের ধ্যান-কালে বাণভট্টের মন যদি ধূসর, নীল, পিঙ্গল, পীত প্রভৃতি নানা রঙের দ্রব্যজাত আভায় অনুরঞ্জিত হয়ে না উঠত, তবে কেউ যেমন ভাবতে পারত না যে কাদম্বরী তন্ময় রচনার দৃষ্টান্তস্থল, তেমনই ব্র্যাড্‌লী-ও প্রমাণ করতে চাইতেন না যে নিরীক্ষামাত্রেই বিশ্বব্যাপী। ফলত অভিধা ও অভিপ্রায়ের মধ্যে কোল্‌রিজ্ দেখেছিলেন অহী-নকুলের সম্বন্ধ ; এবং দ্বিতীয়ের সংবর্ধনায় প্রথমের নির্বাসন তাঁর চক্ষুশূল বটে, তথাচ তিনি যখন ব্যাসকূটের মহিমা বুঝতেন, তখন বিপ্রলাপের অর্থগৌরব এম্প্‌সন্-এরই আবিষ্কার নয়। আসলে পদার্থবিজ্ঞানীর মতো সুলেখকও মানতে বাধ্য যে ব্যাপক আর সরল অভিন্ন ; এবং মধ্য যুগের তর্কশাস্ত্রে সুদ্ধ সেই প্রতিজ্ঞাই সত্য, প্রয়োগক্ষেত্রের পরিবর্তনেও যার খণ্ডন অসাধ্য।

দশ-পনেরো বছর আগে এক জার্মান্ বিদুষী লিখেছিলেন যে মায়া যেহেতু মা-ধাতুর উত্তর, তাই সংসার বিবর্তবিভক্ত নয়, পরিমাণপ্রত্যাশী ; এবং অন্যথাতেও লীলাবাদ আমার অসহ্য। পক্ষান্তরে বহির্জগৎ-সম্বন্ধে স্থূল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসার ; এবং যদিও ভাবনা-বেদনা সাধারণত সমান্তরাল, তবু তাদের মধ্যে কার্য-কারণের সম্পর্ক যেমন অসম্পাদ্য, তেমনই ইন্দ্রিয়ার্থের প্রসিদ্ধি তো বাক্‌সর্বস্ব বটেই, এমনকি বাচালের বিষয়াসক্তি সুদ্ধ প্রাক্তন সংস্কার ও প্রাতিস্বিক শিক্ষার সঙ্গম। সুতরাং তদ্‌গত গদ্যও স্বভাবগুণে

নৈর্ব্যক্তিক নয়; এবং যে-লেখক নিজস্বের মোহে অন্ধ নয়, সে বোঝে যে শৈলীমাত্রেই স্বকীয় ব'লে, তা যখন সঙ্কীর্ণ, তখন অনাত্মীয় প্রসঙ্গের দাবি মেটাতে না পারলে, রচনারীতি নিরতিশয় ব্যর্থ। আমার অনধিকার চর্চা কেবল এই দিক থেকে মার্জনীয়; এবং আমি মনে করি যে পরবর্তী সন্দর্ভ-সমূহে আর কোনও ঐক্য না থাক, অন্তত একান্ত দৃষ্টির ইঙ্গিত আছে। তথাচ আমার বক্তব্য অকিঞ্চিৎকর; এবং এ-গ্রন্থে যত বিদ্যার নাম নিয়েছি, সে-সবের একটাতেও ব্যুৎপন্ন হলে, আমি আমার অমূলক অনুমানের সমর্থনে প্রতিযোগী সম্প্রদায়ের টুকরো কথা কুড়িয়ে বেড়াতুম না। কিন্তু স্বগত সামঞ্জস্যই আমার অন্বিষ্ট; এবং সেই জন্যে আমি সৌজাত্যকেই ডরাই, বর্ণসঙ্করে আমার আপত্তি নেই।

উল্লিখিত কৌলীন্যের সঙ্গে স্বয়ম্ভর কাব্যের সম্পর্ক নেই; এবং কল্পনা-ব্যতিরেকে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা যদিও বিড়ম্বনা, তবু কাল্পনিক উপচারে শব্দব্রহ্মের আরাধনা পণ্ড শ্রম। অন্ততঃপক্ষে মালার্মে-র কলাকৈবল্যে স্থূল বস্তু যেহেতু অপ্রতিষ্ঠ, তাই বিবিধ ব্যঞ্জনার একাকার সে-তনুবাত আবহের স্বধর্ম; এবং শিল্প ও স্বভাবের পৃথক্করণ গ্যেটে-র অন্যতম অবদান বটে, তথাচ তাঁর পূর্ণাবয়ব জীবনে অবিকল অনুভূতি ভূমারই প্রস্তাবনা। অবশ্য উভয়ে জানতেন যে মানুষ যখন পশু-পক্ষীর সগোত্র, তখন নিসর্গের তালে চললে, তার অসঙ্গতি ঘুচবে; এবং গ্যেটে আরও ভাবতেন যে বীজ থেকে মহীরুহের পরিণতি যেমন প্রত্যাদিষ্ট, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশও তেমনই। কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপ প্রাকাম্যের প্রকারান্তর; এবং সেই জন্যে ফাউস্ট্-এর অতীত নেই, আপনার ভবিষ্যৎ আপনি বেছে নিয়ে সে ভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সেটুকুই ফিরে চায়, যাতে তার স্বয়ংবর স্বীকৃত। রীতি আর ব্যক্তিস্বরূপের সমীকরণ শুধু এই অর্থে সিদ্ধ; এবং অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞা যতই স্পষ্ট হোক না কেন, তার মর্যাদা অভিযোজনে। ফলত শঙ্করাচার্যের বিচারে প্রগতি আর আত্মপরিক্রমা তুল্যমূল্য; এবং দূরতম তারাকেও স্বোপলব্ধির আধার ব'লে তিনি সোহংবাদে যে-ব্যাপ্তি এনেছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি ক'রে ভালেরি লিখেছেন যে মালার্মে-র কবিতা যেন ব্যূহবদ্ধ নক্ষত্র—মহাশূন্যে ঐকান্তিক সঙ্কল্পের অমর স্বাক্ষর।

মনোরথের উক্ত অভিযানে পলাতকের স্থান নেই ; এবং সেজান্-এর আলেখ্য যদিও নিকর্ষের চূড়ান্ত, তবু তিনি বুঝতেন যে তাঁর জ্যামিতিক রূপকল্প যে-বৃত্ত, শুম্ভক, ত্রিভুজ প্রভৃতির সন্নিপাত, সে-সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির দান। অর্থাৎ যদৃচ্ছালব্ধ উপকরণের ব্যবস্থাপনই মানুষী সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা ; এবং সেই জন্যে আমি স্বভাবকবিদের ভক্ত নই, আমাকে লোভায় মালার্মে-র আদর্শ, যাতে পঙ্কজই প্রতিবিম্বিত বটে, কিন্তু সে-মানস শতদলের মূল যেহেতু প্রণবের পুনর্বাদে, তাই তার শ্রবণসুভগ নাম প্রাকৃত পুষ্পাঞ্জলির মতো আশুক্লান্ত নয়। অবশ্য মন্ত্রসিদ্ধি আমরণ সাধনার পুরস্কার ; এবং আমার দীর্ঘ জীবন শুধু অসমাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত নয়, রিল্‌কে-র মতে মাধুর্য ও তাৎপর্যের ধ্যান নিরাসক্তিঘটিত যে-বিস্মৃতির অপেক্ষা রাখে, তার প্রয়োজন আমি এখনও হৃদয়ঙ্গম করেছি কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি আজন্ম যুক্তিকামী ; এবং কাব্যরচনায় নিত্য ও নৈমিত্তিক আততি-বিততির সাময়িক উপশম সহজ ও সংবেদ্য ব'লে, সে-চেষ্টায় আমি এত বছর কাটিয়েছি যে অসংখ্য উদ্‌ভ্রান্তি সত্ত্বেও সে-পথে আমার প্রত্যাবর্তন, দ্রুত না হোক, নিয়মিত। অতএব সেটাই আমার একনিষ্ঠা ; এবং তার জোরে এক-আধটা রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখতে পারি, এমন আয়ু অবশিষ্ট না থাকলেও, নিরুদ্দেশ যাত্রার সুযোগ আজ আরও সুদূরপরাহত।

আমার দর্শন যে সাহিত্যভিত্তিক, তারই স্বীকৃতি হিসাবে প্রথম নটা প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ; এবং পরবর্তী রচনাবলী কেবল নানাবয়সী নয়, প্রায় প্রত্যেকটায় এ-রকম অনেক কথা আছে যাতে আমি সম্প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু নূতন ভিটা বানানোর সময় যেমন আমার নেই, তেমনই আজকালকার বাজারে মাল-মসলা নেহাৎ বাড়ন্ত ; এবং সেই জন্যে উপস্থিত বাসাখানার জীর্ণোদ্ধার সুদ্ধ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। অর্থাৎ সমাজে যখন সদ্‌বিশ্বাস দুষ্প্রাপ্য, তখন অন্ধ বিশ্বাস ছাড়লে, শূন্যের প্রকোপ অপ্রতিকার্য ; এবং তদনুরূপ অবস্থায় বৈনাশিক নিন্দনীয় নয়, বরঞ্চ তার অসমসাহস মনীষীর মতো সাধুরও অনুকরণীয়। অগত্যা সংস্কারমুক্তি আজ সত্যাগ্রহের অগ্রগণ্য ; এবং দুরাশার অভাবে আমি সর্বনাশের বিভীষিকা দেখি না, পুরুষকারের প্রয়োজন বোধ করি। তবে নেতিবাচক সমালোচনায়

মমতা নিষিদ্ধ; এবং অভ্যাস দৃক্‌শক্তির বৈরী ব'লে, আমি প্রতর্কেও সংশয়বাদী বটে, তথাচ না মেনে আমার নিস্তার নেই যে আমি যদিও বিদূষণে ব্যস্ত, তবু প্রায়শ্চিত্তে অপটু। সৌভাগ্যক্রমে আমি জানি যে আমার নীড় সঙ্কীর্ণ ও শতচ্ছিদ্র; এবং তাই অসীম ও চিরন্তন আকাশই আমার একমাত্র ভরসা। কারণ সেখানে কালপুরুষও ত্রিশঙ্কু; এবং কৃতান্তের উক্ত কিঙ্করই গ্রীসের ওরায়ন্, যিনি শিবির উচ্ছেদ অসম্ভব বুঝে অন্যোন্যবিমুখ দর্শন ও কাব্যের মীমাংসাকার।

সেই আসুরিক নিষাদ আবার দৈব রোষে অন্ধ ও অশরীরী; এবং সেই জন্যে তাঁকে মৃগয়াবিরত দেখে লক্ষ্যভেদে নিজের অক্ষমতা আমি বিনা সঙ্কোচে মেনে নিয়েছি। উপরন্তু বাল গঙ্গাধর টিলকের অনুমানে আর্যেরা নাকি তাঁরই অনুচর; এবং তৎসত্ত্বেও তাদের সভ্যতা যখন অমৃতের দায়ভাগে পাদপীঠ পায়নি, মহাশূন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তখন আমার মতো নশ্বর অনার্যের পক্ষে কালপুরুষের ধ্যান অশোভন নয়, বরঞ্চ অত্যাবশ্যক। কারণ বিশ্বব্যাপী বিকর্ষণের বিধানে আমি কোন্ ছার, আমার অধিষ্ঠাতা সুদ্ধ বিলুপ্তির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও; এবং আমার পরেও তাঁর প্রেতচ্ছায়া অনেকের চোখে পড়বে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে অপরাপর নাড়িনক্ষত্রের প্রভাব প্রায় সর্বত্র সুপ্রকট। তবে আশা এই যে চরাচরের অনুপাতে মনুষ্যসমাজ এত ক্ষুদ্র যে বালখিল্যের মতিভ্রমে জগৎ-সংসারের ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই; এবং প্রাণপ্ররোহের অক্ষয় বটে আমাদের নীড় যদিও ক্ষণভঙ্গুর, সে-বৃক্ষের পক্ষিপালক ফলে উৎপিঞ্জর তবু অনন্ত অন্তরীক্ষ। সেখানে নিষ্ঠার পরিণতি নির্বেদ, আর প্রমাদ প্রসাদের সূচনা; এবং চক্রবর্তী কল্পে সঙ্কল্প ও বিকল্প যেহেতু একান্তর, তাই মালার্মে যেমন বুঝেছিলেন যে ফুলের বিয়োগই কবিতার সুযোগ, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের অব্যয়ীভাবে অভাব ও স্বভাব সমানাধিকার ব'লে, রিল্‌কে ভাবতেন যে কবি না মরলে, ফুল জন্মায় না।

১০ মার্চ ১৯৫৭

মহাকবিরা ক্ষণজন্মা হোন বা না হোন, আজকালকার সংস্কৃতিসঙ্কটেও তাঁদের অনেকে বেঁচে-বর্তে আছেন ; এবং সমসাময়িকদের প্রতি অবজ্ঞার মাত্রা কিছু পরিমাণে কমাতে পারলে, আমরা কেবল সুদূর অতীতে মহত্ত্বের সন্ধান পেতুম না, আধুনিকদেরও কীর্তিমান ব'লে ভাবতুম। তবে তথাকথিত অকাট্য নিয়ম সুদ্ধ ব্যতিক্রমের অধীন ; এবং সেই জন্যে উল্লিখিত সামান্য বিধি সত্ত্বেও, অন্তত ভারতবর্ষে, জীবিত লেখকদের মধ্যে শুধু একজন ব্যক্তি প্রাচীনদের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ; এবং তাঁর আসন যেহেতু ব্যাস-বাল্মীকি, হোমর-দান্তে-র সমপর্যায়ে, তাই তাঁর পাশে সাম্প্রতিকেরা তেমনই নিষ্প্রভ, যেমন দীপ্তিহীন সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহ-উপগ্রহেরা। তথাচ তিনিও শেষ পর্যন্ত প্রাগুক্ত বিধানের বশবর্তী ; এবং আজ আর তাঁকে কোনও বিশেষ অবদানের গুণে অপ্রতিম লাগে না, তাঁর সমগ্র অভিব্যক্তির বিস্তারেই তিনি এখনও অদ্বিতীয়।

অর্থাৎ তাঁর সম্পূর্ণ বিকাশের প্রত্যেক পর্ব নিয়ে যদি বিচার করি, তবে এ-কথা না মেনে উপায় থাকে না যে নানা ক্ষেত্রে পরবর্তীরা তো তাঁর তালে পা ফেলেছে বটেই, এমনকি সময়ে সময়ে সমে ফিরেছে তারাই তাঁর আগে ; এবং আমার এই অহংকৃত সিদ্ধান্তে যে অধুনাতনী হঠকারিতার নাম-গন্ধ নেই, তার প্রমাণ মিলবে "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র সদ্যঃপ্রকাশিত প্রথম খণ্ডে।* বলাই বাহুল্য তার মানে এ নয় যে এই সুদৃশ্য সঙ্কলনের প্রথমাংশ আমার বিবেচনায় অপাঠ্য। তবে কবি নিজে হয়তো তাই ভাবেন ; এবং সেই জন্যে তাঁর সমস্ত লেখার একত্রীকরণে তিনি শেষ পর্যন্ত

* রবীন্দ্র-রচনাবলী—প্রথম খণ্ড ( বিশ্বভারতী )

এই শর্তে মত দিয়েছেন যে তাঁর নাবালক বয়সের উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস মূল গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান পাবে না, একখণ্ড পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হবে। তৎসত্ত্বেও এই বিভাগে যা ঢুকেছে, তার অনেকখানি অপরিপক্ক, এতই অপরিপক্ক যে আজকালকার কবিযশঃপ্রার্থীরা এ-রকম কবিতা ছাপাবার আগে বেশ খানিকটা ইতস্তত করবে।

তবু বাংলা সাহিত্য তথা বঙ্গীয় সংস্কৃতির সকল ভক্তের কাছে এ-বইখানি মহামূল্য লাগবে; এবং যারা ইতিহাসবোধে একেবারে বঞ্চিত নয়, তারা কোনও মতে না মেনে পারবে না যে এই রকম অগ্রণীশোভন অধ্যবসায়ের ফলাফল উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী লেখকদের না অর্শালে, বাংলা পদ্য আজও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পদাঙ্কে চলত, আর বাংলা গদ্যে শোনা যেত শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিধ্বনি। অবশ্য তাঁরা উভয়েই যে বাঙালীর পক্ষে চিরস্মরণীয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই; এবং যদি রীতিবিচারের মূল সূত্র মনে রাখেন, তবে অত্যাধুনিক সমালোচকও তাঁদের রচনাবলীকে শুধু তাজ্জব ব্যাপারের দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখবেন না। কিন্তু তাঁরা যে-প্রসাদের পরিবেষক, তা মূলত বুদ্ধিগত ও নিরপেক্ষ; তাঁদের গুণ নৈর্ব্যক্তিক ও ধ্রুপদী; এবং তাঁদের মর্যাদাবান প্রকাশপদ্ধতি, তথা তন্ময় বস্তুনিষ্ঠা, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এমনই অচল যে আমরা বরং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আনন্দ পাই, পুরাতন পদাবলীকারদের আত্মীয় ব'লে ভাবি, তবু এই উনিশ-শতকী লেখকদ্বয়কে সইতে পারি না।

পক্ষান্তরে তাঁরা যে-জীবনযাত্রার প্রতিনিধি, তার প্রকোপ আমাদের সদর থেকে স'রে গেলেও, অন্দরে এখনও প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে; এবং না মেনে উপায় নেই বটে যে তাঁদের চারিত্র্যঘটিত কীর্তিতে যেমন ব্যক্তিস্বরূপের স্বাক্ষর নেই, তাঁদের ধ্যান-ধারণা তেমনই লোকাচারে আবদ্ধ—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে শিকড় ছড়ায়নি, তাহলেও তাঁরা আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের পাত্র। কারণ পূর্বপুরুষদের সঙ্কীর্ণতা-প্রসঙ্গে সাম্প্রতিকেরা যতই মুখ ছোটাক না কেন, এ-কথা আজ তর্কাতীত যে প্রথার শাসন-ব্যতিরেকে মাইকেলের উদ্দাম প্রকৃতি চির দিন উচ্ছৃঙ্খল থেকে যেত, কখনও স্থায়ী কাব্যে আত্মপ্রকাশ করত না; এবং মাইকেলের

রচনা যেহেতু বিদ্রোহের উন্মাদনায় আপাতত অধীর, তাই বাহ্য বিচারে যদিও মনে হয় যে তিনিই বুঝি নব যুগের প্রবর্তক, তথাচ যখন একটু গভীরে তাকাই, তখন এ-বিশ্বাস আর টিঁকে না। তার পরে ধরা পড়ে যে তিনি অর্বাচীন শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়ে; এবং শুধুই তাঁর বিষয়বস্তু সনাতন নয়, এমনকি যে-অন্তঃপ্রেরণার জোরে তিনি কবি, তাও আত্যন্ত বহিরাশ্রয়ী ব'লেই, ধ্রুপদী-আখ্যার যোগ্য।

আসলে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমই সর্বাগ্রে গতানুগতিকের উৎপীড়নে ধৈর্য হারিয়েছিলেন; এবং যথোচিত সাধনার অভাব-বশত তাঁর বৈমুখ্য রসোত্তীর্ণ না হলেও, অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব বাদে, তিনিই যেহেতু রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রথম গুণগ্রাহী, তাই এ-রকম অনুমান নিশ্চয়ই সঙ্গত যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে মেকী ছিল না, তিনি কায়মনোবাক্যে প্রচলিত ব্যবস্থার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ কেবল মন্ময় রীতির উদ্ভোক্তা নন, তাঁর আজন্ম প্রযত্নেই বাংলা কাব্য তার বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বঙ্গীয় সংস্করণ-রূপে লোকসমক্ষে এসেছিল; এবং বাইশ বছরে পৌঁছানোর আগেই তিনি যে-কখানা কবিতাসংগ্রহ ছাপিয়েছিলেন, সেগুলোর কোনওটাতে কলাকৌশলের নূতনত্ব না থাক, প্রত্যেকটাই দেখিয়েছিল যে এ-কবির কাব্যোপজীবিকা একেবারে সংস্কারমুক্ত, এমনই সংস্কারমুক্ত যে চিরন্তন প্রসঙ্গেও ইনি কবিপ্রসিদ্ধির ধার ধারেন না, সর্বত্র অন্য সমস্ত ভুলে উক্তি ও উপলব্ধির সহযোগ খোঁজেন।

খুব সম্ভব সেই স্বাবলম্বনের পিছনে ছিল পাশ্চাত্ত্য ঘটনাঘটনের সাময়িক জনশ্রুতি; এবং তদ্ব্যতিরেকেও তিনি নিশ্চয়ই শুধু আত্মপ্রকাশে খুশী হতেন না, প্রয়াস পেতেন যাতে তাঁর প্রসঙ্গে ভাবসঙ্গতির অভাব না ঘটে, তাঁর প্রকরণ অতিস্ফীতির স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলে, আর তাঁর ছন্দ একাধারে শৈথিল্য ও আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠে। কিন্তু যদি বিদেশের সমর্থন না জুটত, তাহলেও তিনি বাংলার মাটি মাড়িয়ে, স্বপ্রাধান্যের দিকে এগোতেন কিনা সন্দেহ; এবং যখন পনেরো বছর বয়সে জনৈক পণ্ডিত-মূর্খকে ঠকাতে গিয়ে তিনি জ্ঞানত অনুকরণে মন দিয়েছিলেন, তখন কোনও বঙ্গীয় কবি তাঁকে প্রতিমান যোগাতে পারেনি, তাঁর প্রয়োজন

মিটিয়েছিলেন বিদ্যাপতি। কারণ একদা বিদ্যাপতিও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় শ্রদ্ধা হারিয়ে এমন এক অভিব্যক্তির প্রবর্তন করেছিলেন যার সুবিধাসাপেক্ষ নমনীয়তায় বৈয়াকরণের সম্মতি না থাকলেও, সহজেই প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার সীল-মোহর পড়েছিল; এবং শুধু তাই নয়, বিদ্যাপতি চৈতন্যের আগেই বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

অন্তত আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণবেরা চির দিনই ব্যক্তিমর্যাদার পরিপোষক; এবং বোধহয় সেই জন্যে সারা হিন্দু সমাজে কেবল ওই সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে আজীবন টেনেছে। অন্য হিন্দুরা বর্ণাশ্রম-ধর্মের কৃপায় শিখে-ছিল শুধু জোট পাকাতে; এবং সেই দলাদলির সঙ্গে মিশেছিল ঠাকুর বাড়ির ঐহিক ঐশ্বর্য-সম্বন্ধে আপামর সাধারণের পরশ্রীকাতরতা। ফলত পিরিলিরা এই অজুহাতে হিন্দু সমাজ থেকে বহিভূর্ত হয়েছিলেন যে তাঁদের ধন-সম্পত্তি অকথ্য কালাপাহাড়ির পুরস্কার; এবং যদিচ রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার আগেই তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপ উক্ত ভেদবুদ্ধিকে অনেকাংশে হার মানিয়েছিল, তবু তখনও পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পঙ্ক্তিভোজন চলত না, বহির্বিবাহ তাঁদের প্রায় পথে বসাত, এবং খামখেয়ালী বা অসমসাহসী ছাড়া আর কেউ বড় একটা তাঁদের প্রতি সদ্ভাব দেখাত না। এ-রকম ক্ষেত্রে যে-কোনও আশুচেতন শিশু প্রথমে বিবশ বালকে ও পরিণামে বিদ্রোহী যুবকে বদ্‌লাতে বাধ্য; এবং তদুপরি সহজ প্রতিভার জোরে তাঁর জ্যেষ্ঠেরা যেহেতু ভাবতেন যে মেকলে-প্রবর্তিত বিদ্যাভাস শুধু কেরাণীদের সাজে, তাই শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেই যেটুকু ঐতিহ্যনিষ্ঠার অংশীদার, তাও কোনও কালে রবীন্দ্রনাথকে বর্তায়নি।

অধিকন্তু তাঁর ভাগ্যে সমবয়সীর সাহচর্য কদাচিৎ জুটত; তাঁর ভাইয়েরা তাঁর চেয়ে এত বড় ছিলেন যে তাঁদের আমোদ-প্রমোদে রবীন্দ্রনাথ ভাগ পেতেন না; এবং যে-আত্মীয়াদের সংসর্গে তাঁর দিন কাটত, তাঁরা তাঁর মনে এমনই আত্মলাঘব জাগিয়ে তুলেছিলেন যে প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের নির্জনে পালিয়েই তিনি বাঁচতেন, নিজেকে ভুলতেন অমানুষিক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধে। সুতরাং শৈশবারম্ভেই তিনি অনুব্যবসায়ী হয়ে পড়লেন; এবং বয়োবৃদ্ধির পরেও যখন সাফল্যের প্রতিযোগিতায় স্বজনদের

তিনি নাগাল পেলেন না, তখন তার মানসিক দূরত্ব যেন স্বভাবত বেড়ে গেল, তিনি ভাবলেন তাঁর ঐকান্তিক ভাবনা-বেদনা বুঝি সত্য সত্যই অমূল্য। এই অহংজ্ঞান অবিলম্বে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতেও বেরিয়ে পড়ল; এবং অচিরে তিনি তো পারিবারিক ভাষাকে সাময়িক শুদ্ধ ভাষার চেয়ে শ্রেয়স্কর ব'লে মানলেন বটেই, এমনকি ইতিমধ্যে তাঁর আত্মবিশ্বাস এ-রকমের উচ্চ স্তরে উঠল যে নিজের সকল লেখা বিনা সংশোধনে সদ্য সদ্য ছাপাতেও তাঁর দ্বিধা রইল না।

ফলে অন্তত বিচক্ষণ পাঠকের কাছে তাঁর গদ্য-পদ্য অদ্ভুত রকমের তাজা লাগতে লাগল; এবং তৎসত্ত্বেও যাঁরা প্রাচীন সাহিত্যে আস্থা হারালেন না, তাঁরা বুঝলেন যে জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে সকল বাঙালী লেখকের সমান বহ্বাড়ম্বর একাধারে অসহ্য ও অসাধু। পক্ষান্তরে একদল সাত্ত্বিক সমালোচকও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তাঁর ঐতিহ্যবিদ্বেষ স্বভাবতই তাঁদের চটিয়েছিল। এই বার তাঁকে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক জবানে কথা কইতে শুনে তাঁরা রটালেন যে তাঁর রচনারীতির উৎকর্ষ দুর্বোধ্য ও অপকর্ষ অকিঞ্চিৎকর; এবং সত্যের খাতিরে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ধ্রুপদীদের অনাত্ম যাথাতথ্যে যারা আজন্ম অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে খেয়ালী হৃদয়ের বাচাল আত্মরতি যত না দূষণীয়, ততোধিক দুষ্প্রবেশ্য। কিন্তু সেই অননুকম্পায়ীদের সুরুচি যেমন প্রশংসনীয়, তাঁদের অন্ধতা তেমনই শোকাবহ; এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব না ঘটলে, তাঁরাও নিশ্চয় মানতেন যে রবীন্দ্রনাথের দুরূহতা কোনও অসামান্য অভিজ্ঞতার ফল নয়, প্রকাশপদ্ধতির নিজস্বেই তিনি ক্বচিৎ-কদাচিৎ রহস্যময়।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ অন্তর্মুখী বেদনাবিলাসীদের অন্যতম নন; অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকারভেদে তিনি চির দিন নিরুৎসুক; এবং তাঁর প্রতিভা যদিও আগা-গোড়া মন্ময়, তবু তাঁর অফুরন্ত কর্মপ্রবর্তনা বোধহয় সাধারণের বিশেষ সংস্থান থেকে উৎপন্ন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বও ফ্রয়েডী অনুমিতির পরিপোষক; এবং ফ্রয়েড্-এর মতে সাধ বা সাধ্য থাকলেই, মানুষ মহাপুরুষের পদে পৌঁছায় না, উক্ত সম্মান সে তখনই পায়, যখন তার

মুখ্য উপলব্ধি অসাম্প্রদায়িক আদর্শের শাসন মানে, যখন তার মনোমুকুরে স্বদেশের মানচিত্র ফোটে, যখন তার ব্যক্তিস্বরূপ জাতিরূপের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বদ্‌লে যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি অবিশিষ্ট ব'লেই, তিনি বাংলা দেশকেও স্বকীয় চিত্তবৃত্তির ভাগী ক'রে তুলেছেন; এবং সে-অনুভূতি এমনই বিশ্বজনীন, এতখানি সার্বভৌম যে তার অভিব্যক্তি শুধু স্বভাষীর বোধগম্য নয়, আপাতত বিদেশীরাও তার মর্মগ্রহণে সক্ষম। সেই জন্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে প'ড়ে বাংলা ভাষা প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বচেতনার বাহন হয়ে উঠেছে; এবং এই উৎক্রান্তির ফলে সে-ভাষার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য আর নেই বটে, কিন্তু সম্প্রতি তাতে যে-বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তা প্রাগ্‌রৈবিক যুগে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

অবশ্য বাক্যগঠনের স্থানীয় রীতি, অর্থপ্রকাশের গতানুগতিক উপায়, সর্বগ্রাহ্য ভাবানুষঙ্গ ইত্যাদি বন্ধন ভাষার পক্ষে নিতান্ত অনুপকারী নয়; এবং প্রচলিত পদবিন্যাসের অভাব যেহেতু ভাষামাত্রের প্রাঞ্জলতা কমায়, তাই আধুনিক বাংলার দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা বাড়াতে গিয়ে আমরা প্রাচীন বাংলার প্রসাদগুণ হারিয়েছি। তাহলেও বোধহয় অর্বাচীনেরাই অবশেষে জিতেছে; এবং অভিধার হানিতে অভিপ্রায় তো বৃদ্ধি পেয়েছেই, এমনকি গদ্য-পদ্যের অভ্যস্ত ছন্দঃশৃঙ্খল ভেঙে যাওয়াতে ভাষায় এতখানি স্থিতিস্থাপকতা এসেছে যে ইদানীং কেবল ধ্বনির সাহায্যে ভাবনা-বেদনার স্তরভেদ-জ্ঞাপন বাঙালীর পক্ষে সহজসাধ্য। তাছাড়া উত্তররাবীন্দ্রিক বাংলার ন্যায়সঙ্গতি যদিও খুব প্রশংসনীয় নয়, তবু তার চিত্রাঙ্কনক্ষমতা সত্যই বিস্ময়কর; এবং সর্বোপরি তার বেশ-ভূষায় আর পোষাকী-আটপৌরের তফাৎ নেই, স্থান-কাল-পাত্র-অনুসারে সে আর ভেক বদ্‌লায় না, অন্দরমহলে যে-সাজে থাকে, রাজপথেও সেই পরিচ্ছদে ঘুরে বেড়ায়।

অথচ সেই স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে বিদেশী স্বেচ্ছাচারের নাম-গন্ধ নেই, আছে স্বদেশী বিশ্রম্ভালাপের অমায়িকতা; এবং সেই কারণে, সুযুক্তি সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সনাতনীদের আপত্তি শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি, সারা বাংলা দেশ তাঁর দৃষ্টান্তে কথা কইতে শিখেছে। দুঃখের বিষয় একা জগদীশ্বরই একাধারে নির্দোষ ও বর্তমান, অন্যত্র সত্তা আর পরিপূর্ণতার

সম্বন্ধ বিষমানুপাতিক ; এবং মনুষ্যবিশেষের প্রতিভা যতই বহুমুখী হোক না কেন, সে যেকালে অস্তিত্ববান, তখন তারই কর্মকাণ্ডে যে-সমস্ত সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখা দেয়, সেগুলোর প্রত্যেকটিকে সে ফলাতে পারে না। অতএব এ-কথা যদিও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার নির্বন্ধেই সাধু বাংলার মায়া কাটিয়েছিলেন, তবু কালক্রমে নূতন ভাষা-নির্মাণের উন্মাদনা তাঁকে এমনই পেয়ে বসল যে তিনি তাঁর স্বভাবদত্ত সংবেদনশীলতা তথা দৃক্‌শক্তির ব্যবহার প্রায় ভুলে গেলেন, তাঁর রচনারীতি প্রাক্তন সারল্য ঘুচিয়ে আত্মজ্ঞ বক্রোক্তির শরণ নিলে, এবং তিনি তাঁর আদিম অভিজ্ঞতার পুঁজি ভাঙিয়ে, সেই সঙ্গে উপমা-অলঙ্কারের খাদ মিশিয়ে, কার্পণ্যসহকারে পরবর্তী লেখার কাজ চালাতে লাগলেন।

অন্ততঃপক্ষে এতে সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথের মানস জীবনে নব যৌবনের গুরুত্ব পরিণত বয়সের চেয়ে অনেক বেশী ; এবং সুদীর্ঘ প্রৌঢ়তার শেষে আজও তিনি বহির্জগৎ-সম্বন্ধে আদৌ নিরাগ্রহ নন বটে, কিন্তু সে-বিষয়ে তাঁর ইদানীন্তন মনোভাব স্মরণে আনে সমাধিমগ্ন সোহংবাদীকে, যিনি অদ্বৈত ব'লেই, ইন্দ্রিয় থাকতেও নির্বিকার। অর্থাৎ আশী বছর অবধি ভোগশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেও, আজ পর্যন্ত সাহিত্যিক প্রগতির পথ-নির্দেশ ক'রেও রবীন্দ্রনাথ গত চল্লিশ বছর ধ'রে স্বকীয় উপলব্ধির বহিরাশ্রয়-সন্ধানে বিরত আছেন ; এবং সেই জন্যে বিশ্বব্যাপী অনুকম্পা সত্ত্বেও তিনি সংবেদব্যাপারে তুলনীয় অ্যারিস্টটেলী ভগবানের সঙ্গে : অধিকারভেদের কল্যাণে আত্মচিন্তা ছাড়া উভয়ের গত্যন্তর নেই। তবে আত্মসমাহিতি নিরন্তর সাধনার ফল ; এবং এতে সিদ্ধি যত দিন তাঁর আয়ত্তে আসেনি, তত দিন সমসাময়িকেরা স্বভাবতই তাঁর প্রগল্‌ভতায় ধৈর্য হারাতেন।

কিন্তু বিচক্ষণ পাঠক "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র প্রথম খণ্ড শেষ করার আগেই গ্রন্থকর্তাকে বিষয়বিমুখ ব'লে চিনবেন ; এবং সতেরো বছর বয়সে লিখিত "য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র" যেমন আশুচেতন বালকের সহজ বিস্ময় ও সরল জিজ্ঞাসায় উন্মুখর, তেমনই সাতাশ বৎসরে রচিত "য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী" একজন এমন সমালোচকের মতামত যাঁর আত্মোপলব্ধি বিদেশী দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছে স্বতই বীতশ্রদ্ধ। আসলে প্রথম যৌবনের পরে অবস্থার আমূল

পরিবর্তনও রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ্যে টলাতে পারেনি ; এবং সে-রকম অবিচলতা স্বগত অবৈকল্যের বহির্বিকাশ হলেও, তা যখন ধ্রুপদীদের নৈর্ব্যক্তিক মর্যাদাবোধেরই নিকটাত্মীয়, তখন এখানেও রবীন্দ্রনাথ স্বাধিকারপ্রমত্ত নন, বিশ্বমানবিক প্রাণসামগ্রীরই উত্তরাধিকারী। তথাচ উক্ত আত্মনিষ্ঠা বিনা মূল্যে মেলেনি ; এবং তার দাম দিতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র।

কারণ আধুনিক জগতে ঈস্কিলাস্-এর তুল্য কৃতকর্মা ব্যক্তিরা আর নাটক লেখেন না বটে, তবু নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে একাত্মবোধ সাম্প্রতিক নাট্যকারদেরও অবশ্যকর্তব্য ; এবং কল্পনাগত অনুকম্পার প্রাচুর্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আধিভৌতিক অন্বয়ব্যতিরেকে অবিশ্বাসী, তাই তাঁর চরিত্রাবলী চমকপ্রদ বাক্‌চাতুর্যে আমাদের তাক লাগায় বটে, কিন্তু সংক্রামক আবহের সমর্থন পেয়েও তারা শেষ পর্যন্ত কলের পুতুলের মতো নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক বাংলা দেশে ইতিপূর্বে জন্মায়নি ; এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যে স্বদ্ধ তারা এমন কোনও পথের সন্ধান পায়নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই। বস্তুত তাঁর দিগ্বিজয়ের পরে বাংলা সাহিত্যের যে-অবস্থান্তর ঘটেছে, তা এই : তাঁর অসীম সাম্রাজ্যের অনেক জমি জোতদারদের দখলে এসেছে ; এবং তাদের মধ্যে যারা পরিশ্রমী, তারা নিজের নিজের এলাকায় শস্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে মাত্র, ফসলের জাত বদ্‌লাতে পারেনি।

উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু অগ্রনেতা হিসাবেই সাম্প্রতিকদের স্মরণীয় নন, বাংলার বর্তমান সংস্কৃতি যেমন একা তাঁরই সৃষ্টি, তেমনই আজ অবধি একা তিনিই সে-সংস্কৃতির প্রামাণিক, তথা পরিচালক। কারণ বাঙালীর ইদানীন্তন বিশ্ববীক্ষা যদিও তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়—দেশ-বিদেশের আদর্শসঙ্করে গঠিত, তবু আজকালকার ধ্যান-ধারণা যে-ভাষার মুখাপেক্ষী, তা রবীন্দ্রনাথেরই অন্যতম দান ; এবং এখনকার প্রায় সকল দার্শনিক পাকে-প্রকারে মেনে নিয়েছেন যে যাথার্থ্য কোন্ ছার, শেষ পর্যন্ত পরমার্থও কেবল ভাষার ব্যাপার। অন্ততঃপক্ষে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কবিরা

স্বদেশপূজ্য ব'লেই, তাঁদের সঙ্গে প্রবক্তাদের পার্থক্য প্রকৃতিগত ; এবং সেই জন্যে বহুভাষীরা যখন বলেন যে কাব্যের অনুবাদ অসম্ভব, তখন তাঁরা ব্যাবসায়িক ধূর্ততার পরিচয় দেন না, সত্যানুরক্তিই দেখান। কেননা অতিমানুষিক শ্রেয়োবোধে আস্থা রেখেও কোল্‌রিজ্‌ স্বীকার করতেন যে কবিতা অভিধানের ধার ধারে না, শ্রেষ্ঠ শব্দের সর্বাঙ্গসুন্দর বিন্যাসেই বাঁধা পড়ে ; এবং এমন দুই ভাষা অভাবনীয় যাদের মধ্যে তাৎপর্যবিনিময় সর্বত্র অপ্রতিহত।

অতএব আমাদের কাছে বিদেশী কবিদের মূল্য শুধু এইখানে যে তাঁদের নাম মুখস্থ থাকলে, আমাদের বিদ্যাভিমান সাধারণের প্রশংসা পায় ; এবং বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব-বশত গ্রীকরা যদিও ভাষাগত ব্যবধান পেরিয়েই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি কুড়ায়, তবু তর্জমা প'ড়ে ল্যাটিন্‌ সাহিত্যের রস-গ্রহণ হয়তো কারও সাধ্যে কুলায় না। এই তো গেল প্রাচীনদের কথা ; অর্বাচীনদের অবস্থা আরও শোচনীয়। রাসীন্‌-প্রশস্তি আমাদের কানে শোনায় যেন কূপমণ্ডূকের ডাক ; ইংরাজীতে গ্যেটে কেবল বাগ্‌বিস্তারের জন্যে বিখ্যাত ; এবং রুষ দেশের বাইরে পুশ্‌কিন্‌-এর রচনা কৈশোরিক আধিক্যের পরাকাষ্ঠা। আমার বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথও উক্ত মহাকবিদের পর্যায়-ভুক্ত ; অন্ততঃপক্ষে তিনিও তাঁদের মতো অভিব্যক্তির যূপে অভিজ্ঞতাকে বলি দিতে দ্বিধা করেননি ; এবং তাঁর রচনাবলী প্রায়ই ভাবগৌরবে আশ্চর্য রকমের গরিষ্ঠ বটে, কিন্তু তাতে প্রসঙ্গ আর প্রকরণ এমনই অন্যোন্যনির্ভর যে একের পৃথক্করণে উভয়েরই সমান ক্ষতি।

ফলত রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষান্তর প্রকৃত পক্ষে অসাধ্য। উপরন্তু তাঁর মনীষা যদিও অতুলনীয়, তবু তিনি স্বভাবত হৃদ্‌ব্যবসায়ী ; এবং বাংলায় রসপ্রতিপাদনের ব্যবস্থা যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই ইংরাজী বন্দোবস্তের বিপরীত, তাই ইংরাজী "গীতাঞ্জলি"-র সাফল্য আদৌ আবশ্যিক নয়, সর্বৈব আপতিক। অর্থাৎ বাইবেল্‌-এর স্পষ্ট প্রতিধ্বনি সত্ত্বেও ইংরাজী "গীতাঞ্জলি"-র বক্তব্য ও ব্যঞ্জনা কেমন যেন অনিশ্চিত ; রবীন্দ্রনাথের তুচ্ছতম বাংলা লেখাতেও ছন্দাদির যে-নির্বিকল্প রূপ ধরা পড়ে, তার

আভাস-মাত্র সে-বইয়ে মেলে না ; এবং বুঝি বা সেই জন্যে ব্রিজেস্‌ সুদ্ধ "গীতাঞ্জলি"-র একটি কবিতা আগা-গোড়া শুধরেও, তার সর্বনাশ সাধেননি। তবে ব্রিজেস্‌ অকবি ; এবং তিনিও যখন এ-ধরণের অঘটন-সংঘটনে সক্ষম, তখন ভবিষ্যতের কোনও সুকবি অনুবাদকার্য হাতে নিলে, দায়িত্বহীন তর্জমা রবীন্দ্রনাথের, তথা বাংলা সাহিত্যের, প্রতি যে-অবিচার করেছে, তার আংশিক প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু সে-অনুবাদকও না মেনে পার পাবে না যে রবীন্দ্রনাথের বাংলা এক অভিনব ভাষা, তার আষ্টে-পৃষ্ঠে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রা, এবং তদ্‌ব্যতিরেকে তাঁকে বুঝতে চাওয়া মরুচারীকে নৌবিদ্যা শেখানোর চেয়েও হাস্যকর।

সত্য বলতে কী, রবীন্দ্রনাথ যদিও আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধের অন্যতম উদ্যোক্তা, তবু তাঁর কৃতিত্ব ঐকান্তিক আত্মোপলব্ধি ; এবং সে-কথা ভুলে তাঁকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের, তথা যুগধর্মের, দিক্‌পাল-রূপে দেখলে, আমাদের অন্ধ ভক্তিই ধরা পড়বে, তাঁর মান বাড়বে না। বস্তুত অবগতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক সুদ্ধ নন, তিনি রামমোহন-প্রমুখ আবিষ্কারকদের অনুগামী ; এবং তাঁর চেষ্টা ব্যতীত বাঙালীর ভোগশক্তি আজও ধারানিবদ্ধ থাকত বটে, কিন্তু রৈবিক উদারনীতি অভূতপূর্ব নয়, ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌ থেকে সুইন্‌বর্ন্‌ পর্যন্ত প্রত্যেক রোমান্টিক্‌ কবি অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁকে প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্যার প্রচারক ভাবাও অসঙ্গত ; এবং জড়বাদী পশ্চিম তাঁর বাণী শুনে অন্তর্দর্শনের মূল্য বোঝেনি, বরং প্রাচীর জড়ভরতেরাই তাঁর মারফতে পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্ম তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে।

অগত্যা তাদের অবস্থা প্রায় ত্রিশঙ্কুর মতো : তারা স্বদেশে উন্মূল, অথচ বিদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে না ; এবং সেই জন্যে তাদের অব্যক্ত অনুশোচনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই নিষ্ফল। তবে সে-শূন্যতার দায় রবীন্দ্রনাথের নয়, অপরাধী বাঙালীর চারিত্র্য ও ঐতিহ্য ; এবং তাঁর মতো আমরাও যদি পরের মুখে ঝাল খাওয়ার সনাতন অভ্যাস কোনও দিন কাটিয়ে উঠি, তাহলে অন্তত ভাষার অভাবে আমরা আর বুক ফেটে মরব না, বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম মেনেও সংস্কারমুক্তির বার্তা রটাব। বাঙালীর

সামনে সে-সম্ভাবনার দ্বার খুলেছেন একা রবীন্দ্রনাথ ; এবং তাই আগামী কালের বঙ্গবাসীরা তাঁর প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে করতেও তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানাবে। পক্ষান্তরে যাঁরা ভাববেন যে "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা শুধু ভাবী পুরাবিদ্‌দের অবশ্যকর্তব্য, তাঁরা মস্ত ভুল করবেন ; এবং রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে, আধুনিকেরা নিজেদেরও চিনতে পারবে না।

সেই জন্যে তাঁর সমস্ত লেখার প্রামাণ্য সংস্করণ একত্রে ছাপিয়ে বিশ্বভারতী সারা বাংলা দেশকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন ; এবং রবীন্দ্রনাথ যতই স্বাবলম্বী হোন, তিনি যেহেতু স্বয়ম্ভূ নন—তাঁর সত্তা দেশ-কালের উপাদানেই তৈরী, তাই তাঁর সমগ্র পরিণতির আনুপূর্বিক ইতিহাস-পাঠে আমরা তো বাংলা ভাষার ক্রমপরিণতি বুঝবই, এমনকি ভাষাপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর চিৎপ্রকর্ষ কী পরিমাণে বদ্‌লেছে ও বদ্‌লাচ্ছে, তাও অনায়াসে আমাদের জ্ঞানগোচরে আসবে। সুতরাং "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র বহুল প্রচার বিশেষ ভাবে কাম্য ; এবং গ্রন্থের মূল্য যথাসাধ্য কম রেখে প্রকাশকেরা আমাদের প্রত্যেককে এ-বই কেনার সুযোগ দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য সংস্করণটি কবিসম্রাটের উপযুক্ত ; এবং এত অল্প ব্যয়ে এ-রকম উৎকৃষ্ট কাগজ ও ছাপাই সরবরাহ যখন সম্ভব, তখন সাধারণ বাংলা পুস্তকের কদর্যতা নিতান্ত অমার্জনীয়। বাঙালীর ঔদাসীন্যে বঙ্গীয় সৌন্দর্যজ্ঞান ইতিপূর্বেই চাপা না পড়লে, আমাদের গ্রন্থব্যবসায়ীরা এ-বিষয়ে হয়তো আর একটু পটুত্ব ও দায়িত্ববোধ দেখাতেন।

[১৯৩৯]

## রবিশস্য

যে-বাঙালীর বয়স এখনও পঞ্চাশের নীচে, তার মতিগতি প্রধানত রবীন্দ্র-প্রভাবিত; এবং যাঁরা তদূর্ধ্বে উঠেছেন, বিবেচক হলে, তাঁরাও মানতে বাধ্য যে বাংলার আধুনিক সংস্কৃতি একা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সেই জন্যে আমাদের কাছে রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্রমবিকাশ অবিশ্বাস্য ঠেকে; আমরা মনে রাখি না যে এমন এক দিন গেছে যখন তিনি বাংলা সাহিত্যের বিধাতা-পদবাচ্য ছিলেন না, বরং তাঁকে লোকের বিজাতীয় লাগত। আসলে মহাকবিদের ভাগ্যে তৈরী শ্রোতা কমই জোটে; এবং রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে পাঠকসাধারণের প্রতিবাদ জাগিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্য লেখকেরা অধুনালুপ্ত কৃকলাস-জাতির সমগোত্রীয় নন, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি স্বভাবসিদ্ধ পরিণতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মঘাতী স্বকীয়তার চিহ্ন-মাত্র নেই, তাঁর চেষ্টায় তথা দৃষ্টান্তে বঙ্গসাহিত্যের সামান্য পদবী বেড়েছে ব'লেই, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে যুগপ্রবর্তক। অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক কীর্তিকলাপের সম্যক বিচারে তাঁর আপন রচনাবলীর নিঃসংশয় উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ব্যাপার; তাঁর অতুলনীয় অবদান এই যে তিনি কেবল নিজে অনবদ্য লেখা লেখেননি, মেধা ও মনীষায় যারা নিতান্ত নগণ্য, তাদের শুদ্ধ নির্দোষ লেখা লিখতে শিখিয়েছেন; এবং সেই ষাট বৎসর-ব্যাপী শিক্ষায় বাঙালী এতই উপকৃত যে সাম্প্রতিক কবিযশঃপ্রার্থীদের অনেক কবিতা যেমন রবীন্দ্রনাথের কৈশোরিক কাব্যের চেয়ে ভালো, তেমনই মামুলী মানুষের রসপিপাসাও আর সাবেকী সাহিত্য মেটাতে পারে না।

দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্তেরা উক্ত সিদ্ধান্তে সায় দেন না; তাঁদের মধ্যযুগীয় তর্কশাস্ত্রে সম্পূর্ণ তো স্বয়ম্ভু বটেই, এমনকি তাঁরা রটান যে

সর্বাঙ্গসুন্দর সত্তা জন্মবৃদ্ধ ; এবং এ-মতের শেষ রবীন্দ্রনাথের পদলাঘবে। কারণ প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর লেখক সৎসাহিত্যের জনক ; এবং অন্তত বাঙালীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যেকালে সত্যই অদ্বিতীয়, তখন তাঁর মূল সিদ্ধি নিশ্চয় নৈর্ব্যক্তিক। উপরন্তু তিনি স্থাণু নন, অথবা ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-এর মতো খানিক দূর এগিয়েই হাঁপিয়ে পড়েননি ; এবং এ-কথার অর্থ এই যে তাঁর শৈশবরচনায় যেমন প্রৌঢ়শোভন নিপুণতা স্বভাবত অনুপস্থিত, তেমনই তাঁর পরবর্তীদের কাঁচা লেখাতেও তাঁর পাকা হাতের স্বাক্ষর বর্তমান। তথাচ রবীন্দ্রনাথের কৈশোরিক ভুল-ভ্রান্তিই শেষ পর্যন্ত মর্যাদাবান ; এবং তাঁর স্খলন-পতন-ত্রুটির প্রত্যেকটি পরীক্ষাপ্রসূত, প্রত্যেকের পিছনে প্রাতিস্বিক উপলব্ধির অনিবার্য তাগিদ নিহিত আছে। সম্ভবত সেই জন্যে বঙ্কিম "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-প্রণেতাকে সর্বজনসমক্ষে বরণমালা পরিয়েছিলেন ; এবং ইদানীন্তন কাব্যের উন্নততর আঙ্গিক সত্ত্বেও, তাতে আন্তরিক প্রয়োজনের চিহ্ন-মাত্র নেই ব'লে, অদ্যাবধি কোনও আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুরূপ সম্মান পাননি। আসলে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রাগ্‌বৈবিক আদর্শের নাম-গন্ধ নেই, তার বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথেরই সাধনালব্ধ ; এবং এই বাহ্য উপকরণসমূহের গুণ গাইলে, তাঁর মান আদৌ কমে না, শুধু মানা হয় যে তাঁর বাল্যকালীন রচনা তাঁরই প্রাপ্তবয়স্ক লেখার তুলনায় অপরিণত।

বিবেকী সমালোচকদের সৌভাগ্য-বশত রবীন্দ্রনাথের দুর্বল রচনা পরিমাণে অত্যল্প। এমনকি "প্রভাতসঙ্গীত"-এও তাঁর স্বকীয় সুর শোনা গিয়েছিল ; এবং "কড়ি ও কোমল"-এর ভূমিকায় কবি নিজেই লিখেছেন, "এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে।" অবশ্য এই উক্তিতে কবি নির্দেশ করেছেন কেবল "কড়ি ও কোমল"-এর "প্রাণ"-নামক প্রথম সনেটটির দিকে ; এবং সমগ্র বইখানির প্রকাশ-কালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ বছর। কিন্তু পুস্তকটির যৌবনোচিত প্রাগল্‌ভ্য বাদ দিলে, সর্বগ্রাহী জীবন-নিষ্ঠা ছাড়াও তাতে এ-রকম অনেক প্রসঙ্গ ধরা পড়ে যা তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যের

মূল সূত্র হিসাবে গণ্য ; এবং উদাহরণত তখনকার দেশাত্মক ও শিশু-সংক্রান্ত কবিতাগুলি তো উল্লেখযোগ্য বটেই, উপরন্তু "অস্তাচলের পরপারে," "ক্ষুদ্র আমি," "প্রার্থনা" ইত্যাদি সনেটের মনোভাবও তাঁর পরবর্তী লেখায় নিতান্ত সুলভ। শুধু তাই নয়, "কড়ি ও কোমল"-এর আঙ্গিকে সুদ্ধ ভবিষ্যতের সূচনা আছে ; এবং তাঁর চতুর্দশপদী পয়ারে যদিচ সাময়িক শৈথিল্যের অভাব নেই, তবু সেই গ্রন্থের "বিরহ"-কবিতাটি বোধহয় বাংলা মাত্রাচ্ছন্দের আদি ও অকৃত্রিম নিদর্শন।

তৎসত্ত্বেও "কড়ি ও কোমল"-এ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় উহ্য নেই : তার তুলনামূলক উৎকর্ষ বিশেষ দেশ-কালের মুদ্রাঙ্কিত ; এবং সে-বইয়ের অনেক কবিতা আধুনিক বাঙালীর প্রশংসা পায় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত না থাকলে, তাকে অভিনন্দন করা আরও সহজ হত। অর্থাৎ হেমচন্দ্রীয় ও নবীনসেনী মহাকাব্যের পাশে "কড়ি ও কোমল"-এর প্রতি পঙ্‌ক্তিকে যতই লোভনীয় লাগুক না কেন, শুধু সে-পুস্তক লিখে, মাইকেলকে ছাড়িয়ে যাওয়া দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতেও উঠতে পারতেন না ; এবং মাইকেলের যে-কোনও কবিতার পরে "কড়ি ও কোমল" কেবল বিষয়ের বিচারে নিম্নপদস্থ নয়, ব্যঞ্জনার দিক থেকেও অনুন্নত। কারণ "কড়ি ও কোমল"-প্রণেতার ছন্দোবৈচিত্র্য সত্ত্বেও সে-পুস্তকের মেরুদণ্ড পয়ার ; এবং পয়ারকে, অন্তত চতুর্দশাক্ষর পয়ারকে, মাইকেল এমন এক পর্যায়ে তুলেছিলেন যার পরে তার উদ্‌গতি স্বভাবতই অসম্ভব। পক্ষান্তরে মহাকবি মাইকেলও মানুষ ছিলেন ; এবং গোড়ায় গলদ মনুষ্যধর্মের ভিত্তি। ফলত তিনি কোনও দিন বোঝেননি যে বাংলা আক্ষরিক ছন্দ অযুগ্ম চরণে দাঁড়ায় না ; এবং তাঁর সে-ভুল যদিচ হেমচন্দ্রও শুধরেছিলেন, তবু "প্রকৃতির পরিশোধ"-ই বোধহয় নির্দোষ অথচ রসোত্তীর্ণ অমিত্রাক্ষরের প্রথম দৃষ্টান্ত।

বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরে শুধু নেতিবাচক শুদ্ধিই নেই, তার সদর্থক গুণ এই যে তার সঙ্গে কথ্য ভাষার আত্মীয়তা সুস্পষ্ট ; এবং বাংলা নাটকের অন্যতম প্রবর্তক, মাইকেলও যেহেতু বাংলা লিখতে শিখেছিলেন সংস্কৃত অভিধানের অধ্যাপনায়, তাই তাঁর ছন্দে অর্থ সাধারণত আবেগের

অগ্রগণ্য। না, এ-অভিযোগ হয়তো ন্যায্য নয়, কারণ আবেগই কাব্যের প্রাণ; এবং আমরা যদি এক বার মানি যে মাইকেলী কবিতায় আবেগ নেই, তবে তাতে কবিত্ব আছে, এ-কথাও আমাদের অনস্বীকার্য। বস্তুত আবেগমাত্রেই হৃদ্‌গত বা ঐকান্তিক নয়, তার বুদ্ধিগত ও নৈর্ব্যক্তিক উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যে যথেষ্ট সুলভ; এবং হৃদ্‌গত আবেগ মন্ময় ব'লে, তা যেমন সর্বজনবিদিত ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে প্রকাশ্য, তেমনই বুদ্ধিগত আবেগের তন্ময় অভিব্যক্তি স্বভাবত বর্ণনাত্মক ও অভিধাশ্রিত। মাইকেলের যতিবিরল অমিত্রাক্ষরেও তাঁর বেদনাবিমুখ তথা ভাবনাপ্রধান মতিগতি সুপ্রকট; এবং সেই জন্যে তাতে অপূর্ব ধ্বনিবিজ্ঞানের পরিচয় থাকলেও, তার অতিশ্রুতি শব্দতরঙ্গে পাঠকের মন বড় একটা ভেসে যায় না। রবীন্দ্রনাথের চিত্তবৃত্তি ঠিক এর উল্‌টো; এবং তাঁর যতিভূয়িষ্ঠ ছন্দে পর্যন্ত ছেদের বালাই নেই, অনির্বচনীয় অনুভূতির নিরন্তর প্রবাহে তা সর্বত্র বেগবান।

সত্য বলতে কী, রবীন্দ্রনাথের মতো স্বভাবস্বচ্ছন্দ লেখকের পক্ষে অমিত্রাক্ষরের মুক্তি অনাবশ্যক; এবং তৎসত্ত্বেও যমকী পয়ার তাঁর উপযুক্ত বাহন নয় বটে, কিন্তু কৈশোরিক উচ্ছ্বাস কাটতে না কাটতে তিনি বুঝেছিলেন যে ছন্দোবন্ধে বাঙালীর পুরাকালীন স্বেচ্ছাচার প্রশ্রয় পেলে, তাঁর আত্মপ্রকাশে বিঘ্ন ঘটবে। সেই জন্যে প্রথম দিকের রীতিমতো নাটক কখানিতে ছাড়া অমিত্রাক্ষর তিনি ব্যবহার করেননি; এবং যেখানে অবিচ্ছিন্ন ভাবাবেগের তাগিদে অথবা কথকতার গরজে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, সেখানে শুধু পদান্ত বিরাম তুলে দিয়ে তিনি সনাতনী পয়ারকেই কাজে লাগিয়েছেন। এমনকি "বলাকা"-র পূর্বে তাঁর পয়ারে পর্ব-পর্বাঙ্গের অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্য বড় একটা দেখা যায় না; এবং "বলাকা"-তে দ্বাদশাক্ষর চরণের অনভ্যস্ত অভ্যাঘাত থাক, তার তানবৈষম্য বোধহয় পর্ব-পর্বাঙ্গের পরিমাণ-সাপেক্ষ নয়, আনুপ্রাসিক অবকাশের হ্রাস-বৃদ্ধি-সঞ্জাত। আমার বিশ্বাস বাংলা ছন্দের প্রকৃতি এমনই অনমনীয় যে আর কোনও উপায়ে তার মধ্যে বৈচিত্র্যসঞ্চার নিতান্ত দুঃসাধ্য; এবং যত দিন অবধি গদ্য-পদ্যের মূলগত ঐক্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েনি, তত দিন তিনি ছন্দের বন্ধন ক্রমাগত বাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবু তাঁর পদ্যরচনা

কোথাও একঘেয়ে নয় ; এবং সর্বত্র পর্বমাত্রা সমান রেখেও তিনি কেবল অনেকান্ত চিত্রকল্পের জোরে পয়ারের মতো একটানা ছন্দে পর্যন্ত অভাবনীয় রকমের তারতম্য এনেছেন।

এ-সম্পর্কে এই কথাও স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ একাধারে লিরিক্ কবি ও খেয়ালী লেখকদের অন্যতম ; এবং সেই জন্যে ঘন ঘন যতিপরিবর্তন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। ফলত কৃত্রিম উপায়ে যতিপাতের তাল বদ্‌লে, ভাবান্তর-প্রকাশের প্রয়োজন তিনি কখনও অনুভব করেননি ; বরঞ্চ একাধিক অনুভূতির অন্তঃপ্রবেশে কবিতাবিশেষের সংহতি যাতে নিপাতে না যায়, সেই দিকে তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। মাইকেল-প্রমুখ ধ্রুপদী কবিদের চিত্তবৃত্তি বিপরীত ধরণের ; এবং পাঠকের ধৈর্য অপরিসীম নয় ব'লে, তাঁরাও যদিচ একই কবিতায় বিবিধ ভাবচ্ছবি এঁকেছেন, তবু তাঁদের কাব্যোপজীবিকা যেহেতু নিরাধার তথা অবিমিশ্র আবেগ, তাই তাতে ব্যক্তিগত বেদনার শাবল্য নেই। অগত্যা প্রসঙ্গের নানাত্ব সত্ত্বেও "চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী"-র স্বরবৈচিত্র্য "মানসসুন্দরী"-র চেয়ে কম ; এবং তার পরেও না মেনে উপায় থাকে না বটে যে অন্তত আক্ষরিক ছন্দে মাইকেলের নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝি যে মাইকেল সে-চাতুরীর সাহায্যে কল্পনা ও ভোগশক্তির ন্যূনতা ঢেকেছিলেন। তবে উধাও উদ্ভাবনা সব ক্ষেত্রে রত্নপ্রসূ নয় ; এবং রবীন্দ্রনাথের অসাবধান কবিতার বর্জনীয় স্ফীতি অনেকেরই চোখে পড়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত বহুমুখী যে বিনা চেষ্টায় তার একাগ্রতা-রক্ষা প্রায় অসম্ভব ; এবং হয়তো সেই কারণে তিনি জ্ঞানত তাঁর গানে রাগশুদ্ধির প্রয়াস পাননি, প্রথার অবরোধ ঘুচিয়ে ফেলে হৃদয়শতদলের সকল পাপড়িকে একত্রে ফুটতে দিয়েছেন।

সে যাই হোক, "লিপিকা"-রচনার আগে পর্যন্ত পদ্যচ্ছন্দের বাইরে রবীন্দ্রনাথের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, বরঞ্চ মাইকেলী মাত্রাবৃত্তের অল্প-বিস্তর অনিয়মও তাঁর অসহ্য ঠেকত ; এবং সেই জন্যে "ভানুসিংহ"-এর সময় থেকে তিনি এমন এক জাতীয় ছন্দের পুনরুদ্ধার করছিলেন যার যতিপাতে ব্যক্তিগত নির্বাচনের সুযোগ নেই। কিন্তু সে-সকল ছন্দের চাহিদা

বৈষ্ণব যুগের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিল ; এবং সম্ভবত ইতিমধ্যে মাতৃভাষার উচ্চারণপদ্ধতি বদলে যাওয়াতে ওই ছন্দঃসমূহের সূত্রও পরবর্তী কবিরা মনে রাখেননি। কাজেই যাঁরা পয়ারের পীড়নে ধৈর্য হারিয়ে অগত্যা সে-রকম ছন্দের শরণ নিয়েছিলেন, তাঁরা সুদ্ধ বোঝেননি যে তাতে অক্ষর আর মাত্রা সর্বত্র এক ওজনের নয়। অথচ তাঁদের মধ্যে যাঁরা কানের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা মানতেন যে ছন্দ দ্রষ্টব্য সামগ্রী নয়, শ্রাব্য বস্তু ; এবং সে-ধরণের ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ যেহেতু তাঁদের রূপকারী বিবেকে বাধত, তাই তাঁরা হয় তাকে ব্যঞ্জনবর্ণের স্পর্শ বাঁচিয়ে আধো আধো ললিত পদের সেবায় লাগাতেন, নয় তার বিশেষ গতিবিধি ভুলে তাকে চালাতেন সংস্কৃতের লঘু-গুরু চালে। তবে উভয়সঙ্কট সকলের পক্ষেই কর্মনাশা ; এবং সুকবিরাও যেমন অহরহ শুদ্ধ স্বর যুগিয়ে উঠতে পারতেন না, তেমনই অকবিরাও জানতেন যে সংস্কৃত নিয়মে বাংলা পড়লে, ভাব জাগে না, হাসি আসে।

সুতরাং সে-কালের কোনও বড় কবিতাতে উক্ত ছন্দের আদর্শ শেষ পর্যন্ত টিঁকত না : কার্যত সকলেই রীতিমতো পয়ারের প্রথম বা দ্বিতীয় পর্বের অমিল বা সমিল দ্বিরুক্তি করতেন, এবং তার সঙ্গে বাকী অংশটা জুড়ে সমস্তটার নাম দিতেন ত্রিপদী বা লঘু ত্রিপদী। অবশ্য শুধু পয়ার ভেঙে একাবলী লেখা চলত না ; এবং পয়ারের শেষ পর্বেই যদিচ একাবলীর গোড়াপত্তন হত, তবু তার অবশিষ্ট ভাগে পয়ারের বিজোড়ভীতি ধরা পড়ত না। কিন্তু এই অবৈধ বৈশিষ্ট্যের যথার্থ তাৎপর্য প্রাগ্‌রৈবিক যুগে কেউ বোধহয় বোঝেননি ; এবং বিহারীলাল যখন "বঙ্গসুন্দরী"-তে লঘু ত্রিপদী আর একাবলীর সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তখনও মাত্রাচ্ছন্দের রহস্য তাঁর কাছে অনুদ্‌ঘাটিত ছিল। বস্তুত দৃক্‌শক্তির এতখানি অভাব বিহারী-লালের পক্ষে অমার্জনীয়। কারণ তাঁর কাব্যে অন্য কোনও গুণ থাক বা না থাক, সে-সময়কার অপ্রাকৃত রচনারীতির পাশে তার প্রাকৃত চাল সত্যই বিস্ময়কর ; এবং "নারীবন্দনা"-র চতুর্থ স্তবকে ছন্দের খাতিরে "শূন্য শ্মশান" অর্থে "শূনো শ্মশান" লিখে তিনি অসাধারণ শ্রুতিশুদ্ধি দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি জানতেন যে লঘু-গুরু ছন্দে "মাভৈঃ" ত্রিমাত্রিক ; অথচ

সেই ছন্দেই "বজ্রাঘাতে মম তব মূর্তিময়"—পদটি যে দ্বাদশমাত্রিক নয়, তা তাঁর মাথায় ঢোকেনি, অথবা "দ্রৌপদীর মতো রূপসী শ্যামা" কত সহজে আসল একাবলীতে বদ্‌লায়, তিনি তার সন্ধান পাননি।

পক্ষান্তরে শুধু এ-রকম কেন, আরও অনেক দোষ প্রাচীন বাংলা কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ; এবং সে-কালের কবিতা যেহেতু জানত সঙ্গীতের অনুগত, তাই তার ভাবস্বল্পতা যেমন জনতার অনুমোদনে পূর্ণতা পেত, তেমনই তার ছন্দঃশৈথিল্য ঢাকা পড়ত গায়কের স্বরবিস্তারে। এমনকি বিদ্যাপতির মতো স্বভাবকবি পর্যন্ত ছন্দোব্যাপারে সুবিধাবাদী; এবং বিশ্লেষণে দেখি যে "সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি সংস্কৃত বা বাংলা বিধানের ধার তো ধারে না বটেই, উপরন্তু কোনও স্বরচিত নিয়মেও সেই চিরসার্থক কবিতাকে বাঁধা যায় কিনা সন্দেহ। অবশ্য অল্প-বিস্তর অবৈধতা পুরাকালীন কাব্যের সার্বভৌম লক্ষণ; এবং ভারতচন্দ্রের অন্যতম অবদান এই যে তিনি অব্যবস্থিত বাংলা ছন্দকেও শৃঙ্খলা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে-শৃঙ্খলা স্বায়ত্তশাসন থেকে জন্মায়নি, তার পিছনে ছিল সংস্কৃত ছন্দঃ-শাস্ত্রের নির্দেশ; এবং সেই জন্যে লঘু-গুরু ছন্দে ভারতচন্দ্র শুধু স্তোত্রই লিখেছেন, তাঁর অতুলনীয় বস্তুবিলাস ব্যক্ত হয়েছে পয়ারে বা পয়ারের অপভ্রংশে। অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় কলাকুশলীর কাছেও বাংলা মাত্রাবৃত্ত আত্মপ্রকাশ করেনি। তিনি বোঝেননি যে বাংলা উচ্চারণ সংস্কৃত রীতিতে চলে না ব'লেই, তাতে গুরু স্বরের অভাব নেই; ঐকার, ঔকার, অনুস্বর, শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ ও যুক্তাক্ষরের পূর্ব বর্ণ বাংলায় স্বতই দীর্ঘ; এবং এ-কথা মনে রাখলে, দ্বাদশ-মাত্রিক লঘু ত্রিপদীতেও হলন্তের প্রয়োগ সম্ভব, তথা ওজোগুণের প্রাদুর্ভাব সহজ।

"ভানুসিংহের পদাবলী"-তে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উচ্চারণের স্বধর্ম মানেন-নি। উপরন্তু সে-কবিতাগুলি তাঁর বাল্যরচনার অন্তর্গত। তথাচ প্রকরণের দিক দিয়ে সে-বইখানির মর্যাদা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের চেয়ে বেশী। কারণ তার ছন্দ সর্বত্র এক নিয়মের অধীন; এবং তৎসত্ত্বেও "মরণ রে"-শীর্ষক তার শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রথম স্তবকের উপান্ত পঙ্‌ক্তিতে "করে"-শব্দের একারটি যদিচ ছন্দের খাতিরে লঘু, তবু এই ব্যতিক্রম স্পষ্টত কিশোর

কবির অক্ষমতা-প্রসূত, কোনও মতে সুবিধাবাদীর স্বেচ্ছাচার-সূচক নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের স্বভাব বরাবর উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপন্থী। তাঁর আত্মনিষ্ঠা আত্যন্তিক ব'লেই, তিনি অবিলম্বে বুঝেছিলেন যে নিয়ম বাঁচিয়ে চলার মতো নিয়ম এড়িয়ে যাওয়াও কাপুরুষের কর্ম; এবং সেই জন্যে ছন্দের নিগড়ে যত দিন নূপুরের বোল বাজেনি, তত দিন তিনি একটার পর একটা বাঁধনে তাঁর পদ্যকে কেবলই বেঁধেছিলেন। কিন্তু যে-বিধানের অঙ্গীকারে সাধক সিদ্ধিতে পৌঁছায়, তা সদা-সর্বদা প্রকৃতির অনুকূল; এবং "ভানুসিংহের পদাবলী"-তে শুধু বাংলা উচ্চারণই অস্বীকৃত নয়, বাংলা ব্যাকরণও অনুপস্থিত। অতএব শৈশবের অনির্বচনীয় ও অনাত্ম উপলব্ধির উত্তরাধিকার ফুরাতে না ফুরাতে "ভানুসিংহ"-এর মাত্রাচ্ছন্দ রবীন্দ্রনাথের কাছে অব্যবহার্য ঠেকল; এবং যেহেতু প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিশেষ ক'রে দেশকালাশ্রিত, তাই অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগত্যা কথ্য ভাষার বশে এলেন।

কিন্তু কথিত বাংলায় আ, ঈ, উ, এ, ও—এই স্বরগুলির দীর্ঘ উচ্চারণ তো নিষিদ্ধ বটেই, তাছাড়া হসন্তের আধিক্যও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য; এবং "প্রভাতসঙ্গীত" বা "ছবি ও গান"-এর মাত্রাচ্ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম নিয়মের মর্যাদা রেখেছেন, তেমনই, ব্যঞ্জনবর্ণের প্রচলিত ব্যবহার তাঁর কানে বাজত ব'লে, তিনি সাধ্যপক্ষে দ্বিতীয় নিয়মের অস্তিত্ব মানেননি। ফলত তাঁর এই সময়কার মাত্রাবৃত্তে বিহারীলালের অনিচ্ছাকৃত প্রতিধ্বনি যেন প্রায়ই শোনা যায়; এবং শুধু তাই নয়, তার ধ্বনিপ্রবাহ সুদ্ধ বিহারী-কাব্যের মতো ক্লেশকর রকমের একটানা। তবে বালক রবীন্দ্রনাথও বয়স্ক বিহারীলালের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও অধিক সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন; এবং সেই জন্যে হয়তো বা জ্ঞাতসারেই তিনি তখনকার দীর্ঘ কবিতাগুলি হয় এক ছন্দে লেখেননি, নয় পর্ব-পর্বাঙ্গের দৈর্ঘ্য যথাসম্ভব বাড়িয়ে, অথবা পদান্ত মিলের মধ্যে অপ্রত্যাশিত অবকাশ ঢুকিয়ে, সেগুলির বৈচিত্র্য-সাধন করেছেন। এমনকি সে-কালের কোনও কোনও কবিতা মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের সংমিশ্রণে বর্ণসঙ্কর; এবং যাঁদের ছন্দোজ্ঞান আমার চেয়ে সূক্ষ্ম, তাঁদের কাছে উক্ত কবিতাগুলির সৌজাত্য যদি বা নিঃসংশয় ঠেকে,

তবু "ছবি ও গান"-এর "দোলা", "একাকিনী", "আদরিণী", "খেলা", "বিদায়" প্রভৃতির ছন্দোলিপি বানাতে তাঁরাও বেশ খানিকটা বেগ পাবেন।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তখনও বোঝেননি যে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ইংরাজীর বিপরীত; এবং পর্ব-পর্বাঙ্গের আকারে-প্রকারে যিনি খুশিমতো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে না পারেন, সে-ইংরাজ যেমন 'ছান্দসিক'-উপাধির যোগ্য নন, তেমনই যতিমধ্যস্থ মাত্রাপরিমাণের সাম্য না রাখলে, বাংলা পদ্য-রচনার চেষ্টা পণ্ড শ্রম। অবশ্য তৎসত্ত্বেও বাংলা কবিতা আদৌ পঙ্গু নয়; এবং চরণের প্রথম পর্বে না হোক, শেষ পর্বে যদি অল্প-বিস্তর পরিবর্তন না থাকে, তবে বাঙালীর কান সাধারণত অস্বস্তিবোধ করে। কিন্তু আগের চরণে দুটো পঞ্চমাত্রিক পর্ব বসিয়ে পরের চরণে চার আর ছয়মাত্রার সংযোজন বোধহয় বাংলা ছন্দে চলে না; এবং উল্লিখিত কবিতাসমূহে এই জাতীয় পদপরম্পরা অবিরল ব'লেই, সেগুলি স্বাধীন নয়, স্বেচ্ছাচারী। অথচ সেগুলির গদ্যোচিত গতিভঙ্গি প্রায় যুক্তাক্ষরবর্জিত; তাদের বিষয়বস্তু অত্যধিক, এমনকি অন্যায় রকমের, কবিত্বময়; এবং তাই রবীন্দ্রনাথ এ-ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ছন্দোমুক্তির উপায় খুঁজে পাননি, জেনেছিলেন যে আধো আধো কথা কইবার জন্যেই দুঃসাধ্য স্বরশুদ্ধির প্রয়োজন, নচেৎ ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার যত না প্রশস্ত, ততোধিক স্বাভাবিক। তাহলেও হয়তো গণিতের মতোই ছন্দঃশাস্ত্রও স্বাবলম্বীর প্রসাদ-পুষ্ট; এবং আমার বিশ্বাস "ছবি ও গান"-এর পরীক্ষালব্ধ ব্যর্থতা ব্যতীত "মানসী"-র বিস্ময়কর সাফল্য সত্যই অভাবনীয়।

অবশ্য ঠিক কী প্রণালীতে মাত্রাচ্ছন্দের চির রহস্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছিল, তা শুধু তিনি নিজে জানেন; এবং "মানসী" যেকালে ধাতুগত অর্থেই অভূতপূর্ব, তখন সে-পুস্তকে কবিপ্রতিভার যাদৃচ্ছিক দিকটা আপাতত সুপরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক আত্মোপলব্ধি "মানসী"-তে লিপিবদ্ধ ব'লেই, সে-বই অবিস্মরণীয় নয়, বাংলা ছন্দের নববিধানও সেখান থেকে শুরু; এবং তাতে যদিও লেখক কোনও নূতন সূত্রের উদ্ভাবন করেননি, তবু তার মধ্যে প্রচলিত ও পরিত্যক্ত বিধি-

নিষেধের যে-সামান্যীকরণ ঘটেছিল, তা বোধহয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে আইন্‌ষ্টাইনী কীর্তির সমগোত্রীয়। কারণ প্রাগ্‌-আইন্‌ষ্টাইন্‌ গণনায় যেমন রবিনীচস্থ বুধের অপচার অব্যাখ্যাত থাকত, তেমনই রবীন্দ্রপূর্ব ছন্দঃপ্রকরণে বাঙালীর চক্ষু-কর্ণের বিবাদ অনেক সময়ে মিটত না; এবং ক্ষেত্রানুসারে প্রতিমান না বদ্‌লে, ষ্ট্যাটোনীয় জ্যোতির্বেত্তারা যতখানি গণ্ডগোল বাধিয়েছিলেন, অক্ষর, মাত্রা ও স্বরাঘাতের ব্যাবহারিক প্রভেদ না বুঝে ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকারীরা পড়েছিলেন তার চাইতে বেশী বিপদে। অর্থাৎ "মানসী"-প্রকাশের পরে তৎপূর্ববর্তী কাব্যের দুষ্ট আঙ্গিক আর ঢাকা রইল না; এমনকি দেখা গেল যে "মানসী"-প্রণেতার প্রাক্কালীন রচনাবলী পর্যন্ত গবেষণাসংক্রান্ত ভুল-চুকে ভরা; এবং যেহেতু সেই গবেষণার ফলাফলই আধুনিক বাংলা কবিতার ভিত্তি, তাই আজকালকার অকবিরাও স্বভাবত রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক স্খলন-পতন এড়িয়ে যান।

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে উপরের প্যারাগ্রাফে অক্ষর, মাত্রা ও স্বরাঘাতের প্রভেদকে আমি ব্যাবহারিক বলেছি; এবং বাংলা ছন্দে ঐ পার্থক্য বস্তুত স্বীকৃত কিনা, তা অনেকের মতে এখনও অনিশ্চিত। অন্ততঃপক্ষে ছন্দো-বিজ্ঞানী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস যে সংস্কৃতের মতো বাংলা অক্ষরও ইংরাজী সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিশব্দ; এবং এই অবিভাজ্য ধ্বনিপিণ্ডই সর্ববিধ বাংলা ছন্দের অনন্য উপাদান। কিন্তু বাংলা ছন্দের মূলে ত্রৈগুণ্য থাক বা না থাক, তার রচনাপদ্ধতির ত্রিত্ব আমার বিবেচনায় অলঙ্ঘনীয়; এবং ধ্বনি ও বিরামের এককালীন সাম্য ও বৈচিত্র্য যদিও ছন্দোমাত্রেরই প্রাণ, তবু কেবল অক্ষর গুণে বোধহয় বোঝা যায় না চতুরাক্ষরা কাব্যলক্ষ্মী কেন পয়ারে মাত্রাবৃত্তের চেয়ে কম জায়গা জোড়েন। তবে বাংলা ছন্দ যে যতিপ্রধান, এ-সিদ্ধান্তে তর্কের অবকাশ নেই; এবং এ-সত্য এ-দেশের প্রত্যেক সৎকবি জানতেন বটে, তথাচ "মানসী"-র "নিষ্ফল কামনা"-কবিতাটিতে রবীন্দ্র-নাথই প্রথম দেখান যে অগত্যা পর্ব-পর্বাঙ্গের আকার-প্রকার অপরিবর্তিত রাখলেও, শুধু যতিস্থাপনার বৈলক্ষণ্যে পয়ারে অবধি আর্যার নিত্যনব ভঙ্গি জাগে। উপরন্তু ঐ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত দুটি ষড়াক্ষর পর্বকে একটি চরণে একত্রে এনেছেন; এবং এ-রকম

পদরচনা সাধারণত মাত্রাচ্ছন্দেই শোভন। অথচ "নিষ্ফল কামনা"-র পরিণত সংস্করণ "বলাকা"-তে এই জাতীয় পঙ্‌ক্তি খুবই সুলভ ; এবং তাতে যখন আমি ছাড়া আর সকলে, এমনকি কবি নিজেও, খুশী, তখন অমূল্যধনের অনুমান হয়তো নির্ভুল—অক্ষরই বাংলা ছন্দের তন্মাত্র।

আমার নাতিক্ষুদ্র জীবনের অনেকখানি পদ্য লেখার ব্যর্থ চেষ্টায় কেটেছে ব'লে, আমি "মানসী"-র আঙ্গিক-বিচারে এতটা সময় দিলুম ; এবং পণ্ডিতেরা যাই ভাবুন না কেন, আধুনিক বাংলার সকল কবিযশঃপ্রার্থী জানেন যে অক্ষর ও মাত্রার প্রাঙ্-"মানসী" ঐক্য মানলে, অন্তত বিদগ্ধ সমাজে তাঁদের আসন জুটবে না। কিন্তু "মানসী"-র বিপ্লবী দিকটা যদি বাদ দেওয়া যায়, তবু তার বেশ কিছু অবশিষ্ট থাকে ; এবং সে-পুস্তকেও রবীন্দ্রনাথের বিরাট্ ব্যক্তিস্বরূপ সংশয়মুক্ত নয় বটে, কিন্তু তাতে দেশ-কালের প্রভাব প্রায় নগণ্য, অথবা বিষয়নির্বাচনের মধ্যে আবদ্ধ। অর্থাৎ ব্যঞ্জনায়, তথা দৃষ্টিভঙ্গিতে, সে-বই বিশেষ রকমে স্বকীয় ; এবং অগত্যা তা বঙ্গীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কারণ এত দিনে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে তাঁর মনের ধর্ম লিরিক্। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন তাঁর কাছে এমনই সঙ্কীর্ণ লেগেছিল যে এখানকার সর্বগ্রাহী এপিক্ চিত্তবৃত্তিকে তিনি অতঃপর আর প্রশ্রয় দেননি ; এবং সেই জন্যে আত্মোপলব্ধির প্রথম উন্মাদনাতেও তিনি উল্লাস খুঁজে পাননি—"মানসী" ও "সোনার তরী"-র ভিতরে ভিতরে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল বিবিক্তির বিষাদ। অবশ্য স্থানীয় প্রকৃতিকে তিনি আবাল্য ভালোবাসতেন ; এবং নিসর্গের মহত্ত্ব তাঁকে পারিপার্শ্বিক মানুষের ক্ষুদ্রতা ভোলাত। তাহলেও "মানসী"-তে আমরা যে-প্রকৃতিকে দেখি, তার সঙ্গে বঙ্গীয় পল্লীশ্রীর সাদৃশ্য নিতান্ত বাহ্য ; এবং তাই রবীন্দ্রনাথ সে-প্রসঙ্গেও প্রাচীন কবিদের মতো স্বভাবোক্তি করেননি, সাধারণত তিনি প্রাদেশিক রঙে বিশ্বপ্রকৃতির ভাবমূর্তিই এঁকেছেন।

নিরাসক্ত নিসর্গবিলাসের মতো নিষ্কাম প্রেমও বাঙ্গালীর চরিত্র-বিরোধী ; এবং "মানসী"-তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বৈশিষ্ট্যই বর্তমান, দ্বিতীয়টির সাক্ষাৎ মেলে না। তথাচ "মানসী"-র আদিরস "কড়ি ও কোমল"-এর চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ ; এবং "সোনার তরী"-র প্রণয়বিষয়ক কবিতা-

গুলিতে সাময়িক সমালোচকেরা যে-অশ্লীলতার সন্ধান পেয়েছিলেন, তার কারণ বোধহয় এই যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কাব্যে তখনও তাঁদের অভ্যাস জন্মায়নি। বস্তুত তাঁর ভাগবত কবিতাতেই সাধকোচিত সমর্পণের অভাব ধরা পড়ে, তাঁর প্রেমগাথায় দেহাতীত সংসক্তির অপ্রতুল দেখা যায় না; এবং "ব্যর্থ যৌবন", "প্রত্যাখ্যান" প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে "খেয়া", "গীতিমাল্য" ইত্যাদির একাধিক কবিতার পার্থক্য এইখানে যে "সোনার তরী"-র যুগে তাঁর মধ্যে ভূমানন্দের আভাস জাগেনি, তখনও পর্যন্ত বিশ্ববিরহের অভিজ্ঞা তাঁকে অভিভূত ক'রে রেখেছিল। উপরন্তু সেই অসদ্ভাবের জন্যে দায়ী ছিল তাঁর অহংজ্ঞান; এবং "সোনার তরী"-র "লজ্জা"-শীর্ষক কবিতায় উক্ত অহমিকা যেমন বৃথা সঙ্কোচের ছদ্মবেশ প'রে তাঁর পূর্ণ মিলনে প্রতিবন্ধক ঘটিয়েছিল, তেমনই সোনার তরীতে তাঁর জায়গা হয়নি আত্মপ্রসাদেরই ভারে। অতএব "মানসী" ও "সোনার তরী"-কে একত্রে নিলে, রবীন্দ্রনাথের ভূত-ভবিষ্যৎ, দুইই, আমাদের গোচরে আসবে, বাকী থাকবে শুধু তাঁর ক্ষণস্থায়ী প্রতর্ক, যার প্রজ্ঞাপারমিত রূপ "ক্ষণিকার"-র অনুপম ঐশ্বর্য।

রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন গদ্য অনুরূপ সাফল্যে ও সম্ভাবনায় বঞ্চিত; তার মধ্যে বিদ্রোহের উন্মাদনা নেই, তার গতিবিধি মোটের উপরে বঙ্কিমী; এবং তৎসত্ত্বেও তাতেই তিনি স্বীয় ব্যক্তিস্বরূপের ছাপ ফুটিয়েছেন বটে, কিন্তু অন্তত আরও বিশ বছর না কাটা পর্যন্ত তিনি বোঝেননি যে সাধু বাংলার বাক্যগঠনপদ্ধতি এমনই অকষ্টবদ্ধ ও গতানুগতিক যে তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাহন হিসাবে প্রায় অব্যবহার্য। পক্ষান্তরে তিনি শৈশবান্তেই ঠিক করেছিলেন যে তাঁর পত্রালাপ সুদ্ধ সাহিত্যসাধনার অঙ্গ; এবং হয়তো সেই জন্যে তাঁর অনেক চিঠি যেমন প্রবন্ধের মতো শোনায়, তেমনই তাঁর পোষাকী রচনাকে মাঝে মাঝে আটপৌরে রকমের অন্তরঙ্গ লাগে। অথচ তাঁর সাবেকী ভাষা বঙ্কিমের মতো গুরু-চণ্ডালী দোষে দুষ্ট নয়; তাতে সর্বনামের লিখিত ও কথিত রূপের শ্রুতিকটু সংমিশ্রণ বড় একটা নেই; এবং তিনি যেহেতু শুরু থেকেই জানতেন যে প্রাকৃত বাংলায় কৃ-ধাতু ছাড়া আরও বহু ক্রিয়াপদ চলে, তাই সাধু হয়েও তাঁর গদ্য কখনও স্থবির নয়,

সর্বদা বেগবান। তবে শুধু ক্রিয়াধিক্য এই চলৎশক্তির একমাত্র কারণ নয়; দীর্ঘ সমাসের অভাবও উক্ত গদ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য; এবং ধ্বনির খাতিরে অথবা অর্থগৌরবের তাগিদে তিনি যদিও বার বার সংস্কৃত শব্দ-কোষের শরণ নিয়েছেন, তবু তিনি কদাচিৎ ভোলেননি যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র ও স্বগত।

উপরন্তু গদ্য স্বভাবত পরজীবী: অন্ততঃপক্ষে পদ্যোচিত স্বাবলম্বন ও শুদ্ধি তার সার্থকতা বাড়ায় না; এবং তখনকার একাধিক দৌর্বল্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গদ্য বক্তব্যের অসামান্যতা-বশত অবিস্মরণীয় ও অনন্যসাধারণ। অবশ্য সে-বক্তব্যের অনেকখানিই তাঁর স্বরচিত নয়, তাকে তিনি পেয়েছিলেন পশ্চিমের জ্ঞানভাণ্ডার ঘেঁটে; এবং রামমোহনী যুগ থেকে পাশ্চাত্ত্য ভাবনার চর্বিতচর্বণ বুদ্ধিমান বাঙালীর আত্মকৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পূর্ববর্তীদের তফাৎ এই যে তিনি তাদের মতো ভাব আর ভাষার মধ্যে ব্যবধান রাখেননি, ভাবের গতিকে ভাষার গতিপরিবর্তন অনিবার্য বুঝে সাধু বাংলার কাঠামোকে এমন ক'রে বদলেছিলেন যাতে তার স্বধর্ম বজায় থাকে, অথচ প্রসঙ্গের বিকার না ঘটে। হয়তো বা সেই জন্যে "পঞ্চভূত" ও "আত্মশক্তি" কালে-ভদ্রে বৈদেশিক সুরে বাজে; কিন্তু যখন স্মরণে আসে যে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি পূর্ব-পশ্চিমের সংঘর্ষে, তখন আর রবীন্দ্রনাথকে আদৌ বিজাতীয় লাগে না, বরং তাঁর গদ্য সাধ্যপক্ষে মৌখিক ভাষার তালে চলে ব'লে, তাকেই অপেক্ষাকৃত কম কৃত্রিম মনে হয়। সর্বোপরি বিষয়মাহাত্ম্যে তার সকল দোষ খণ্ডায়; এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রবন্ধাদিতে এই সব মূল প্রত্যয়ের প্রকৃষ্টতর অভিব্যক্তি যদিও মোটেই দুর্লভ নয়, তবু অনভ্যস্ত মননশক্তির প্রথম উদাহরণ হিসাবে এই লেখাগুলিই অধিক বিস্ময়কর।

বস্তুত রবীন্দ্ররচনাবলীর উত্তর কাণ্ড একটু বেশী শুদ্ধ; এবং প্রকরণকে প্রসঙ্গের উপরে প্রাধান্য দিয়েই তাঁর প্রতিভা পরিণতির দিকে এগিয়েছে। অবশ্য সে-জন্যে গত পঞ্চাশ বছরের প্রত্যেক লেখক তাঁর কাছে ঋণী; এবং তাঁর চেষ্টায় সমগ্র বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা এতখানি বেড়ে গেছে যে আজকালকার হৃদয়বান বাঙালীরা প্রায় সকলেই সাহিত্যিক। কিন্তু বাংলার

পাঠকসাধারণ এখনও বোধহয় তাঁর বিষয়াশ্রিত রচনারীতির পক্ষপাতী। অন্ততঃপক্ষে তাঁর পুরাকালীন গল্প ও উপন্যাস যত সহজে আমাদের অবসর-বিনোদ করে, তাঁর ইদানীন্তন কথাসাহিত্যে আমরা তত সহজে অভিনিবিষ্ট হই না। কারণ তাঁর সাম্প্রতিক উপাখ্যানে বাহ্য ঘটনার বাহুল্য নেই: বাইরের সামান্য অভিঘাতে মানুষের মন কতটা উল্‌টে-পাল্‌টে যায়, তার বর্ণনাই অনেক দিন যাবৎ তাঁকে কথকতার প্রেরণা যোগাচ্ছে; এবং পরের মনও যেহেতু আত্মদর্শনের সাহায্যেই জ্ঞাতব্য, তাই অনবদ্য আঙ্গিক সত্ত্বেও তাঁর এখনকার লেখা হয়তো একটু ক্লেশকর রকমের আত্মজৈবনিক। তার মানে এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নায়ক-নায়িকারা তাঁরই অংশভাক্; বরঞ্চ "ঘরে-বাইরে"-র সন্দীপ অথবা "যোগাযোগ"-এর মধুসূদন অনাত্মীয় উপাদানে তৈরী ব'লেই, নিখিলেশ ও বিপ্রদাসের চেয়ে জীবন্ত। তবে রবীন্দ্রনাথ আগা-গোড়াই তাদের বিদ্বেষের চক্ষে দেখেছেন; এবং "চোখের বালি"-র বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত তাঁর বিচারসংবৃত অনুকম্পার পাত্রী।

আত্মবিশ্বাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিষয়াসক্তিতে ভাঁটা না লাগলে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই নাট্যরচনার প্রচলিত রীতি পরিহার করতেন না, আজীবন ধ্রুপদী উপায়েই নাটক লিখতেন; এবং প্রথম বয়সেও বিসদৃশ চরিত্রের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল ব'লেই, "গোড়ায় গলদ" বা "চিরকুমার সভা" ইত্যাদি প্রহসনে পর্যন্ত কুশীলবেরা গৌণ, নাট্যকারের শাণিত শ্লেষোক্তিই মুখ্য। তথাচ তাঁর এই সময়কার নাটক-কখানি, অন্তত আমার মতে, পরবর্তী রূপকাদির চেয়ে প্রাণবন্ত; এবং তৎসত্ত্বেও "রাজা ও রাণী" ও "বিসর্জন"-এর বাগ্‌বাহুল্য ও বয়নশৈথিল্য যদিও এত বেশী যে সে-দুটি আধুনিক কালের উপযোগী নয় ভেবে রবীন্দ্রনাথ উভয়ের নামটুকু ছাড়া আর সবই বদ্‌লে দিয়েছেন, তবু সাম্প্রতিক সংস্করণেও বই দুখানি শুধু বুদ্ধিজীবীদের সাধুবাদ পায় না, সাধারণ দর্শককেও মাতিয়ে তোলে। এমনকি ঘটনাঘটনের ইচ্ছাকৃত অভাবেও "চিত্রাঙ্গদা"-র সক্রিয়তা হারিয়ে যায়নি; এবং "অচলায়তন", "রাজা", "রক্তকরবী" প্রভৃতির মতোই তাতেও রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানত নীতিকারের ভূমিকা নিয়েছেন বটে, কিন্তু ভাবসংবেগের প্রাবল্যে তথা অবৈকল্যে সে-নাটিকা রবীন্দ্র-

সাহিত্যে প্রায় অদ্বিতীয়। তবে আমার বিবেচনায় রাবীন্দ্রিক নাট্যপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা "মুক্তধারা"-তে ; এবং "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে তাঁর আগামী পরিণতির অন্য সমস্ত দিক যেমন সূচিত, তেমনই "মুক্তধারা"-র প্রতিশ্রুতি নেই।

"চিত্রাঙ্গদা"-র দুর্নীতি-সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমুখ সমালোচকদের দুরুক্তি স্মরণে এলে, আজ হাসি পায় ; এবং তখন যদি মনে পড়ে যে অত্যাধুনিক সাহিত্যের কুরুচি-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও প্রায় অনুরূপ হঠোক্তি করেছেন, তবে পুনর্বাদী ইতিহাসের ব্যঙ্গে আমাদের উপভোগ আরও বাড়ে। তথাচ রবীন্দ্রনাথের দুর্হৃদ মনোভাবে শুধু অনুকম্পার অভাব আছে ; এবং যাঁরা "চিত্রাঙ্গদা"-র বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছিলেন, তাঁদের নির্বুদ্ধি যুগধর্মের নির্বন্ধেও মার্জনীয় নয়। কারণ "চিত্রাঙ্গদা"-র স্থানে স্থানে ইন্দ্রিয়াসক্তির গুণ-গান যতই উগ্র হোক না কেন, সম্পূর্ণ নাটিকাখানি নিতান্ত নীতিপ্রধান ; এবং তার সারমর্ম এই যে কামনার পরিতৃপ্তি যেহেতু মানুষের আত্মপ্রসাদ জাগায় না, আত্মধিক্কার ঘটায়, তাই শারীরিক মিলনের চেয়ে আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধ, কেবল ন্যায়ত নয়, কার্যতও ভালো। অবশ্য এই সনাতনী সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের ধ্রুবপদ ; এবং এর আরম্ভ যেমন কৈশোরিক "জাগরণ"-এ, এর চূড়ান্ত অভিব্যক্তি তেমনই "পূরবী" পেরিয়ে "শেষের কবিতা"-য়। তাহলেও "চিত্রাঙ্গদা"-য় কথাটাকে তিনি যত ঋজু, যত বিস্তারিত, যত রূপকবর্জিত ভাবে বলেছেন, অন্যত্র তার তুলনা নেই ; এবং সেই জন্যে ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বিশেষত এই বইখানি বাঙালী বিবেচকদের কাছে অশ্লীল ঠেকেছিল। অথচ এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প'ড়ে ই. এম্. ফর্স্টার লিখেছিলেন যে এতে রবীন্দ্রনাথ বিরাট্ কবিত্বশক্তির পরিচয় দেননি বটে, কিন্তু প্রাচ্যসুলভ শালীনতার সংস্পর্শে এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি সম্ভ্রান্ত ও সুন্দর ; এবং ১৯১৪ সালেও ফর্স্টার রবীন্দ্রবন্দনার ঐকতানে সুর মেলাননি, বরঞ্চ আরও কয়েক বৎসর কাটতে না কাটতে তিনি বহু-প্রশংসিত "ঘরে বাইরে"-তে রবীন্দ্রনাথের কুরুচিই দেখেছিলেন।

উপসংহারে "রবীন্দ্র-রচনাবলী"-র* সম্পাদনা-প্রসঙ্গে দু-চার কথা না বললে,

* রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ( বিশ্বভারতী )

এ-দীর্ঘ প্রবন্ধ যেন থামতে চাইছে না ; এবং সে-কার্য কী উপায়ে আরও সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যেত, তা আমি জানি না বটে, কিন্তু বর্তমান প্রণালীর একাধিক অসুবিধা আমার কাছে স্পষ্ট। প্রথমত এ-সংস্করণ সম্পূর্ণ নয় : রবীন্দ্রনাথের জেদে তাঁর বাল্যরচনা এর থেকে বাদ পড়েছে ; এবং তৎসত্ত্বেও এতে তাঁর রসোত্তীর্ণ লেখাই জায়গা পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক খণ্ডে গদ্য, পদ্য, নাটক ও গান একত্রে ছাপার ফলে অনেক সময়ে রচনাকালের পৌর্বাপর্য থাকছে না ; এবং সেই জন্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারাবাহিক ইতিহাসে যাদের প্রয়োজন, আলোচ্য সংস্করণ তাদের উপকারে লাগবে না। তৃতীয়ত এ-সংগ্রহের কালসূচীতে গ্রন্থপ্রকাশের সনই যেহেতু গণ্য, বিশেষ লেখার জন্মতারিখ ধর্তব্য নয়, তাই "ভানুসিংহের পদাবলী"—যার উৎপত্তি "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর বহু পূর্বে—দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভেই সন্নিবিষ্ট, যদিও প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছিল কবির ত্রিশ বৎসর বয়সের লেখা "য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি"-তে। পক্ষান্তরে কোনও প্রথম সংস্করণ এখানে প্রামাণ্য নয় ; কিন্তু বিষয়গত ঐক্যের খাতিরে গ্রন্থকর্তা নিজে এক পুস্তকের রচনাবিশেষকে পরে অন্যত্র ছেপেছিলেন ব'লে, আজও সে-রচনা যথাস্থানে ফিরতে পারছে না। চতুর্থত এ-সঙ্কলনের পাঠনির্বাচন অত্যন্ত খামখেয়ালী : কবির অনুরোধে প্রথম পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত ; অথচ কোথাও কোথাও—যেমন "রাহুর প্রেম" কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে—আদিম ছন্দঃপতন সুদ্ধ সাদরে রক্ষিত।

[ ১৯৪০ ]

# ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ

হর্বর্ট্ স্পেন্সর নাকি গদ্য-পদ্যের প্রভেদ-নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওই দুই রচনারীতির তারতম্য কেবল মুদ্রাকরের মর্জির উপরে প্রতিষ্ঠিত : এক পাতা ছাপা গদ্যের চার দিকে যে-পাড় থাকে, তা সমান্তর, আর পদ্যের কিনারা বন্ধুর। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ ; এবং হয়তো সেই জন্যে ওই ধরণের মৌল ব্যাখ্যায় আমার অবিদ্যা কাটে না, মন হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রণালী-দুটির পার্থক্য আমার কাছে যতই সুস্পষ্ট ঠেকুক না কেন, গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত বিরোধ আমি আজ অবধি ধরতে পারিনি, বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার সঙ্গমই সাহিত্যতীর্থ-নামে সুপরিচিত ; এবং এ-মতকে প্রথমে যদিও অতিরঞ্জিত লাগে, তবু এর সমর্থন শুধু সময়সাপেক্ষ। কারণ গদ্যবিলাসীরাও নিশ্চয়ই দেখেছেন যে রচনাবিশেষের আবেদন যখন বুদ্ধি-বিবেচনার পাহারা এড়িয়ে একেবারে তাঁদের অন্দরে ধাক্কা দেয়, তখন যেন আর কাব্যের থেকে তার তফাৎ চেনা যায় না ; এবং কাব্যামোদীও অনুরূপ অভিজ্ঞতার ভুক্তভোগী : প্রায়ই এমন কবিতা তাঁর হাতে আসে যার মধ্যে, ছন্দ, মিল, উপমা, অনুপ্রাসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, কাব্যের লেশমাত্র মেলে না, যার রাজকীয় অলঙ্করণের ফাঁকে ফাঁকে দৈনন্দিন দাস্যের গদ্যময় দীনতা মুহুর্মুহু উঁকি পাড়ে।

এত বাক্যব্যয়ের তাৎপর্য এই যে রসের নিমন্ত্রণে জাতিভেদ নেই—সেখানে গদ্য-পদ্য উভয়েরই সমান অধিকার, বিচার্য কেবল প্রবেশপ্রার্থীর মহানুভবতা, আবেগের গভীরতা আর কার্য-কারণের সুসঙ্গতি ; এবং সাহিত্য যেহেতু মূলত জীবনেরই প্রতিবিম্ব, তাই আমার মতে গদ্য-পদ্যের যে-সমন্বয়

সাহিত্যে দ্রষ্টব্য, তার দৃষ্টান্ত জীবনেও সুলভ। মলিয়ের-এর একজন নায়ক শুনে চমকে গিয়েছিলেন যে তিনি আজীবন না জেনে গদ্য আউড়ে এসেছেন; এবং আমাদের মতো আষ্টপ্রহরিক মানুষেরাও হৃদয়াবেগের তাগিদে বৎসরে যত বার কবিতায় কথা কই, তার তালিকা সত্যিই বিস্ময়কর। তবে সেই জন্যে গদ্য-পদ্যের ঐক্য অবশ্যগ্রাহ্য নয়; এবং বোধহয় সকল সভ্য মানুষ আবহমান কাল এদের দ্বৈধ স্বীকার ক'রে চলেছে। যত দূর মনে পড়ে, এমন কোনও ভাষা নেই যাতে এই দুই সংজ্ঞার বাহক-রূপে কেবল একটিমাত্র শব্দকে দেখা যায়; এবং আমি যখন শব্দব্রহ্মে আস্থাবান নই, বুঝি যে মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়ের মতো ভাষাও আবশ্যিকতার চালনে গ'ড়ে উঠেছে, তখন আমি মানতে বাধ্য যে ও-দুটো অভিধার মধ্যে অর্থের বৈষম্য সহজ ব'লেই, ওদের আক্ষরিক চিহ্ন বিভিন্ন।

পক্ষান্তরে গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব চাপে, তখন আর এই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা তাদের স্ব স্ব মূলধন একত্র ক'রে যে-যৌথ কারবার পাতে, তাই জনসমাজে পায় কাব্য-আখ্যা; এবং কাব্য যে মানবচৈতন্যের শুদ্ধতম অবস্থা, এ-প্রসঙ্গেও আজ আর মতভেদ নেই। অর্থাৎ কাব্যের মধ্যস্থতায় যে-বস্তুকে চেনা যায়, তার সম্বন্ধে প্রতর্ক নিষিদ্ধ; এবং নেতি-নেতিই সে-পরিচয়ের বাচনিক অভিব্যক্তি বটে, কিন্তু তার কেন্দ্র নঙর্থক নয়, একটা অতিনিশ্চিত উপলব্ধির উৎস। ফলত কাব্যলব্ধ বস্তু অনেক সময়েই অনির্বচনীয়, কোনও কালে অজ্ঞেয় নয়; এবং কথাগুলো প্রথমত মরমীদের অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও, ব্যাপারটির সঙ্গে কার্যত আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। এমনকি অধিকাংশ যাদুকর ভোজবাজি দেখায় এই উপায়ে; এবং ব্যাস-বাল্মীকির বংশধরদের মতো ভানুমতির শিষ্যেরাও তাদের চিরাচরিত করকৌশলকে হয় সঙ্গীতের আচ্ছাদনে, নয় অনর্গল বক্তৃতার আড়ালে, এমনই বেমালুম ভাবে লুকায় যে মোহমুগ্ধ দর্শক অগত্যা ভাবে সে অলৌকিক রহস্যের সম্মুখীন। কারণ একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনির সাহায্যে দর্শক বা পাঠকের মনে যে-আবিষ্ট তন্ময়তার সৃষ্টি হয়, তা স্বপ্নাবস্থার

অনুরূপ ; এবং সে-অবস্থার বৈশিষ্ট্যই যেহেতু অনিকামতা—আদেশ-উপদেশগ্রহণের অপার ক্ষমতা, তাই সে-ধরণের সংক্রামেই সাপুড়ে সাপকে বশে আনে আর হিপ্নোটিস্ট্ হিস্টিরিয়া-রোগীকে স্বাস্থ্যের পথে চালায়।

তবে পালনীয় আদেশ-মাত্রের যেটা সনাতন লক্ষণ, এখানেও তার ব্যতিক্রম চলে না—অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রেও আজ্ঞাকারীর মনে আত্মপ্রত্যয় এবং আজ্ঞায় সহজবোধ্য নিশ্চয়তা একেবারেই অপরিহার্য। কাব্যের গদ্যময় অংশ এই প্রাঞ্জল বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যাপৃত থাকে ; এবং পদ্য নেয় পূর্বোক্ত সমাধি-উৎপাদনের ভার। Cover her face, mine eyes dazzle, she died young—এ-রকমের একটা নিরবলম্ব পঙ্ক্তি বাস্তব জীবনে যদি হঠাৎ কানে বাজে, তাহলে সেটাকে পাগলের প্রলাপের মতো শোনাতে পারে। কিন্তু এই লাইনের অহৈতুক প্রভাব এড়িয়ে অরসিকেরা যখন হাসে, তখন তারা ভুলে যায় যে ওয়েব্স্টর কেবল ওই কটা কথাকে পর পর সাজিয়েই নিস্তার পাননি, ওই বাণী যাতে দৈববাণীর মতো অমোঘ হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করেছিলেন পূর্বগামী পদ্যের মোহময় কল্লোলে। শেক্স্পীয়র-এর রচনারীতিও অনুরূপ : সেখানেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এই প্রস্তুতিতে কাটে ; এবং তার পরে, পাঠকের মন সেই উদাত্ত ধ্বনিহিল্লোলে ঝিমিয়ে পড়লে, আসে কবির দুর্নিবার প্রত্যাদেশ—absent thee from felicity awhile। তত ক্ষণে পাঠক আপত্তি-বিপত্তির ক্ষমতা হারায় ; এবং তদবস্থায় সেই অকিঞ্চিৎকর শব্দ-কটা তার কাছে অগত্যা ওঙ্কারের মতো প্রাথমিক ঠেকে—সে আর না ভেবে পারে না যে হ্যাম্লেট্-এর চিরপ্রয়াণের সঙ্গে তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মঞ্চেও, কিছু দিনের জন্যে নয়, চির কালের মতো, যবনিকা নামল।

ধ্বনিরচনা মুখ্যত পদ্যের কর্তব্য হলেও, গদ্য সে-সম্পদে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এমন ধারণা অগ্রাহ্য। তবে এ-ক্ষেত্রে উভয়ে তুল্যমূল্য নয়। পদ্যের ধ্বনি সাধারণত সমমাত্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু গদ্য সর্বত্রই বৈচিত্র্যময়—তার উত্থান-পতন অর্থ ভিন্ন অন্য কোনও বিধি-নিষেধ মানে না। এই স্বাধীনতার স্বভাবদোষে গদ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয়, এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার লাভের অঙ্ক যে লোকসানের হিসাবকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে

যায়, তা নিতান্ত নিঃসন্দেহ। কারণ বিজ্ঞানজগতে অনর্থ আজ যতই সম্মান পাক না কেন, ললিত কলায় অর্থই এ-যাবৎ অন্বিষ্ট ; এবং গদ্য যেহেতু অর্থপ্রধান, তাই পদ্যের পরে জ'ন্মেও শক্তিতে ও সম্ভাবনায় সে ইদানীং জ্যেষ্ঠের উচ্চবর্তী। অবশ্য পদ্যের উপকারিতা এখনও একেবারে ঘোচেনি —ভাবের ছায়াময় রাজ্যে পদ্যই আজও পুরোধা ; এবং যৌবনসুলভ চাপল্যের চালনে গদ্যও যখন কালে-ভদ্রে এই রাজ্যের সীমানায় এসে পড়ে, তখন সে অগত্যা এখানকার হালচাল-সম্বন্ধে অগ্রজের উপদেশ শোনে। কিন্তু কাম্য যেখানে বর্ণনা, প্রয়োজন যেখানে সংবাদের, সন্দেহ-ভঞ্জনই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, যেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যবধান এত গভীর যে ঘনিষ্ঠতার স্বপ্ন সুদ্ধ বিড়ম্বনা, যেখানে সংক্রমণ অসাধ্য, সম্ভব কেবল জ্ঞাপন, সেখানে গদ্যের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়াই স্বাভাবিক।

বিধাতা জগৎকে এক স্তরে ঢালেননি। তার মৌলিক তত্ত্ব হয়তো শুধু সমাধিলব্ধ দিব্যদৃষ্টির গোচর ; কিন্তু সেই জন্যে উপরের স্তরগুলো অজ্ঞেয় নয়, বরং সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। সুতরাং অ্যারিস্টটল্-এর মতো যাঁরা ভাবেন যে কাব্যাদর্শ জীবনেরই মুকুর, তাঁরা সেই প্রতিবিম্বে স্থূল স্তবকগুলোর স্থান ক'রে দিতে বাধ্য ; এবং গদ্য-পদ্যের স্বভাব যদি সত্যই বিভিন্নধর্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্যে অথবা বিশুদ্ধ পদ্যে উক্ত জীবননিষ্ঠ কাব্য কিছুতে গড়া যাবে না—তার জন্যে প্রয়োজন এমন এক বাহকের যার মধ্যে কোনও বাছ-বিচার নেই, যাতে খুশিমতো গদ্য থেকে পদ্যে এবং পদ্য থেকে গদ্যে যাতায়াতের পথ রয়েছে। কাব্যের এই ধাতুসঙ্করে নির্মিত আধারটির নামই মুক্তচ্ছন্দ—free verse। তাতে নূতন-পুরাতন সকল বয়সের সুরাই ইচ্ছানুসারে মেশানো চলে, অথচ পাত্র ফাটবার কোনও ভয় থাকে না। সে-ছন্দকে উপলক্ষের তাগিদে পদ্যের নিয়মে দরবেশী নৃত্যে নামানো সম্ভব, আবার অবস্থান্তর ঘটলে, গদ্যের অনিয়মিত গতিও তাতে বেখাপ্পা লাগে না। সে সন্ন্যাসীর ভেক নেয়নি বটে, কিন্তু তাই ব'লে যে সময়ে সময়ে গৈরিক পরে না, এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও অনেক দেখেছি যে অলঙ্কারের বাহুল্যে তার তিলার্ধ অঙ্গ অনাবৃত নেই।

তার কাণ্ঠে "সাধারণ মেয়ে"-র সুস্থ, সবল উক্তি যেমন অব্যাহত বেজে

ওঠে, "বিশ্বশোক"-এর মহানুভবতাও তেমনই শোভন লাগে। তার প্রশস্ত পথে "ছেলেটা"-ও খেলে বেড়ায়, আবার "শিশুতীর্থ"-এর যাত্রীরা মিছিল ক'রে এগিয়ে চলে। তার প্রাঙ্গণে "মাঝে মাঝে মরচে-পড়া কালো মাটি"-র সীমান্তেই ভিড় জমায় "রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণী রুষ্ট রুদ্রের প্রলয়-ভ্রূকুঞ্চনের মতো"। অল্প কথায় তার "গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে" শোনা যায় "চিরকালের স্তব্ধতা আর চলতিকালের চাঞ্চল্য"। ভাষার সহজ বৈচিত্র্য সে-ছন্দকে শক্তি যোগায়, তাই সহস্র স্বৈরাচরণের মধ্যে সে কেবল এইটুকুর হিসাব রাখে যে ভাষার পদক্ষেপের সঙ্গে তার পা ফেলার তাল যেন না কাটে। হয়তো সেই জন্যে গদ্যের সঙ্গে তার বেশী মিল, অথচ পদ্যের সঙ্গে অহি-নকুল-সম্বন্ধ নয়। পূর্বেই জানিয়েছি যে আমার বিবেচনায় প্রাত্যহিক জীবনে পদ্যের স্থান খুব নগণ্য নয়। কাজেই মুক্তচ্ছন্দেও পদ্যের প্রভাব প্রচুর। এমনকি আমরা এত দূর পর্যন্ত মানতে বাধ্য যে তাতে যে-গদ্য ব্যবহৃত, তা একেবারে সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ যতই সামান্য হোক, তার তলায় তলায় একটা অসাধারণ আবেগের উৎস থাকেই থাকে ; এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্রিত বাক্য, তাই মুক্তচ্ছন্দের ভাষাও গৃহকর্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।

মুক্তচ্ছন্দের প্রশস্তি-পাঠে অনেকেই হয়তো বিরক্তির স্বরে শুধাবেন এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটি তো অতি আধুনিক শিল্পের দান, সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তবে কি কাব্য আর কখনও জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠেনি? উত্তরে এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে আদিকবিরা তাঁদের কাব্যে জীবনকে যে-সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন, অর্বাচীনেরা তার ত্রিসীমানাতেও পৌঁছাতে পারেনি। অবশ্য এই বৈকল্যের জন্যে আধুনিক লেখকদের দায় যৎসামান্য ; এবং এমন ভাবাও অনুচিত নয় যে ইতিমধ্যে জীবনের অঙ্গবাহুল্য এত বেড়েছে যে কোনও একটা রচনায়—এমনকি বিভিন্ন শিল্পের সম্মিলিত উদ্যোগেও—তার চিত্রাঙ্কন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এ-জন্যে অল্প-বিস্তর দোষ সদ্যস্তন লেখকদেরই অর্শালেও, তাদের পদ্ধতি সত্য সত্যই নিরপরাধ ; এবং তুলনামূলক বিচারে পুরাতন কবিতার কলাকৌশলের আর মুক্তচ্ছন্দের উদ্দেশ্য অনেকাংশে অনুরূপ। তবে জগৎ কখনও দাঁড়িয়ে থাকে না—

কালক্রমে শৈবাল বনস্পতির আকার ধরে ; এবং অচেতন বিবর্তনেই যখন এই ফল ফলে, তখন এত বৎসর-ব্যাপী সজ্ঞান অনুসন্ধানের শেষে বর্তমান কাব্যের রূপরেখা যদি অল্পাধিক বদ্‌লায়, তাহলে বিস্ময়প্রকাশ অসঙ্গত।

আসলে সাহিত্যের সত্তা আজও অবিকৃত আছে ; এবং এ-যুগের ভাবুকেরা কাব্যের তরফ থেকে যে-স্বাধীনতা চাইছেন, তা ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়। আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণায় সে-কালের কবিরা এ-কালের কবিদের চেয়ে কিছু কম তৎপর ছিলেন না ; এবং সেই জন্যে শেক্‌স্‌পীয়র-প্রমুখ প্রথম এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ কতখানি লাঞ্ছনা সয়েছিলেন, তা ইংরাজীনবিসমাত্রেই জানেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের আগ্রহ কমেনি, তৎসত্ত্বেও তাঁরা বুঝেছিলেন যে স্থান, কাল ও ঘটনার গতানুগতিক ঐক্যের চেয়ে জীবন্ত নাটকের আবশ্যকতা অনেক বেশী। এমনকি ছন্দ-সম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব তাঁদেরই অনুবর্তী। অবশ্য সে-যুগে, আজকালকার মতো, একই কবিতায় গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ চলত না। কিন্তু একই দৃশ্যে, একই চরিত্রের মুখে সাধুভাষা ও সাধুচ্ছন্দের সঙ্গে অপভাষা ও অপচ্ছন্দের যে-উদার রাখীবন্ধন অনায়াসে সাধিত হত, এই বিপ্লবের দিনেও তার অনুকরণ অসম্ভব ; এবং যদিও তখনকার গীতিকবিতায় সাম্প্রতিক স্বাবলম্বন মেলে না, তবু ছন্দকে প্রাচীনেরা কারাগার-রূপে দেখেননি, তাকে চিনেছিলেন-কাব্যপ্রেরণার প্রণালী-রূপে।

অন্ততঃপক্ষে এলিজাবেথীয় কাব্য কখনও গণিতের শিকল পরেনি ; সর্বপ্রথম সে-শাসনের বশে আসেন মিল্‌টন্। তাই যখন যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর সাক্ষাৎ পাই, তখন একটা অকারণ বিষাদে মন যেন নুয়ে পড়ে ; একটা অজানা অবরোধের আশঙ্কায় এত বড় কবিকে ছেড়ে প্রাণ চায় হেরিক্-এর মতো গ্রাম্য কবির সংসর্গ ; বুদ্ধি নত শিরে মানে বটে যে লুপ্ত স্বর্গের বার্তা মিল্‌টন্-এরই আয়ত্তে, কিন্তু অন্তর খোঁজে মার্ভেল্-এর ফুলবাগানের খোলা হাওয়া, যেখানে পার্থিবার ছলা-কলা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে এই ধূলির ধরণীকে স্বর্গাদপি গরীয়সী ক'রে রেখেছে। জানি মিল্‌টন্-এর মর্যাদালাঘব উপহাস্য ও দুঃসাধ্য ; এবং সে-প্রয়াসও আমার

নেই। তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ও অতুলনীয় সাফল্যের কথা না পেড়ে, যদি কেবল তাঁর অধমর্ণদের অফুরন্ত তালিকার দিকে চাই, তাহলেই সে-মহত্ত্বের ঠিকানা পাওয়া যাবে; এবং সে-ঋণ এমনই বিশ্বব্যাপী যে বাংলা সাহিত্য সুদ্ধ তার দায় এড়াতে পারেনি। কিন্তু এ-কথা বলা নিশ্চয়ই মার্জনীয় যে তাঁর কাব্যাদর্শের তমুবাত শিখরে আমার মতো জড়বাদীর স্বচ্ছন্দ বিহার স্বতই সংক্ষিপ্ত।

মিল্‌টনী কাব্যের নির্বিকার গাম্ভীর্যে মানুষী দুর্বলতার স্থান নেই; তার মর্মে নীতিকারের নিশ্চিন্ত নির্ব্যূঢ়তা নিত্যবিরাজমান; এবং তার অভিজাত পাত্র-পাত্রীর অন্যতম স্বয়ং ভগবান। কাজেই যে-নাট্যশালা মিল্‌টনী ট্র্যাজেডির রঙ্গভূমি, সেখানে মর্ত্যচারীর প্রবেশ কোনও মতে সহজসাধ্য নয়। অবশ্য অনেকের বিবেচনায় একটা অলৌকিক গরিমাই মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু আমি এ-মতে সায় দিতে অক্ষম; এবং কথাটা একেবারে মিথ্যা না হোক, তবু তার একদেশদর্শিতা নিঃসন্দেহ। আমি অন্তত যে-মহাকাব্যদ্বয়ের সঙ্গে সুপরিচিত—মহাভারত ও ইলিয়ড্‌—সে-দুটির পরিপ্রেক্ষিতে মিল্‌টনী পবিত্রতার ছায়া নেই; এবং ওই কাব্য-যুগলের বাণী মুখ্যত অনুবাদের মারফৎ আমার কাছে পৌঁছেছে ব'লে, তাদের ভাষা ও ছন্দ-সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য আমার মুখে মানাবে না বটে, তথাচ এ-সম্বন্ধে আজ আর বোধহয় তর্ক নেই যে সে-দুজন আদিকবি বর্জনের দিকে ঝোঁকেননি, অঙ্গীকারের জন্যে উন্মুখ ছিলেন।

জ্ঞানত তাঁরাও তাঁদের কাব্য থেকে দেব-দেবীদের বাদ দেননি, বরং এমন এক প্রাক্তন যুগের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন যখন সংসারের তুচ্ছতম ব্যাপারও অমর অধিকর্মাদের দৃষ্টি এড়াত না। তবু অনুবাদের সময়ে দেখা গিয়েছে যে সেই অতিমর্ত্য অতিথিদের উক্তি-প্রত্যুক্তি সাধুভাষা ও পদ্যচ্ছন্দের সংস্পর্শে কেমন যেন মূল্যহীন শোনায়। অথচ চলিত ভাষার অনাড়ষ্ট চরণ যেই পাষাণীর অঙ্গস্পর্শ করে, অমনই তার অত দিনের জড়তা কাটে, অমনই বুঝি চিরন্তনী মাঝে মাঝে ঘুমালেও, কখনও মরে না। উপরন্তু এ-সত্য কেবল ইলিয়ড্‌-অনুবাদকদের উপলব্ধি নয়, যিনি প্রাচীন কাব্যকে ভাষান্তরে আনতে চেয়েছেন, তাঁরই অভিজ্ঞতা অনুরূপ; এবং ষোড়শ

শতকে ইংরাজী ভাষা যখন সংহত ও সংস্কৃত হয়ে ওঠেনি, তখন সে-দেশের অনুবাদশিল্প উৎকর্ষের যে-স্তরে পৌঁছেছিল, আজকের পরিবর্ধিত ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও ইংরাজেরা তার অনেক নীচে প'ড়ে আছে। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অনুচিত নয় যে অর্থমর্যাদার আধিক্য-বশত যে-সকল শব্দ আজ আর নিত্যব্যবহার্য নয়, আভিধানিক যাদুঘরে সংস্কৃতির নিদর্শন-রূপে সযত্নে রাখা রয়েছে, কর্মজীবনে তাদের অত ঘটা ছিল না। কারণ দূরত্ব চির দিনই গৌরবপ্রসূ ; এবং মহাভারতাদির ভাষাকে যদি কোনও আধুনিক অনবস্থ ব'লেও ভাবেন, তবু সমসাময়িকদের চোখে সে-ভাষা যে অতিশুদ্ধির বোঝা বইত, এমন বিশ্বাস খুব সম্ভব বর্জনীয়।

সে যাই হোক, এত দিন অনাচারে বেড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কাব্য হঠাৎ অবৈধতা ছাড়লে ; এবং তার মতিপরিবর্তনের জন্যে মিল্‌টন্‌-র উপরে দোষারোপ উচিত নয়, আসলে তিনি উপলক্ষমাত্র। এলিজাবেথীয় যুগের আতিশয্যের পরে তথাকথিত ধ্রুপদী আদর্শের প্রাদুর্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়, অবশ্যম্ভাবীও বটে। উপরন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যের শ্রমবিভাগও অনেক দূর এগিয়েছিল : ড্রাইডেন্‌-এর অধ্যবসায়ে আড়ষ্ট ইংরাজী গদ্যে যে-অপূর্ব সংবেদনশীলতার সাক্ষাৎ মিলল, তার পরে পদ্যকে সর্বশক্তিমান ভাবার সার্থকতা রইল না, দেখা গেল গল্প বলা, তর্ক করা, শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি অনেক কর্তব্য, যা এত দিন অগত্যা আমরা পদ্যের সাহায্যে কায়ক্লেশে সেরেছি, তা গদ্যের দ্বারা অতি সহজে ও শোভন উপায়ে সম্পাদ্য। তাছাড়া ঠিক এই সময়ে জীবনের স্থূল দিকটারও আগল ভাঙল। রিনেসেন্স্‌-এর পর থেকে কৌতূহলী মানুষ যে-সকল নূতন ক্ষেত্রে লাঙল চালিয়েছিল, তাতে অভাবনীয় ফল ফলল ; এবং ধরা পড়ল যে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার পদ্যের মারফৎ কোনও মতে লোকসমক্ষে আনা যাবে না।

সে-অবস্থায় গদ্যের পদবৃদ্ধি অনিবার্য ; এবং তখনকার সাহিত্যিকেরা যদি সত্যই কঠোরহৃদয় ব্যাবহারিক মানুষ হতেন, তবে অকারী মন্ত্র-তন্ত্রের সঙ্গে অব্যবহার্য পদ্যকেও তাঁরা নিঃসঙ্কোচে বিস্মৃতির পিঁজরাপোলে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু অতখানি অকৃতজ্ঞতা তাঁদের সাধ্যে কুলাল না : অগত্যা

তাঁরা ঠিক করলেন যে সভ্যতার এই অতিজীবিত সেবকটির পক্ষে বানপ্রস্থই প্রশস্ত ; নচেৎ দৈনন্দিন সংসারযাত্রায় তার অপটু হস্তক্ষেপ কেবল অব্যবস্থা ঘটাবে। তবু উৎসবে শোভাযাত্রার শীর্ষস্থান, তথা অনুষ্ঠানে প্রধান পুরোহিতের উচ্চাসন, এর পরেও তার জন্যে নির্দিষ্ট রইল ; এবং আমার বিশ্বাস মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচলন এই সঙ্কল্পের অন্যতম কারণ। যত দিন অলি-গলিতেও ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়েনি, যত দিন সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারেই আবদ্ধ থাকত, তত দিন কাব্যের একাধিপত্য তেমন কোনও বিপদ বাধায়নি ; কেননা তত দিন যাদের সঙ্গে তার আদান-প্রদান চলত, তাদের অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ, কাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তার দুর্বলতা-সম্বন্ধে সচেতন, কাব্যপাঠে সুদক্ষ।

এখন থেকে যারা তার চার দিকে ভিড় জমালে, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ধৈর্য তাদের ছিল না ; সাহিত্য তাদের অবসরবিনোদনে লাগল ; এবং যেহেতু সে-যুগের প্রলোভন যে-পরিমাণে বেড়েছিল, অবসর সে-অনুপাতে বাড়েনি, তাই লেখকের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষে ফুটিয়ে তোলার মতো সময় তারা পেলে না; ভাবলে আভরণের পারিপাট্যই বুঝি প্রকর্ষের চিহ্ন। এই শ্রেণীর পাঠক, বিশেষত এই শ্রেণীর অনুকারকের কুসঙ্গে স্বাধীনতা সহজেই স্বেচ্ছাচারে বদ্‌লায়। অতএব সন্ত্রস্ত কবিরা কাব্যকে বিধান মানানোর চেষ্টায় কোমর বাঁধলেন। ফলে হিরোয়িক্ কাপ্‌লেট্‌-এর শৃঙ্খল-নির্মাণ হল, স্থান, কাল ও ঘটনার নির্বাসিত সঙ্গতি রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করলে, এবং বিবেচকেরা জানালেন যে ট্র্যাজেডির পক্ষে জাতিরক্ষার একমাত্র উপায় রাজসিক আড়ম্বরের আড়ালে নায়ক-নায়িকার আত্মবিলোপ। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাষাও গাম্ভীর্যের ভেক নিলে, যাতে জনসাধারণ শ্রুতিমাত্রেই বোঝে যে রুচিসমাহিত সমাজে শৈথিল্যের উপক্রম সুদ্ধ দণ্ডনীয়।

দুর্ভাগ্যবশত এততেও অভীষ্টসিদ্ধি হল না, ঘটল হিতে বিপরীত। হয়তো সংস্কৃতি কাব্যের প্রকৃতি-বিরোধী। অন্ততঃপক্ষে এটা নিশ্চয় যে ড্রাইডেন্‌-পোপ্‌-এর পরে ইংরাজী কাব্যের অতি-উর্বর ভূমিও বহু দিন পর্যন্ত ঊষর রয়ে গেল ; এবং আত্মপ্রকাশের প্রণোদনায় যাদের অনীহা

ঘুচল, তারা বরণমালা দিলে গদ্যের গলায়। অবশ্য তখনও ব্লেক্-এর মতো দু-একজন হঠকারী গোল বাধাতে ছাড়লে না বটে, কিন্তু সমসাময়িক সুধীমণ্ডলী তাতে টললেন না, সে-ঔদ্ধত্যকে উন্মত্ততা ভেবে তাদের ক্ষমা করলেন; এবং অতিবড় খেয়ালীও আজ এ-কথা মানবে যে তাদের কবিত্ব-সম্বন্ধে সহৃদয়দের মত যদিও ভ্রান্ত, তবু তাদের চিত্তবিকার-সম্বন্ধে সে-কালের সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়। তাহলেও শেষ পর্যন্ত পাগলেরাই জিতল; এবং আঠারো শতকের শেষ দশায় ফরাসী দেশে যে-রক্তগঙ্গা বইল, তার বেগ রুচিবাগীশেরা সামলাতে পারলেন না, ডোববার মুখে জানলেন যে উপেক্ষিত বর্বরেরা সত্য সত্যই ক্ষেপে উঠলে, শুধু তাঁদের কেন, স্বয়ং বিশ্ববিধাতার নিস্তার নেই।

ফলে কলিন্স্-এর গৌরব পোপ্-এর প্রতিপত্তিকে ছাড়াল, ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্ চলিত ভাষাকে কাব্যের ভূষণ ব'লে রটালেন, এবং অভিজাত বাইরন্ দিগ্বিজয়ে বেরোলেন রথপতাকায় বর্ন্স্-এর কৃষকী প্রবচন লিখে। দেখতে দেখতে গদ্যের চাহিদা ক'মে পদ্যের প্রসার পুনরায় বাড়ল; শুভবাদীরা জোর গলায় হাঁকলেন যে কাব্যসম্ভারে উনিশ শতক এলিজাবেথীয় যুগকেও হার মানাবে; এবং যেন তাঁদের আত্মশ্লাঘার শাস্তি-স্বরূপ, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন এক কবির দেহান্তর ঘটল যিনি শেক্স্পীয়র-এর সমকক্ষ না হলেও, পদমর্যাদায় ঠিক তাঁর নীচে। এর পরে কাব্যকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। নিরবচ্ছিন্ন সুসময়ের প্রশ্রয়ে কবিদের মধ্যে আবার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিলে: গদ্য-পদ্যের পুনর্বিবাহে পৌরোহিত্য ক'রেও ব্রাউনিং জাত খোয়ালেন না; টেনিসন্ গ্রাম্য ভাষায় কাব্যরচনার প্রয়াস পেলেন; এবং স্বয়ং সুইন্বর্ন্ না মেনে পারলেন না যে গদ্যকবিতার জন্মদাতা হুইট্ম্যান্ বিদ্রোহী নন, মুমূর্ষু কাব্যের ত্রাণকর্তা।

অবশ্য মুক্তচ্ছন্দের ওই আদিপুরুষটির যথার্থ মূল্য ইংলণ্ড তখন বোঝেনি, আজও ঠিক বোঝে না; এবং অল্প দিন যেতে না যেতেই সুইন্বর্ন্ সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ভুল শোধরালেন। কিন্তু সুইন্বর্ন্-এর পরে যে-কবিরা আসরে নামলেন, তাঁদের কাব্যাদর্শে একটা অভাবনীয় অভিনবত্ব ফুটে উঠল; এবং য়েট্স্-প্রতিষ্ঠিত "রাইমর্স্ ক্লাব্"-

এর সভ্যেরা যে-কবিতা লিখতে বসলেন, তার অঙ্গে গদ্যের পাপস্পর্শ হয়তো লাগল না, কিন্তু তাতে স্যুইন্‌বর্ন্‌-এর রসালু বহুলতাও ধরা পড়ল না। রক্ষণশীলেদের উপহাস কুড়িয়ে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে কাব্য ততটা পাঠ্য নয়, যতটা শ্রাব্য ; এবং এই অনভ্যস্ত আদর্শে কাব্যের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ তো স্বীকৃত হলই, উপরন্তু লিখিত সাহিত্যের যেটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—অচলায়তন পারিভাষিকতা—তা কেটে গিয়ে সঞ্জীবিত কাব্য আবার ঋজু, স্বচ্ছ ও স্বাবলম্বী রূপে দেখা দিলে, প্রকাশ পেল যে আবৃত্তির যোগ্য কাব্যে অলঙ্কারের ভার সয় না।

সুতরাং ছন্দের গ্রন্থি ছিঁড়ে ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনিবৈচিত্র্য স্বাধীনতার দাবি জানালে, রূপকের পালা চুকিয়ে প্রত্যক্ষের অনুসন্ধান চলল, অপরিচয়ের অসীম বিস্ময় পরিচয়ের পরিতৃপ্তির কাছে হার মানলে। তৎসত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কবিরা অবশ্য ছন্দোমুক্তিতে পৌঁছাতে পারলেন না ; তার জন্যে আরও পনেরো-বিশ বছরের দেরী ছিল। তবু এই বিপ্লবী নেতাদের অকাল মৃত্যুর পরেও সাইমন্স্‌ ফরাসী দেশ থেকে নমুনা এনে যে-নববিধান ইংরাজী কাব্যে ঢোকালেন, তা প'ড়ে আর কারও সন্দেহ রইল না যে পরিবর্তন আসন্ন। এর পরের ঘটনা আর ইতিহাসের অঙ্কারূঢ় নয়, সমসাময়িক পক্ষপাতের অন্তর্গত। আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টা এখনও পরীক্ষা পেরোয়নি ; এবং তার ভবিতব্য-সম্বন্ধে নির্ভাবনা নিশ্চয়ই মূঢ়তা। তবে একটা কথা বোধহয় ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে ; এবং তা এই যে কাব্য আর মুক্তি, এ-দুয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই, বরং এরা পরমাত্মীয়—যদি নিরাসক্ত ভাবে সাধনা করা যায়, তবে অরাজকতার মধ্যে দিয়েও কাব্যের নির্দ্বন্দ্ব লোকে পদার্পণ সম্ভব।

কাব্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমার উদ্‌ভট অনুমান যে কেবল ইংরাজী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণেই প্রমাণিত হবে না, তা আমি বুঝি। অপরাপর সাহিত্যকে সাক্ষী ডাকা আমার সাধ্যের অতীত ; কিন্তু একটা অন্ধ ধারণা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য কাব্যই আমার সমর্থন করবে। প্রাচ্যের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র ; এবং এ-অঞ্চলে মানুষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি অধ্যাত্ম চিন্তাতেই নিমগ্ন। ফলে এ-দেশের কাব্য হয়

চিত্তবিনোদনের নিঃসার উপাদান, নয় তত্ত্বদর্শনের আধার। কাজেই যেখানে অচিন নূতনের আগমন-আশঙ্কায় আমাদের আমোদ-প্রমোদে বিঘ্ন ঘটেছে, সেখানে কবি এতটুকুও আমল পায়নি ; আবার যখন উপদেশকে সারগর্ভ লেগেছে, তখন উপদেশবাহকের সম্বন্ধে আমরা তিলমাত্র ঔৎসুক্য দেখাইনি। এতাদৃশ আবেষ্টন উচ্চাঙ্গ শিল্পসৃষ্টির প্রতিকূল। কারণ জীবনের সকল হিসাবনিকাশের মতো ললিত কলার খতিয়ানেও দেনা-পাওনার যোগ-বিয়োগে কেবল শূন্য অবশিষ্ট থাকে। তবু যত দূর জানি ও শুনেছি, তাতে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে পূর্বের উদাসীনতাও হয়তো আর অটল নেই।

প্রথাপসারণ চৈনিক জীবনের সর্বত্র আজ যে-সর্বনাশ এনেছে, সে-অভ্যাঘাতে চীনা কবিতা মরেনি, বরং বেঁচেছে ; এবং জাপানী সাহিত্যের অভিজ্ঞতাও অন্য রূপ নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে আমি পরোক্ষ ভাবেও পরিচিত নই ; তাই সে-বিষয়ে কোনও রকম মতপোষণ আমার পক্ষে অশোভন। তাহলেও বাংলা সাময়িকীতে বাদ-বিতণ্ডার বহর ও ঝাঁঝ দেখে ভাবা স্বাভাবিক যে এ-দেশ পাণ্ডববর্জিত বটে, কিন্তু কালাতিরিক্ত নয়। অবশ্য বাংলা কাব্যে খুব বেশী ভাঙা-চোরার দরকার হয়নি ; কারণ তার গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতা কোনও দিনই অত্যধিক ছিল না। তবে এই ব্রাত্য ভাবের কতখানি স্বেচ্ছাকৃত আর কতটা আবশ্যিক, তার নির্ধারণ কঠিন। আমার বিবেচনায় উনিশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের নাম-গন্ধ না থাকায় এখানকার ছান্দসিকেরা অগত্যা পদ্যকে অবারিত গতির আদেশ দিয়েছিলেন। নচেৎ যারা সমাজের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে নিজেদের কামাগ্নিকে দেবতার আড়ালে লুকাতে দ্বিধা করেনি, তারা যে কেবল ছন্দের বেলায় স্বায়ত্তশাসনের নির্দেশ মানবে, এমন অনুমান সহজ নয়।

প্রাচ্যের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বঙ্গসাহিত্যেও জীবনের প্রভাব অত্যল্প ; কিন্তু যখন তার বংশকারিকার কথা মনে পড়ে, তখন এই অনধিক সংস্পর্শই যথেষ্ট বিস্ময়কর। কেননা বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়ায়, এবং সে-সাহিত্যের গর্বই এই যে তার ভাষা দেবভাষা,

অর্থাৎ মানুষের অকথ্য ভাষা। নৃতত্ত্ববিদ্যার বিবেচনায় কাব্য বিবর্তিত মন্ত্র-মাত্র; এবং এক সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ আচারনিষ্ঠা দেখেই এ-সিদ্ধান্তে আস্থা জাগে। তবে আর্যা-জাতীয় দু-একটা ছন্দ শুনে এমন ভুল হয়তো মাঝে মাঝে ঠেকানো যায় না যে সংস্কৃত কবিদের সহিষ্ণুতাও বুঝি অসীম নয়। কিন্তু সে-মরীচিকার আয়ু সামান্য; ঈষদ্ মনোযোগেই বেরিয়ে পড়ে যে আর্যার আপাতস্বাচ্ছন্দ্যও একটা অকাট্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ব্যায়ামকুশলী সৈন্যদলের কুচ-কাওয়াজে যেমন থেকে থেকে এক-একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও আয়াসসাধ্য শৈথিল্যের ফাঁক আসে, এও ঠিক তেমনই। নেপথ্যে প্রযোজক ইঙ্গিত করছেন, তাই অনুগত নর্তকের দল পূর্বাভিনীত ভঙ্গিতে সার ভেঙে শিক্ষানুরূপ উপায়ে বৈচিত্র্য-উৎপাদনের প্রয়াস পাচ্ছে।

বিধাতা বাঙালীর অদৃষ্টে এতখানি দুর্দশা লেখেননি বটে, কিন্তু পয়ারের পদ্মমধু খেয়ে বঙ্গভারতীও কম বিপদে পড়েননি। তবে দেবীর পুণ্যবল বোধহয় অশেষ; তাই পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায় এক দিন হঠাৎ এক নূতন কালাপাহাড় সদর্পে মন্দিরে ঢুকে সরস্বতীকে বনেট্ পরিয়ে দিলেন; এবং পোষাকের এমনই গুণ যে সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যাবনিক চাপল্যের হিল্লোল উঠল। দুর্ভাগ্যক্রমে মাইকেলের উপরে মিল্টন্-এর প্রভাব যৎকিঞ্চিৎ ছিল না; এবং অসুস্থ কাব্যের রোগ সারানোর পক্ষে সেই কবিরাজের চিকিৎসা যেহেতু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, তাই মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ক'রেই থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হলে, প্রকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে ভাষা সম্বন্ধে তিনি কোনও দিন ঔদাসীন্য দেখাননি। তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিল; এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই শরণ নিয়ে থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানা চাই।

সে-দারিদ্র্যের জন্যে অবশ্য লজ্জা বা অনুশোচনা নিষ্প্রয়োজন; কারণ অত শতাব্দীর অবজ্ঞা যাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করেছিল, সেই কাঠবিড়ালী যখন

লঙ্কাবিজয়ের দিনে গায়ের ধূলা ঝেড়ে সেতুবন্ধের ছিদ্র ভরাতে পারলে, তখন তার অকিঞ্চনতা উল্লেখযোগ্য নয়, তার প্রচ্ছন্ন জীবনী শক্তিই বিস্ময়কর। উপরন্তু মাইকেল-সম্পর্কে এ-কথাও মনে রাখা কর্তব্য যে তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগের মানুষ; এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়াই ছিল তদানীন্তন চিৎপ্রকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং এমন সন্দেহ হয়তো অনুচিত নয় যে মাইকেল বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেন না; তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবকমাত্র, তার ত্রাণকর্তা নন। এ-অনুমানে সকলে সায় না দিন, অন্তত এটা সর্বসম্মত সত্য যে বাংলা আক্ষরিক ছন্দকে স্বভাবত ত্রৈমাত্রিক ভাবায় যতখানি বৈদেশিকতার আভাস আছে, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের গোত্রজ বলায় সে-পরিমাণের বিধর্মিতা নেই। কিন্তু এখানে এ-আলোচনা অবান্তর; এবং মাইকেলের ছিদ্রান্বেষণ আমার অনভিপ্রেত। আমি জানি যে তিনি শুধু নিয়ামক হিসাবে অদ্বিতীয় নন, চারিত্র্যগুণের অনটনে তাঁর বিরাট কবিপ্রতিভার অনেকখানি যদিও অপ্রকাশিত, তবু তিনি একজন মহাকবি; এবং যত দিন বাংলা কাব্যের অনুকম্পায়ী জুটবে, তত দিন তাঁর নাম-কীর্তনে লোকাভাব ঘটবে না।

কারণ মাইকেল শুধু ম্রিয়মাণ বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলে, ঝিমিয়ে পড়েননি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে বাঁচিয়েছিলেন তিনিই; এবং তাঁর অব্যবহিত পরেই বঙ্গাকাশে যতগুলি জ্যোতিষ্ক উঠেছিল, তারা যদিও নিতান্তই আকাশপ্রদীপ, তবু বাঙালী মনীষীরা সেই নগণ্যদের জন্যে যে-অকৃপণ সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বোধহয় মৃন্ময় দ্রোণের চরণে একলব্যের অর্ঘ্যনিবেদন। পক্ষান্তরে মাইকেলকে পথপরিচায়ক হিসাবে না পেলেও, বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়তো যথাসময়ে ঘটত; এবং তাঁর সমান কবি যেমন শত বর্ষে এক বার জন্মায়, তেমনই তাঁদের আগমন ধূমকেতুর মতো স্বয়ংবশ ও স্বতঃসিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও এ-কথা অতিসত্য যে মাইকেলের বৈফল্য তাঁর সামনে যদি জাজ্বল্যমান না থাকত, তবে অনেক অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে তাঁর অধিকাংশ শক্তি ফুরাত। তার মানে এমন নয় যে মৌলিক প্রতিভায় মাইকেলের অগ্রগণ্য কবি এ-দেশে

বা বিদেশে অসংখ্য ; এবং বিশুদ্ধ কল্পনায় "সোমের প্রতি তারা" "বিদায় অভিশাপ"-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট হোক বা না হোক, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রথম বীরাঙ্গনা দেবযানীর চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাস্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতায় আবেগের আতিশয্য বা প্রেরণার প্রাচুর্য গৌণ, মুখ্য রূপ ; এবং পথিকৃৎ ব'লে, মাইকেল রূপায়ণে অপেক্ষাকৃত অকৃতকার্য।

মাইকেলের প্রতি বালসুলভ অবিচারের জন্যে রবীন্দ্রনাথ পরে একাধিক বার লজ্জা জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কাছে নিজের ঋণ কখনও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেননি, যেমন করেছেন বিহারীলালের প্রসঙ্গে ; এবং সে-মিতভাষণের ব্যাখ্যা বোধহয় এই যে শেষোক্তের সঙ্গে তাঁর যে-সম্পর্ক বর্তমান, তার সঙ্গে তুলনীয় শুধু পতঙ্গ আর প্রদীপের সম্বন্ধ। অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক মাত্রাচ্ছন্দের পরিণতিতে বিহারীলালের অস্তিত্বটুকুও উবে গেছে ; কিন্তু মাইকেলের বেলা সে-রকম বিলুপ্তি অভাবনীয় ; এবং তাঁর অক্ষরবৃত্ত যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে অননুকরণীয় লাগে, তখন তা তো স্বতন্ত্র বটেই, এমনকি অন্তত বর্জনীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে তা আজও উপকারী। কারণ মাথায় সুমেরুপ্রমাণ নিজস্ব বয়ে বেড়ানোই কবিত্বশক্তির একমাত্র পরিচয় নয় : ধনবিজ্ঞানের মতো রসবিচারেও যথেচ্ছ অপচয় সঞ্চয়ের চেয়ে ভালো ; এবং রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অল্প বয়সে বুঝেছিলেন যে আপনাকে পরের কাজে লাগাতে না পারলে, সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা পণ্ড শ্রম। সেই জন্যে তাঁর রচনায় প্রসঙ্গ-প্রকরণের যে-নিবিড় সহযোগ দেখি, তা অন্যত্র দুর্লভ ; এবং এই সামঞ্জস্যবিধানের অধিকাংশ ভার প্রকরণের বহনীয়।

কেননা প্রসঙ্গ দৈবের দান, তার ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ ও পরিবর্জন ছাড়া কোনও মধ্য পন্থার অবকাশ নেই। অতএব তার বহিরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ছন্দে, ভাষায় ও প্রতীকে, স্থিতিস্থাপকতা চাই ; এবং এখানে পূর্ববর্তীদ্বয়ের পরীক্ষার—হয়তো ভ্রান্ত পরীক্ষার—ফল রবীন্দ্রনাথের শ্রমলাঘবের সহায় হয়েছিল। সত্যে পৌঁছানোর পথ যদিও একটি, তবু সে-পথ গোলকধাঁধার মতো, তাতে বারংবার পথচ্যুতি অনিবার্য। কাজেই বিপথগুলোয় লক্ষ্যভ্রষ্টদের পদচিহ্ন না থাকলে, ঠিক পথটা চিনে নেওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অবশ্য প্রথম চেষ্টাতেও কেউ কেউ অদৃষ্টগুণে অনন্ত পন্থায় পা দেন। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের মতো সদাসচেতন শিল্পীর সম্বন্ধে এই দৈবানুগ্রহ কেমন যেন নিষ্প্রয়োজন ঠেকে। তাই যখন দেখি যে রবীন্দ্রনাথ হাতড়ে বেড়ালেন না, প্রথম যৌবনেই "চিত্রাঙ্গদা"-র মতো অনবদ্য কাব্যের সাহায্যে বঙ্গ-সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের কোঠায় তুলে ধরলেন, তখন কেবল "চিত্রাঙ্গদা"-র লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েই ছুটি পাই না, সেই প্রাগ্‌রৈবিক কবিদেরও প্রণাম করি, যাঁদের গবেষণায় বাংলা ভাষা ও ছন্দের স্বরূপ অত অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল।

তবে কাব্যের ধনিক তন্ত্রে জ'ন্মে রবীন্দ্রনাথ অনুপার্জিত সম্পত্তির আয়ে বিত্তশালী ব'লে খ্যাত, এমন উদ্‌ভ্রান্ত ধারণা আমার নেই; এবং তাঁর কর্মযোগের সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত, তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ঐশ্বর্য কী অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরত আত্মত্যাগের ফল। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য কতখানি ছাড়তে পারলে, তাঁর মতো ছন্দঃস্বচ্ছন্দ হওয়া যায়, তা হয়তো অকবিদেরও অবিদিত নেই; এবং প্রকৃতি ও পুরুষকারের পরিণয় ব্যতীত প্রতিভার উদ্ভব যে অভাবনীয়, এ-প্রসঙ্গে প্রায় সকলে আজ একমত। কিন্তু সে-সমস্ত সত্ত্বেও হয়তো এমন বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত যে রবীন্দ্রনাথ কালের আনুকূল্যে একেবারে বঞ্চিত নন; এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে আমাদের আস্থা থাক বা না থাক, আমরা মানতে বাধ্য যে মহাকবির আবির্ভাব লগ্নসাপেক্ষ। অর্থাৎ সকল প্রকারের মহত্ত্বই সুযোগ খোঁজে; এবং সাহিত্যিক মহত্ত্ব-প্রকাশের সুসময় ভাষার শৈশবাবস্থা।

সম্প্রতিবিৎরা মুখে যাই বলুন না কেন, মনে মনে তাঁরাও জনসাধারণের সঙ্গে একমত যে প্রগতির পথে মহাকবির সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসছে; এবং মানুষের বুদ্ধি ও সামর্থ্য যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্ধমান, তখন শুধু তার কাব্যানুভূতিতে ঘুণ ধরেছে, এমন অনুমান টিঁকবে না। তাই আমরা না ভেবে পারি না যে কাব্যের উপাদানে এখন আর সে-নমনীয়তা নেই, যাতে মহাকাব্যের মহানুপ্রেরণা মূর্তিমান হয়ে উঠতে পারে; এবং এই সিদ্ধান্ত যাঁদের কাছে অলীক লাগবে, তাঁদের পক্ষে অতীতের ইতিহাস স্মরণীয়। সফোক্লিস্, লুক্রিশিয়াস্, শেক্‌স্‌পীয়র, গ্যেটে এবং সম্ভবত কালিদাস, এতগুলি মহাকবির মধ্যে কেউ যে পরিপুষ্ট ভাষার পরিচর্যা

করেননি, তা নিশ্চয় নিছক দৈবযোগ নয়। তাঁরা প্রত্যেকে যখন আসরে নেমেছিলেন, তখন তাঁদের স্ব স্ব ভাষায় বয়ঃসন্ধিকাল, গতানুগতিকের শাসন তখনও অনারব্ধ, বার্ধক্যের স্থবিরতা তখনও কল্পনাতীত, সম্মুখে শুধু সম্ভাবনার অবাধ প্রান্তর। অথচ অতীত তখন আর নিতান্ত নগণ্য নেই, তার পরিণতির পূর্বাভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে, অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে সে প্রত্যুষের অনিশ্চয়তা ছেড়ে, সবেমাত্র প্রভাতের আত্মস্থ আলোকে এসে পৌঁছেছে। এ-অবস্থায় মহাকবির আগমন যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনই স্বাভাবিক ; এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতেও আমি এই ঘটনা-চক্রের পুনরাবৃত্তি দেখি।

উপরে যা বললুম, তার থেকে যদি কেউ ভাবেন যে আধুনিক কবিদের আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় হাত গুটিয়ে ব'সে থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, তবে তিনি ভুল করবেন। সে তো দূরের কথা, আমি বরং মানি যে অত্যধিক কালনিষ্ঠাই আধুনিক কাব্যের প্রধান শত্রু। এমন লেখক কোনও দিন বিরল নয় রচনাশক্তির প্রাখর্যে যাঁদের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। কিন্তু তাঁদের অহমিকার মাত্রা শ্রেষ্ঠ কবিদেরও ছাড়িয়ে যায় ; এবং যদি কখনও সুযোগের সাহায্যে তাঁরা সমকালীন পাঠকের শ্রদ্ধা জাগান, তাহলে সেই শ্রদ্ধা খোয়াবার ভয়ে তাঁদের রূপকারী বিবেক পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফলে যে-উপায়ে একদা পাঠকের মন মজিয়েছিলেন, তাকে জরাজীর্ণ ও অকর্মণ্য জেনেও তাঁরা উপায়ান্তর খুঁজতে চান না, এবং এই অক্ষমতার জন্যেই অবশেষে অকৃতজ্ঞ পাঠকের পক্ষপাত হারান। কাব্যের রূপ কী, তা নিয়ে অনেকে তর্কে নেমেছেন, কেউ মীমাংসায় পৌঁছাননি। কাজেই সে-প্রসঙ্গে বৃথা বাক্য না বাড়িয়ে শুধু এইটুকু বলা নিরাপদ যে কল্পনামূলক সাহিত্যমাত্রেই যখন বৈচিত্র্যব্যতিরেকে বাঁচে না, তখন বৈচিত্র্যের উপেক্ষা কাব্যের পক্ষে অকল্যাণকর। অর্থাৎ প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতাই কালোপযোগী ; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতার আরও একটা বাড়তি গুণ আছে, যেটা কালাতিরিক্ত।

সুযোগ যেমন আসে, তেমনই যায় ; সুতরাং তার সহযোগ ভিন্ন যদি শ্রেষ্ঠ কাব্য অলিখিতই থাকে, তবে মহাকবির পক্ষে এমন কোনও মৃতসঞ্জীবনী

বিদ্যা আয়ত্তে আনা চাই, যাতে অতীত সুযোগ প্রয়োজনমতো পুনর্জীবন পায়। মহৎ কাব্যের এই ঐন্দ্রজালিক লক্ষণটিকেই আমি উপরে বৈচিত্র্য-নাম দিয়েছি। এই বৈচিত্র্য পশ্চিম দেশের ঐকতান সঙ্গীতের মতো; একটা সমষ্টিগত রূপ তার নিশ্চয়ই আছে, এবং সেটাই সর্বপ্রথমে শ্রোতাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। কিন্তু এইখানে তার আবেদনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না; বহু বার শুনে যখন তার সমগ্র রূপরেখা শ্রোতার স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে, তখন শুরু হয় তার বিশ্লেষণ, প্রত্যেক অঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, প্রত্যেক যন্ত্রের স্বরসঙ্গতির বিবরণ, প্রত্যেক সুরের সার্থকতার পরিমাপ। যে-শিল্পসৃষ্টি এই দ্বিজত্বে পৌঁছাতে পারে, তাতে হয়তো সাময়িক শিল্পের আপাত-রমণীয়তা মেলে না, কিন্তু একটা আত্মসমাহিত উৎকর্ষ তাকে অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা থেকে চির কাল বাঁচিয়ে রাখে। অবশ্য এ ছাড়া অন্য উপায়েও বৈচিত্র্যসৃজন সম্ভব। হিন্দু সঙ্গীতের আদর্শে সমগ্র কাব্যজীবনকে নানাবিধ রাগ-রাগিণীর মধ্যে চারিয়ে দিলে, কবির ব্যয়কুণ্ঠা সূচিত হয় বটে, তবু সে-রীতি ইতিহাস-অনুমোদিত। কিন্তু ভৈরবী গেয়ে খ্যাতি জুটেছিল ব'লে, যে-সুগায়ক সারা দিন কেবল ভৈরবী ভাঁজবেন, তাঁর আসরে শ্রোতার সংখ্যা যে কেবলই কমবে, তা নিঃসন্দেহ।

দুঃখের বিষয় কথাগুলো লেখায় যতটা সঙ্গত শোনাচ্ছে, কার্যত ততটা সুস্পষ্ট নয়। এমনকি ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ, শেলি, টেনিসন্‌ ইত্যাদির মতো প্রথম শ্রেণীর কবিরাও কাব্যে বিচিত্রতার মূল্য বোঝেননি; এবং সেই জন্যে তাঁদের কাব্য নির্বিকার ব্যক্তিত্বের নিরবকাশ বাহন। ফলত উদ্দেশ্যে, আদর্শে ও অভিপ্রায়ে শেক্‌স্‌পীয়র-প্রমুখ নৈর্ব্যক্তিক কবিদের সমকক্ষ হয়েও তাঁরা সম্ভবত অমৃতলোকের বহিঃপ্রান্তেই থেমে আছেন, লোকোত্তরে পৌঁছাতে পারেননি। কিন্তু শিল্প-সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক-বিশেষণ নিয়ে অনেক বিবাদ বেধেছে। তাই এখানেই জানিয়ে রাখা ভালো যে ওই শব্দের দ্বারা আমি কোনও অমানুষিক লক্ষণের আভাস দিচ্ছি না, শুধু সেই ধরণের শিল্প-সামগ্রীর কথা বলছি, যাতে লোকশিক্ষার চেয়ে লোকরঞ্জনের চেষ্টাই বেশী পরিস্ফুট। উদগ্র ব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে আমিও মানি যে কবি যখন মানুষ, সেকালে অন্যান্য মানুষের মতো কবির ভাবনা-বেদনাও তাঁর ক্রিয়াকলাপে

প্রকাশ পায়। তাহলেও এমন কাব্য আমি অনেক দেখেছি যার প্রবর্তনা কবিপরিচিতি নয়, কেবল সৃষ্টি ; এবং উদাহরণত "টেম্‌পেস্ট্"-নাটিকাটি উল্লেখযোগ্য।

আমার বিবেচনায় সেখানি মুখ্যত নাটক হিসাবেই লিখিত ; এবং তৎসত্ত্বেও শেক্‌স্‌পীয়র-এর তৎকালীন অভিজ্ঞতা যে সেই রচনায় জায়গা জোড়েনি, এমন নিরুক্তি যদিও অবিশ্বাস্য, তবু এটা নিশ্চিত যে জ্ঞানত টেনিসন্-জীবনের প্রভাব কাটিয়েও "আইডিল্‌স্ অফ্ দি কিং" যে-ভাবে টেনিসন্-কে ধরিয়ে দেয়, প্রস্পেরো কখনও ঠিক ততখানি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। অগত্যা এই ধারণা আজ আমার মধ্যে বদ্ধমূল যে নৈরাত্ম্য আর বৈচিত্র্য অন্যোন্যনির্ভর ; এবং যে-কবিতা নৈর্ব্যক্তিক নয়, তা অনেক সময়ে উপাদেয় বটে, তথাচ তাতে অমৃতের আস্বাদ নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি সব সময়েই সীমাবদ্ধ : তার মজ্জায় মজ্জায় যত বিদ্রোহই থাকুক না কেন, স্থান-কালের দাসত্ব তার অবশ্যকর্তব্য। উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে শোনা যায় যে একটা ঐকান্তিক একাগ্রতা ছাড়া ব্যক্তিত্বের আর কোনও মানে নেই। ফলে নিজের ভিতর থেকে সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের পথ্য-সংগ্রহ কবির সাধ্যাতীত ; এবং কাব্যকে চিরন্তনের প্রকোষ্ঠে ওঠাতে চাইলে, কেন্দ্রাপসারণ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অবশ্য বিশ্বও অমিত নয় ; কিন্তু মানুষের শক্তির পরিমাণ এত নগণ্য যে এই সঙ্কীর্ণ জগৎই তার কাছে অনন্ত ঠেকে ; ঘটনার ঘুরন্ত চাকার দিকে সে যখন তাকায়, তখন তার এমনই ঘোর লাগে যে একই ঘটনা বারংবার ফিরে আসছে কিনা, তা বোঝবার সামর্থ্য থাকে না।

কাজেই যে-কবির বক্তব্য ব্যক্তিকে ছেড়ে বিশ্বের আশ্রয় নেয়, তার সাহিত্যে বৈচিত্র্যের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত অধিক ; এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ব্যঞ্জনা যেহেতু বিষয়ের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ, তাই এই জাতীয় বিশ্ববান্ধব মহাকবিদের রচনায় শিল্পপ্রকরণের কোনও গতানুগতিক আকার ধরা পড়ে না। যাঁরা মমত্ববোধকে কাব্যের যজ্ঞানলে আহুতি দিতে পেরেছেন, নিরর্থ প্রথা তাঁদের কাছে স্বভাবতই তুচ্ছ। মহতের এতাদৃশ নিয়মলঙ্ঘনই রসিকসমাজে আর্ষপ্রয়োগ-নামে পরিচিত ; এবং প্রাচীন

গ্রীস্ থেকে প্রাচীন ভারত পর্যন্ত এই প্রয়োগ এক দিন যেমন প্রশ্রয় পেয়েছিল, আধুনিক পশ্চিম থেকে আধুনিক প্রাচ্য পর্যন্ত আজও তার তেমনই সমাদর। আমার মতে রবীন্দ্রনাথও আর্যপ্রয়োগক্ষম কবি ; এবং সেই জন্যে তিনি আবাল্য কাব্যকে মুক্তির বিজন পথে তাড়িয়ে বেড়িয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গ-পদ্ধতির যে-অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়, সেটা হয়তো খুব বড় কথা নয় ; কারণ প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কবিই তাঁদের প্রসঙ্গকে যে-পরিমাণে বিস্তৃত করেন, পদ্ধতিকেও বদ্‌লান সেই অনুপাতে। রবীন্দ্র-প্রতিভার অত্যাশ্চর্য গুণ হচ্ছে তাঁর প্রণালীর অদ্ভুত অস্থৈর্য, তাঁর অশেষ পরিবর্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি।

অপর প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনায় একটা সুনির্দিষ্ট ধারা স্পষ্ট ; একটা সীমাবদ্ধ সরণী বেয়ে তাঁরা উৎকর্ষে ওঠেন ; এবং এক বার গন্তব্যে পৌঁছালে, তাঁদের আর কোনও দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা চাঞ্চল্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই কঠিন সন্তোষ অবর্তমান ; তাঁর কাব্যের ক্ষিপ্র স্বভাব পূর্ণতা তথা কৈবল্যের পরিপন্থী। "মানসী"-র কৃতিত্ব অসামান্য ; এবং শুধু সেই পুস্তকের জোরে তিনি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী সিংহাসন পেতেন। কিন্তু সে-প্রকরণ যখন "কল্পনা"-য় এসে ঠেকল, তখন কবি হঠাৎ তাতে আগ্রহ হারালেন ; এবং তার পরের বই "ক্ষণিকা" যে-পরীক্ষার ফল, তাতে কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক কেন স্বেচ্ছায় হাত দেন, তা বোঝা শক্ত। অবশ্য আজ যখন পিছনে তাকাই, তখন মনে হয় যে রবীন্দ্রসাহিত্যের রত্নাকরেও এই মধ্যমণিটির জোড়া নেই। তাহলেও যে-দিন তাঁর কলম দিয়ে "ক্ষণিকা"-র প্রথম কবিতা বেরিয়েছিল, সে-দিন এমন প্রত্যয়ের কোনও কারণ ছিল না, বরং বিপদের আশঙ্কা ছিল সমূহ। সে-পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনার চিরাচরিত পথেই চলেছিলেন ; এবং "কল্পনা" বন্ধ করার পরে পাঠকের কানে যে-ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি তোলে, তা সংস্কৃতির ধ্রুপদ।

এতাদৃশ কবির পক্ষে কৃষ্ণকলির কাঁকণের আওয়াজকে ছন্দে বাঁধার চেষ্টা শুধু দুঃসাহসিকতা ; এবং এই অগ্নিপরীক্ষায় কেবল তিনিই এগোতে পারেন, যাঁর মনে অহমিকার পাপ নেই, যাঁর কাছে কাব্যের মঙ্গল আত্মকল্যাণের চেয়ে কাম্যতর। কিন্তু "ক্ষণিকা"-প্রণেতার মনোবিকলন এখানে অবান্তর।

"ক্ষণিকা" যে-চিত্তবৃত্তি থেকেই জন্মাক না কেন, ওই পুস্তক-প্রকাশের পরে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে কাব্যের সঙ্গে ভাষাশুদ্ধির কোনও সহজ যোগ নেই। তবে ছন্দ-সম্বন্ধে তখনও সংশয় ঘুচল না। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ছন্দ কখনও নিগড়ের পর্যায়ে ওঠেনি, বেজেছে নূপুরের তালে ; এবং তাঁর কৈশোরিক কবিতার ছন্দঃশৈথিল্য অনবধানপ্রসূত হোক বা না হোক, "মানসী"-র "নিষ্ফল ক্রন্দন"-এ কবি যে সজ্ঞানেই ছান্দসিকদের উপেক্ষা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই সর্ববাদিসম্মত। উপরন্তু তার পর বহু দিন পর্যন্ত তিনি এই স্বচ্ছন্দ ছন্দকে ভুলেছিলেন বটে, তাহলেও ছন্দের গাণিতিক রূপ তাঁর কাছে কত তুচ্ছ, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে "বর্ষশেষ"-এর মতো ঘনসম্বদ্ধ সনাতনী কবিতার উপান্ত্য স্তবকটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই স্বাধীনতা আর মুক্তচ্ছন্দের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান আছে ; এবং তাই "গীতাঞ্জলি"-তে ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে গবেষণা চুকিয়ে "বলাকা"-য় তিনি ছন্দের স্বরূপ-সন্ধানে নামলেন।

"বলাকা"-য় ছন্দ যদিও একেবারে বাঁধন ছিঁড়ল না, তবু সেখানে পুরোপুরি সংস্কারমুক্তি হয়তো বিপদই বাধাত। কেননা "বলাকা"-র বিচরণ মর্ত্যসীমার বাইরে ; সেই নিরালম্ব লোকে অন্তত দূরাগত মহাকর্ষও না থাকলে, কবির জয়যাত্রা সহজেই মহাপ্রস্থানে থামতে পারত। কিন্তু মিলের টান এবং পদক্ষেপের সমতা মেনেও, এ-ছন্দ এমন একটা ওজোগুণের পরিচয় দিলে যার পরে আর সন্দেহ রইল না যে স্বর্গবিজয়ের দিনে বাঙালী কবিকে আর অস্ত্রের জন্যে ভাবতে হবে না ; এবং মানুষের যেগুলো ঊর্ধ্বগ আবেগ, সেগুলোর অভিব্যক্তিতে এই ছন্দ যে-রকম যোগ্যতা দেখিয়েছে, অন্যত্র, এমনকি ইংরাজী অমিত্রাক্ষর ছন্দেও, তার তুলনা নেই। গদ্যকে তফাতে রেখেও এ-ছন্দ স্বকীয় গতিভঙ্গিতে ও ধ্বনিগৌরবে এতই সংযত যে আবেগের হিল্লোল এর তলায় কখনও হারিয়ে যায় না ; এবং তাই ভাবপ্রধান কাব্যরচনায় এর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। দুর্ভাগ্যবশত জগৎ কেবল ভাবের উপাদানে নির্মিত নয়, তাতে বস্তুর দৌরাত্ম্যই সর্বব্যাপী ; এবং এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের পটভূমিতে "বলাকা"-র গম্ভীর শালীনতা কেমন যেন ব্যর্থ ঠেকে, মনে হয় এ-ইতরের সঙ্গে ঘর করার জন্যে দরকার এমন এক

মুখরাকে যে অমর্যাদায় মুইবে না, অপমানের সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে পারবে।

"পলাতকা"-য় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ছন্দ গড়লেন। এতে ছন্দের শেষ আড়ষ্টতাও ঘুচল ; ছন্দঃসম্পর্কিত কোনও পূর্বসংস্কারই আর টিঁকল না ; এবং সকল কৃত্রিমতা কাটিয়ে যতিস্থাপনা প্রায় অর্থানুসারেই চলতে লাগল। মিলের মোহ এখনও কাটল না বটে, কিন্তু আভরণের বহর এতটা কমিয়ে আনা গেল যে নিছক গদ্যের সহায়তা ছাড়া আর সংক্ষেপের সম্ভাবনা রইল না। সে-পর্বেরও আর দেরী ছিল না। "পলাতকা" লেখার সময়েই বিশুদ্ধ গদ্যে কবিতারচনা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল। সেগুলি বেরোল "লিপিকা"-র প্রথমাংশে। তবে সে-পুস্তকপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ল যে হর্বর্ট্ স্পেন্সর একেবারে মিথ্যা বলেননি ; অনেকেই যদিও ভুলক্রমে ভাবেন যে শিখিপুচ্ছধারী দাঁড়কাক আর ময়ূর এক, তবু গদ্যবেশী কাব্যের যথার্থ পরিচয় সকলেরই অগোচর। এমনকি কবির নিজের মনেও হয়তো এই বই-সম্বন্ধে দ্বিধা চোকেনি ; কারণ তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকায় এর নাম গদ্যেরই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আকারে এবং জাতিবিচারে তাদের স্থান যেখানেই হোক, "পায়ে চলার পথ", "রাত্রি ও প্রভাত" ইত্যাদি লেখাগুলি যে-মুহূর্তে চেঁচিয়ে পড়া যায়, তখনই তাদের কাব্যরূপ ফুটে ওঠে ; রবীন্দ্রনাথের অপরাপর গদ্যরচনার সঙ্গে তাদের প্রভেদ কত গভীর, তা আর ঢাকা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ চির দিনই সব্যসাচী ; এবং তাঁর গদ্য তাঁর পদ্যের কাছে যে-হিসাবে ঋণী, তাঁর পদ্যও তাঁর গদ্যের কাছে সেই অনুপাতে কৃতজ্ঞ। কিন্তু অন্যত্র, যেমন "ক্ষুধিত পাষাণ"-এ, কাব্যের অধিকাংশ উপকরণ ধার নিয়েও তাঁর গদ্য কাব্য-নামের যোগ্য নয়, খুব জোর শুধু কাব্যধর্মী, অথচ "লিপিকা" সজ্ঞানে সরলতার দিকে চ'লেও কাব্য-গুণের অংশভাক্ ; এবং এই অসাধ্যসাধন কী উপায়ে সম্ভব, তা যদিও আমার অবিদিত, তবু "লিপিকা"-র একটা সুবিদিত বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবলে, হয়তো এই রহস্যের খানিকটা জানা যাবে। সকলে দেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্যোপমার সঙ্গে তাঁর পদ্যোপমার

কোনও মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমাপ্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। পক্ষান্তরে তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনিমাধুর্যের তাগিদে। এ-জাতীয় উপমা অর্থাগমের সহায় নয়, এমনকি অনেক সময়ে প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী। তৎসত্ত্বেও এতে কাব্যের অনিষ্ট ঘটে না ; কারণ কবিতাপাঠে যুক্তি হয়তো অনাবশ্যক, অপরিহার্য শুধু নিষ্ঠা। কাব্যে উপমার একমাত্র কর্তব্য পাঠকের নিষ্ঠাকে ডাক দেওয়া ; এবং নিষ্ঠা যুক্তির আদেশে আসে না, আসে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আকর্ষণে। তাই নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে শঙ্করভাষ্যই লিখিত হয়, পূজা পায় মনসা, শীতলা, তারকেশ্বরের মতো জাগ্রত দেবতা।

এই সনাতন সত্যের নির্দেশেই আধুনিক বিজ্ঞাপনবিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞাপন-চিত্রে বিজ্ঞাপিত বস্তুর স্থান ক্রমশ কমিয়ে আনছেন। দেখা গেছে ছবিতে যদি যথেষ্ট দ্যোতনা থাকে, তবে পণ্যসামগ্রীর গুণ-কীর্তন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। কেননা সে-অবস্থায় তর্কের সুযোগ হারিয়ে দর্শকের মন কল্পনার দিকে ঝোঁকে ; এবং তখন সে যে-দ্রব্যের নাম শোনে, তাকে আর সহজে ভুলতে পারে না। কবির উপমাব্যবহারও এই রকম ; এবং "বলাকা"-র পক্ষধ্বনি শব্দময়ী অপ্সররমণীর অনুষঙ্গে আমাদের গোচরে তো আসেই না, বরং একেবারে লোপ পায়। কিন্তু ওই কথা-কটার যাদু পাঠকের চিত্তকে এমনই তদ্গত ক'রে তোলে যে সঙ্গতি-অসঙ্গতির খোঁজ-খবর নেওয়া আর তার সাধ্যে কুলায় না। তখন হয় সে সমস্ত কবিতাটিকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়, নচেৎ সজোরে আবেশ কাটিয়ে, মাথা নেড়ে বলে—একেবারে প্রলাপ। "লিপিকা"-র উপমা এই জাতীয় স্বপ্নময় উপমা ; তার সার্থকতা অর্থগত নয়, চিত্রগত ; এবং সাধারণ কবিতায় ছন্দ যেমন ধ্বনিসাম্য বজায় রেখে পাঠকের কাণ্ডজ্ঞানকে মোহজালে ঘিরে ফেলে, "লিপিকা"-য় তেমনই উপমা আলেখ্যের মায়াকাজল পরিয়ে তার তর্কপ্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়ায়। সেই জন্যে "লিপিকা"-র রূপ যাই হোক, কাব্যই তার স্বরূপ।

আমার বিচারে "লিপিকা" অমূল্য পুস্তক। তার কারণ শুধু এ নয় যে এত

দিন পর্যন্ত বাংলা মুক্তচ্ছন্দের একমাত্র নিদর্শন কেবল এই গ্রন্থে পাওয়া যেত; অধিকন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রভূত শক্তি ও যথার্থ সৌন্দর্য প্রথম এখানেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। তৎসত্ত্বেও "লিপিকা"-র দুর্বলতা নিতান্ত নগণ্য নয়; এবং সে-কবিতাগুলির প্রসঙ্গ-নির্বাচনে কবি বেশ একটু শুচিবায়ুর পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য বিষয়ের উপরে প্রভুত্ব চলে না: সময়ে সময়ে পৃথিবীপর্যটনেও তার সাক্ষাৎ মেলে না, আবার মাঝে মাঝে তার উৎপাতে স্নানাহারের অবকাশ সুদ্ধ ঘোচে; এবং রূপকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যতই সচেতন হোন না, তাঁর কাব্য মুখ্যত প্রেরণাপ্রসূত। তথাচ "লিপিকা"-র সম্বন্ধে নালিশ চোকে না, প্রশ্ন ওঠে—বিষয়ই যদি প্রথার গণ্ডি ছাড়াতে পারলে না, তবে ছন্দের জীবন্মুক্তি কি অসার্থক নয়? এবং এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে ছন্দোবদ্ধ "পলাতকা" যে-উদারতা দেখিয়েছে, তার পাশে ছন্দোমুক্ত "লিপিকা" কেমন যেন সঙ্কীর্ণ। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই অবশ্যগ্রাহ্য ঠেকে যে এ-বইয়ের সাফল্য-সম্বন্ধে কবির নিজের মনেও দ্বিধা ছিল; বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তি এত দূর অবধি সইবে কিনা, তা তিনি জানতেন না ব'লেই, "লিপিকা"-র কবিতাগুলিকে গদ্যাকারে ছেপেছিলেন, তার জন্যে এমন প্রসঙ্গ বেছেছিলেন যা কৌলিন্যের জোরেই রসোত্তীর্ণ।

"লিপিকা"-র পরবর্তী পুঁথি-কথানিতে এ-সন্দেহ বাড়ে। "শিশু ভোলানাথ", "প্রবাহিণী", "পূরবী", "মহুয়া" প্রভৃতিতে দেখি যে রসের দিক দিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা কেবলই এগিয়ে চলেছে বটে, তবু প্রকরণ ও পরীক্ষার প্রতি কবির যেন আর দৃক্‌পাত নেই। তার মানে এ নয় যে বইগুলির কাব্যসত্তার তুচ্ছ বা কলাকৌশল শিথিল, তার মানে শুধু এই যে সেগুলির রচনারীতি নবাবিষ্কৃত নয়, পুরাতন রীতিরই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যে-পথেই এগোন, তাঁর অব্যর্থ প্রয়াণ প্রায়ই অমৃতলোকের কাছে থামে; এবং উপর্যুক্ত পুস্তকগুলিতেও সে-নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে এই আভিজাতিক নন্দনে যাদের সন্দর্শন মেলে, তারা সকলেই উর্বশীর গোত্র-সম্ভূত; তাদের মুখে নিশ্চয়ই অনন্তযৌবনের অবিকার সৌন্দর্য বিদ্যমান, কিন্তু তাদের চোখে

নেই অজানার অপার বিস্ময়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো নিরুদ্দেশযাত্রী এই অচলায়তনের স্বপ্নস্বচ্ছ উৎকর্ষ বেশী দিন সইতে পারলেন না ; তিনি আবার স্বেচ্ছায় স্বর্গ হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু এ-বারে বোধহয় অমরাবতীর চক্ষু নিরশ্রু রইল না, নিঃসঙ্গ হল না কবির প্রত্যাবর্তন ; স্বয়ং কবিতালক্ষ্মী তাঁর আকর্ষণে এই ধূলির ধরণীতে নেমে এলেন। অবশ্য দেবীর কণ্ঠে অভ্যস্ত মন্দারমাল্য নেই, মৃন্ময় দেহ নিঃসঙ্কোচে অদিব্য ছায়াপাত ক'রে চলেছে ; কিন্তু আমাদের মতো মোহান্ধেরাও তাঁর দিকে চেয়েই বুঝি যে বহিরঙ্গে সনাতন আড়ম্বর না থাকলেও, তাঁর অন্তরে আছে কাব্যের তন্মাত্র।

আমি এমন কথা বলছি না যে "পরিশেষ" ও "পুনশ্চ" রবীন্দ্রকাব্যের চূড়ান্ত। শুনেছি পার্বত্য প্রদেশে কবির মন ওঠে না, তাঁর ভালো লাগে সমভূমির সার্বত্রিক উর্বরতা। এ-কথা যদি তাঁর রুচি-সম্বন্ধে নাও খাটে, তবু তাঁর সাহিত্যের সম্পর্কে উপমাটি খুব প্রযোজ্য। সেখানে যে-উচ্চাবচতা দেখা যায়, তা অধিত্যকার বন্ধুরতা, শিখর-গহ্বরের উত্থান-পতন তাতে নেই। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার ক'রেও এমন বিশ্বাসপোষণ অন্যায় নয় যে এই গ্রন্থ-দুখানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধ্বনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁছেছেন, তার পরে আর এগোনো অসম্ভব। সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন, কিন্তু কৃতকার্য হননি। এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে-বিরোধ ঘুচল। যে-বিচিত্রতার প্রয়োজনে মহাকাব্য গীতিকবিতার কাছে হার মেনেছিল, তার সিদ্ধি হয়তো এইখানে। কারণ এই প্রকাশভঙ্গি জীবনের মতোই পরিবর্তনশীল, এর বিশ্বব্যাপ্তি বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্বভুক্ অগ্নির তুল্য। কিন্তু সেই জন্যে তার আসঙ্গ নিরাপদ নয় : চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে মরে, যিনি অম্লান থাকেন, তিনি বসুধার দুহিতা সীতা ; এবং স্বরাজ্য মজ্জায় মজ্জায় না ছড়ালে, নৈরাজ্য অমঙ্গলপ্রসূ। তাই ভয় পাই, তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত।

[ ১৯৩৩ ]

## সূর্যাবর্ত

রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি তো আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠানের সূত্রধার বটেই, এমনকি তাঁর বাণী-ব্যতিরেকে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ নেই। কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হলেও, কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়; এবং শিল্পের সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর সাফল্য যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। অন্ততঃপক্ষে স্বকীয় মনীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে যে-অভিনব রূপ দিয়েছেন, তার প্রতিভাসে কেবল সুধীসমাজই সমুজ্জ্বল নয়, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত; এবং তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ যদিও আজ আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ সাহিত্যের মূলধন।

অবশ্য মানুষের মর্মানুসন্ধানে বিদেশী পরকলাই সাম্প্রতিকদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনও নিশ্চয় রৈবিক উপক্রমণিকার নিয়ম মানে; এবং তাঁর শালীন মাত্রাজ্ঞান বর্তমান প্রগতি-বিলাসীদের যতই অস্বাভাবিক ঠেকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদই ইদানীন্তন উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যপদেশ। সুতরাং অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও, তাঁকেই গত পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় চিৎপ্রকর্ষের পুরোধা বলা বিধেয়। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রণীরা যে-সার্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পাননি, সেই কল্পনাবিলাসকে এই পাণ্ডববর্জিত দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ; এবং আমরা সকলে যেহেতু সেই প্রবাহেরই বুদ্বুদ, তাই আমাদের পক্ষে তার গতি-অগতির

বিচার অথবা উপকার-অপকারের আলোচনা শুধু অশোভন নয়, দুষ্করও।

কেননা আধিজৈবিক শ্রেয়োবোধ তো দূরের কথা, আধুনিক বিজ্ঞান বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তিতেও আস্থা খুইয়েছে; সমাজতত্ত্ব এখনও পুরোপুরি যন্ত্রবাদে না পৌঁছাক, মানুষমাত্রেই যে অভ্যাসের দাস, তাতে ভাবুকদের আর সন্দেহ নেই; এবং তথাকথিত তুলামূল্য যেকালে অনুশীলনেরই নামান্তর, তখন আজকালকার বাংলায় জ'ন্মে রবীন্দ্রপ্রতিভার যাচাই করা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো। তাহলেও রবীন্দ্রনাথ ও উপর্যুক্ত সংস্কৃতিধারার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ; এবং সম্প্রতি কোনও এক বাঙালী কবি তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের তুলনা দিয়েছেন বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সে-সমীকরণ উপমা নয়, উৎপ্রেক্ষা।

সাধারণত অপাঠ্য হলেও, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি অন্ততঃপক্ষে প্রাঙ্মোগল যুগে; এবং প্রাদেশিকতার প্রকোপে এই অঞ্চল যদিও সর্বদা আর্যাবর্তের বহির্ভূত থেকেছে, তবু অনার্য আর অসভ্য চির দিন ভিন্নার্থ-বাচক। অতএব রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় প্রাণসামগ্রীর উৎপাদক বলতে আমার ইতিহাসবোধে বাধে; এবং যখন অলঙ্কারনির্মাণের তাগিদে আমিও তাঁর প্রতিরূপ খুঁজি, তখন আমার মানস চক্ষে গোমুখী গিরিরাজের চিরন্তন চিত্র ভেসে আসে না, ফুটে ওঠে কোনও কাল্পনিক শৈলশৃঙ্গের অবচ্ছিন্ন ছবি, যা হয়তো নগাধিরাজের মতোই শাশ্বত ও সমুচ্চ, কিন্তু যার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমভূমির সম্পর্ক নিতান্ত আপতিক, গঙ্গাকে যে জটার জালে জড়িয়ে রাখে না, পায়ের আঘাতে নূতন পথে চালায়।

তথাচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ছিলেন একা অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর ভগবান। তিনি ছাড়া আর সকলে পরজীবী; এবং তাঁকে বাদ দিলে, অন্য কারও পক্ষে নিছক আত্মচিন্তায় কালাতিপাত সম্ভব নয়। সেই জন্যে পরিচ্ছিন্ন পাহাড়ের নীচেও পদাশ্রিত স্রোতস্বিনীর স্বেদবিন্দু জমে, প্রতিবেশী শষ্পে তার সানুদেশ জড়ায়, এবং যে-আধিদৈবিক উৎপাত আশ-পাশের সমতলে ধ্বংস ছড়ায়, তাতেই ঘটে তার বৃদ্ধি। অতএব যাঁরা ভাবেন যে রৈবিক কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব রসধারা অন্তঃসলিলা, তাঁদের অনুমান যেমন নির্ভুল,

তেমনই রবীন্দ্রসাহিত্যে যাঁরা ওয়র্ড্স্ওয়র্থী চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব দেখেন, তাঁরাও মতিভ্রান্ত নন ; এবং উভয় সিদ্ধান্তই শুধু আংশিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোনও পক্ষ তাঁর সমগ্র সত্তার সাক্ষাৎ পাননি।

তবে ব্যক্তিস্বরূপ যতই অসংযুক্ত হোক না কেন, তার সঙ্গে অতিমর্ত্যের কোনও সম্বন্ধ নেই ; এবং রৈবিক ব্যক্তিস্বরূপ যে-ধাতুসমূহে গঠিত, তার প্রত্যেকটা যদিচ তন্মাত্র-পদবাচ্য, তবু উপাদানের গুণে তিনি আমাদের থেকে স্বতন্ত্র নন, পানের জোরেই তিনি সাধারণ ভঙ্গুরতা কাটিয়ে উঠেছেন। ফলত আমাদের মতো কালস্রোতের বুদ্বুদও রবীন্দ্রনাথের মূল্য-বিচারে একেবারে অপারগ নয়, শুধু অনেকখানি প্রতিবদ্ধ ; এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা প্রাক্তন সাদৃশ্য তো আছেই, উপরন্তু দার্শনিকদের মতে ভাব ও অভাব যেহেতু একই সত্যের এ-দিক আর ও-দিক, তাই আমাদের স্বভাবে যা নেই, তা জানলেই, আমরা তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝব।

বলাই বাহুল্য যে উল্লিখিত উপমাসঙ্করে বৈদান্তিক নেতিবাদের সংস্পর্শ নেই ; এবং রহস্যঘনতা যেমন সকলের মতেই ব্যক্তিস্বরূপের প্রধান লক্ষণ, তেমনই সেই কৈবল্য যে সকল বিসংবাদের তীর্থসঙ্গম, এ-বিশ্বাসও অনেকের বিবেচনায় অন্যায়। সুতরাং ভণিতা বাদে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে আমার বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে প্রামাণ্যস্তাবক প্রাচ্য কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন বুঝেছিলেন ; এবং এই আত্মনিষ্ঠা তাঁকে জাতিচ্যুত ক'রে আন্তর্জাতিক লেখকমণ্ডলীতে স্থান দিয়েছিল। পক্ষান্তরে উক্ত স্বাধিকারবোধ থাকলেই, মহাকবির মর্যাদা মেলে না ; তার জন্যে আরও পাঁচটা গুণের সঙ্গে একটা নিরুপাধিক ঐশী ক্ষমতাও অপরিহার্য।

তাছাড়া রাসীন্ থেকে ল্যাগুর পর্যন্ত কাব্যরচয়িতাদের ধ্রুপদী উৎকর্ষে যার আস্থা আছে, তার কাছে পরোক্ষ অনুভূতি শুধু মহার্ঘ্য নয়, সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হয়তো প্রত্যক্ষকে এড়িয়েই চলে। কিন্তু অতিবৃদ্ধি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব'লে, কূপমণ্ডুকের অনীহা প্রশংসনীয় নয় ; এবং সঙ্গীতজ্ঞ না হওয়াতে আমি যদিও অবগত নই যে এই কীর্তনের জন্মভূমিতে রাগ-রাগিণীর শুচিবায়ু কতটা প্রবল, তবু আমাদের কাব্যপ্রচেষ্টা যে চির কাল বর্ণাশ্রমের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে পথ চলেছে, তাতে বোধহয় সন্দেহের

অবকাশ নেই। আসলে ভাষ্যপ্রণয়ন হিন্দুস্থানের সনাতন অভ্যাস ; এবং দূরত্ববশত বেদ-বেদান্তের টীকা-টিপ্পনী আর আমাদের টানে না বটে, কিন্তু যুগধর্মের তাগিদেও আপন চোখ-কানের ব্যবহার আমরা আজ অবধি শিখিনি।

তার অপ্রমাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও ওয়ট্‌সনী মনোবিজ্ঞানে যাঁরা ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন, এক বার ভারতবর্ষে বেড়িয়ে গেলে, তাঁরা নিশ্চয়ই মত-পরিবর্তন করতেন ; এবং তার পরেও হয়তো প্রথাপ্রবণ মানুষকে কলের পুতুলের পর্যায়ে ফেলা চলত না, কিন্তু বোঝা যেত যে গুরুদীক্ষা সত্যই অঘটনসংঘটনপটীয়সী, অন্তত তার ফলে জীব ও জড়ের অদ্বৈত ঘটে। প্রকৃত পক্ষে ঐতিহ্য আর প্রথার মধ্যে ঐক্যের চেয়ে বৈষম্যই হয়তো বেশী ; এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তি যেমন জাতির নৈর্ব্যক্তিক সংস্কারে, তেমনই জাতীয় জীবনীশক্তির উৎস দেশ-কালাতিরিক্ত মনুষ্যধর্মে। কিন্তু নাৎসী মতবাদে আস্থা খুইয়েও জাতিরূপের উপলব্ধি যদি বা সম্ভবপর হয়, তবু অন্তত রোজর বেকন্‌-এর যুগ থেকে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎকারে দার্শনিক-মাত্রেই বৈফল্য কুড়িয়েছেন।

তাহলেও প্রত্যয় হিসাবে বিশ্বমানবের মূল্য প্রায় অপরিসীম ; এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমানায় তার সাক্ষ্য না মিললেও, কার্যত সোহংবাদী সুদ্ধ এই অনেকান্ত মানবজাতির স্বভাবগত সাম্যে নিঃসংশয়। সেই জন্যে পাঁচ হাজার বৎসর ধ'রে নির্বিকার অধিকারভেদে বেড়ে উঠেও আমরা এখনও ভাবি যে অনুরূপ অবস্থায় বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঘটে, এবং শিক্ষা ও প্রতিবন্ধকের তারতম্যেই বাঘে-ছাগলে এক ঘাটে জল খায় না। এই কথাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে গতানুগতিক প্রথাই শ্রেণীসংঘর্ষের জনক ও প্রাদেশিকতার উদ্যোক্তা ; এবং মানুষ যেখানে তার স্বতন্ত্র সত্তা ও সহজ প্রবৃত্তি, তার নিজস্ব স্বার্থ ও প্রাক্তন পুরুষকার সংঘসঙ্কীর্ণ সমাজের তত্ত্বাবধানে সঁপে দেয়নি, সেখানে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল অলীক স্বপ্ন-মাত্র নয়, সেখানে সদ্ভাব স্বাভাবিক ও শাসন অনাবশ্যক, সেখানে চিরাচার মৃত কিন্তু ঐতিহ্য প্ররোহী।

কারণ ভূপঞ্জরবিদ্যার বিচারে মানুষের মধ্যে স্তরভেদ অবর্তমান : চামড়ার

রঙে, ভাষার প্রয়োজনে, ভৌগোলিক তাগিদে আমরা আপাতত যত বিবাদই বাধাই না কেন, তবু আমাদের প্রত্যেকের উত্তরাধিকার এক ও অভিন্ন; এবং সেই বিশ্বস্ত ও বহুপরীক্ষিত অধিকর্মার উপরে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের ভার চাপালে, আমাদের সংসারযাত্রাই অবাধে চলবে না, ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতও হয়তো নির্বিকল্পের নির্দেশে নির্দ্বন্দ্ব হবে। সম্ভবত সেই জন্যে ব্যক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বমানবের উদ্বোধন অসঙ্গত নয়, আবশ্যিক। কিন্তু ভূতত্ত্ব নূতন বিজ্ঞান; এবং এ-দেশে সভ্য মানুষের বাস অন্তত পাঁচ হাজার বৎসর ধ'রে। উপরন্তু অন্যূন তিন হাজার বৎসর যাবৎ পরদেশী বিজেতাপরম্পরার পদান্তে প'ড়ে আদিম ভারতবর্ষ অনবরত স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখেছে।

এ-অবস্থায়, এই রাজনৈতিক নিগ্রহের চাপে, প্রস্তরিত প্রথার অপর্যাপ্তি কেবল প্রত্যাশিতই নয়, অনিবার্যও; এবং বাঙালী কবিকিশোরদের কাছে সত্যটা যতই অপ্রীতিকর ঠেকুক, তবু সাহিত্য যেকালে সমগ্র জীবনের ভগ্নাংশমাত্র, তখন আমাদের মজ্জাগত জাড্য সাহিত্যেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। যে-জাতি এক দিন কোমর বেঁধে নিরুক্তের নির্দেশ-মতো একটা সাধু ভাষা বানিয়ে, অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণ হিসাবে এতগুলো বিরাট কাব্য লিখে গেছে, আধুনিক বাঙালী হয়তো তাদের বংশধর নয়; কিন্তু বাংলা ভাষা সেই সংস্কৃতেরই উঞ্ছজীবী, এবং খৃষ্টপূর্ব সংস্কৃত কবিদের মতো বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যিকদের উপজীব্যও উদ্বৃত্ত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত বড় লেখকের এত দিনকার সহযোগকে আমরা যথেষ্ট উপকারে লাগাতে পারিনি, তাঁর স্বাবলম্বনের দিকে না তাকিয়ে বাঙালী শুধু তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকরণে অসংখ্য শাদা কাগজ অজস্র কালির আঁচড়ে ভরেছে। অগত্যা বাঙালী পাঠক আজ ভুলতে বসেছে যে বাংলার ইতিহাসে "মানসী"-ই অপূর্ব নয়, "গীতাঞ্জলি"-তে মধ্য-যুগীয় ভক্তিসাধকদের প্রতিধ্বনিও অনুরূপ অনুভূতির আবশ্যিক অভিব্যক্তি; এবং যেকালে "বলাকা"-র পুনরাবৃত্তিতে এখনও তার কান ফাটেনি, তখন রৈবিক গদ্য কবিতার অনর্গল অনুলিপিকেও সে শেষ পর্যন্ত কাব্য ব'লে মেনে নেবে। অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যের সৌর মণ্ডলে ধূমকেতুর প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং স্থানীয়

গ্রহপতিদের গতিবিধি আমরা এমন অভিনিবেশ-সহকারে লক্ষ্য করেছি যে তাঁদের প্রত্যেক বিকীরণ আমাদের নখদর্পণে, প্রত্যেক অপচার প্রত্যাশিত। অধিকন্তু এ-বৈধতা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্ন নয়, আমাদের অর্বাচীন সাহিত্যও নিয়মাধীন।

এ-দেশের কবিযশঃপ্রার্থীরা যে-গুণের জোরে নাম কেনেন, তারই অভ্যাসে তাঁদের সারা জীবন কাটে ; এবং কাব্য যে রসবৈচিত্র্য ব্যতীত বাঁচে না, তা বোধহয় তাঁদের অবিদিত। অথচ বাঙালী ভাবে সে কলালক্ষ্মীর বরপুত্র : তার কাছে রূপ যেহেতু রৌপ্যের চেয়ে মহার্ঘ্য, তাই সরকারী পরীক্ষা-গুলোয় মান্দ্রাজীর সাফল্য তাকে টলাতে পারে না ; এবং স্বদেশী বাণিজ্যে মারোয়াড়ীর একাধিপত্য সে নীরবে সয়। কিন্তু আত্মপ্রসাদ প্রায় সর্বত্র অহৈতুকী ; এবং বাংলা অভিধানে বৈদগ্ধ্য আর ভাবালুতা যদি সমার্থবাচক না হয়, তবে আমাদের রসজ্ঞান নিশ্চয়ই কিংবদন্তীমাত্র। আমরা অন্তত পাঁচ শ বছর ধ'রে কবিতা লিখছি ; কিন্তু জন তিন-চার সর্ববাদিসম্মত মহাকবির রচনা বাদ দিলে, আমাদের ভাণ্ডারে যা বাকী থাকে, তাতে সাহিত্যামোদীর লোভ ততটা নেই, যতটা লাভ মসলাবিক্রেতার।

আধুনিক বাঙালীর কথা জানি না ; কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, শিবের গান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি যাদের কলম থেকে বেরিয়েছিল, তারা কল্পনার শোচনীয় অভাবকে উদ্‌ভাবনার আতিশয্যে ঢাকা দেবার প্রয়াস পর্যন্ত পায়নি : একাদিক্রমে পূর্ববর্তীর অনুলাপ পরবর্তী পুনরুক্তির উপাদান যুগিয়েছে। ফলে আমাদের অধ্যাত্ম কবিতায় আত্মসমর্পণ বা অমৃতপিপাসা নেই, আছে কেবল কুসংস্কার ও নির্বন্ধাতিশয্য ; আমাদের প্রেমগাথায় স্বর্গ-নরকের দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু নির্লজ্জ নাগরালি ; আমাদের নিসর্গকাব্যে প্রকৃতির পরিচয় নেই, আছে মাত্র বারমাস্যার বাগ্‌বাহুল্য। এই গেল বাংলার কবিকাহিনী ; এবং যদি সাহিত্যেও ব্যাবসায়িক টান-যোগানের বিধান খাটে, তবে প্রতিধ্বনিপ্রীতি বাঙালী পাঠকের তো বটেই, এমনকি বাঙালী সমালোচকদেরও মজ্জাগত।

হয়তো সেই জন্যে আমাদের বাইরন্-বিলাসী অগ্রজেরা নবীনচন্দ্রকে মহাকবি বলতে দ্বিধা করেননি, এবং আমাদের রবীন্দ্রপ্রভাবিত সম-

সাময়িকেরা সাহিত্যের সীমা-সম্বন্ধে অতটা উন্মুখর। রবীন্দ্রপ্রতিভার ঐকান্তিক মহত্ত্বে এক-আধজন আধুনিক লেখকের আস্থা বরঞ্চ এঁদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী; এবং সাহিত্যের মাত্রা না মানলেও, আত্মশক্তির পরিমিতি সকল স্রষ্টাই হাড়ে হাড়ে বোঝেন। ফলে আমাদের কাব্য-রচয়িতারা কাব্যবিবেচকদের মতো কালাতীতের উপাসক নন, তাঁদের যেহেতু ইতিহাসজ্ঞান আছে, তাই তাঁরা জানেন যে বাইরন্-এর মতো গৌণ কবির অনুকরণই যখন অত শক্ত, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো মুখ্য কবির পদানুসরণ একেবারে অনর্থক।

অতএব সনাতনী বেতসীবৃত্তিকে তাঁরা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন; প্রচলিত ঠাটে মানসীমূর্তির পুনর্নির্মাণ তাঁদের অনভিপ্রেত; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস প্রযুক্ত আত্মবিজ্ঞাপনে, আত্মনিবেদনে নয়। পক্ষান্তরে সাহিত্যের মাত্রা যেমন অনিশ্চিত, তার ধর্ম তেমনই সুবিদিত; এবং স্বতঃসিদ্ধি গণিতের ভিত্তি হলেও, শিল্পসৃষ্টির পটভূমি পরিণামী চিৎপ্রকর্ষ। সেই জন্যে কবিদের বেলায় রোমন্থন যত না গর্হিত, স্বয়ম্ভূতি ততোধিক অভাবনীয়; এবং মার্লো-র সঙ্গে শেক্স্‌পীয়র-এর কার্য-কারণ-সম্বন্ধ মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বর্তমান। কিন্তু এই আর্যসত্যটাকে আমাদের তথাকথিত তরুণ সম্প্রদায় কাজেই স্বীকার করেন, কথায় আমল দেন না; এবং তাঁদের রচনারীতি রাবীন্দ্রিক রলরোলে অনুরণিত বটে, কিন্তু তাঁদের মনোভাবে অধমর্ণোচিত বিনয় নেই।

তাই ব'লে তাঁরা নিন্দনীয় নন; এখানেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই অনুকারী। বরং এ-বিষয়ে তাঁদের মৌনিতা তাঁর চেয়ে বেশী শোভন। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এখন সাধারণের সম্পত্তি, আমাদের মাতৃভাষার আজ আর কোনও পৃথক সত্তা নেই; এবং সেই জন্যে তাঁর সম্মোহ কাটাবার চেষ্টায় অনেকে যদিও বদ্ধপরিকর, তবু আত্মরক্ষার উপায় তাঁদের জানা নেই। কিন্তু সামর্থ্য না থাকলেও, ইচ্ছার যে অন্ত নেই, এইটাই বর্তমান বাংলা সাহিত্য-সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা; এবং ঐতিহ্যব্যতিরেকে সাহিত্যসেবা সম্ভব হোক বা না হোক, নির্বিকার ঐতিহ্য শুধু চিরাচারের নামান্তর, যার পাষাণপুরীতে কারুকর্মীই সমাদৃত, রূপকারের যাতায়াত নেই।

সুতরাং সাম্প্রতিকদের বিদ্রোহ সর্বতঃকাম্য ; এবং তার মধ্যে বিপ্লবের পরিমাণ নগণ্য বটে, কিন্তু তার বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

অর্থাৎ আধুনিকেরা যদিও প্রায়ই ভুলে যান যে ব্যক্তিস্বরূপের অভাব কোনও দিন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আস্ফালনে ঢাকা পড়ে না, তবু উত্তররৈবিক ছায়ানুবর্তিতায় কাকজ্যোৎস্না জাগিয়েছেন তাঁরাই, আমাদের নিরিন্দ্রিয় নিরুদ্দেশযাত্রা শেষ হয়েছে তাঁদেরই নির্দেশে। তাই শুধু সাধনার বিচারে আমাদের নূতন লেখকদের আমি অত্যাধুনিক ইংরাজ কবি অডেন্ বা স্পেণ্ডর বা ডে ল্যুইস্-এর সমপাঙ্‌ক্তেয় মনে করি ; এবং সিদ্ধিতে, অথবা লোকমতে, এই বিদেশীরা আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে থাকলেও, সে-জন্যে হয়তো ভারতের ভাগ্যবিধাতাই দায়ী। হয়তো প্রতিষ্ঠা পশ্চিমে সুকর ; হয়তো সেখানকার আত্মনিষ্ঠ সমাজ স্বকীয়তার মূল্য দিতে জানে ; হয়তো ইংরাজী সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ ফল্গুর মতো প্রেততর্পণের মরুতীর্থ নয় ব'লে, উর্বরতা সেখানে উৎসের চার পাশেই ধরা পড়ে না, নদীসংলগ্ন শ্মশানও সে-দেশে শ্যামল।

তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রাপসারণ আর সংস্কারমুক্তি এক নয় ; এবং প্রকৃত কবি-মাত্রেই যদিচ প্রথম প্রকরণে অভ্যস্ত, তবু দ্বিতীয় অবস্থার অধিকারী শুধু তথাগতেরা। এ-কথা আধুনিক বাংলার একাধিক কবি হয়তো জানেন ; এবং সেই জন্যে তাঁরা পুনর্বাদেরই প্রতিকূল, অনাসৃষ্টির চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত নন। উপরন্তু সে-প্রয়াস নিতান্ত নিরর্থক ; এবং আমাদের বস্তুজ্ঞান তো সাধারণ্যের অন্তর্গত বটেই, এমনকি আমাদের ভাষাও সার্বজনীন, তার মারফতে আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি স্বতই অসম্ভব। তবে কবিরা অন্যদের চেয়ে আত্মচেতন ; এবং নিজ গুণে না হোক, আঠারো শতকের শেষ থেকে তাঁদের স্বকীয়তা-সম্বন্ধে পশ্চিমে যে-জনশ্রুতি চ'লে আসছে, অন্তত তার শাসনে তাঁরা অপেক্ষাকৃত আত্মস্থও। অতএব তাঁদের জাতিব্যবসায়ে আর সামবায়িক সঙ্কল্পের প্রাদুর্ভাব নেই ; তাঁরাও আজকাল স্বাধীন প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী।

তবু কবিজীবন কাব্যের চেয়ে ব্যাপক ; এবং আমাদের ভাবে যতই মৌলিকতা থাকুক না কেন, স্বভাবে আমরা নিতান্ত নির্বিশেষ। অগত্যা

বাংলা কাব্যের নব্য তন্ত্রও আগা-গোড়া নূতন নয় ; এবং ইদানীন্তন কবিরা আনুপূর্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই কাটিয়ে উঠেছেন, পরিপ্রেক্ষিতের পরবশতা ঘোচাননি। কিন্তু এর মধ্যে লজ্জার হেতু নেই। কারণ কাব্য আর দর্শন বিভিন্ন বস্তু ; এবং কবির সমস্ত শক্তি যেকালে রূপসন্ধানে নিয়োজিত, তখন তত্ত্বের জন্যে তিনি অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য। এ-নিয়ম দান্তে থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল মহাকবির সম্পর্কে খাটে ; এবং দান্তে যেমন "সুমা"-র রসানুবাদ ক'রে খৃষ্টান আখ্যা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনই উপনিষদের অনুগত ব'লে, হিন্দু সভ্যতারই কবি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে লোকযাত্রার লক্ষ্য বদলেছে: আজ আমাদের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলোয় একমাত্র পরগাছাই বোধিদ্রুম-রূপে বিরাজমান ; যান-বাহনের বাহুল্যে পৃথিবীর প্রসার সঙ্কুচিত ; এবং সার্বভৌম অন্নাভাবে সকল মানুষের অবস্থা সমান। কাজেই আমাদের আধুনিকেরা বৈদান্তিক বীক্ষায় নির্ভর হারিয়েছেন ; তাঁদের মতে ভূমার দিকে নজর রেখে মোটর-ধাবিত রাজপথে চলা বিপজ্জনক। ফলত বর্তমান বাংলা সাহিত্য আর ভোরের কুয়াশায় আচ্ছন্ন নেই, তার পরিমণ্ডল এখন অস্তরাগে রঞ্জিত। কিন্তু এ-জন্যেও সাম্প্রতিকেরা চিন্তাশীল ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিযোগ অগ্রাহ্য। কারণ এ-ক্ষেত্রে তাদের বৈদেশিকতা দোষাবহ বটে, কিন্তু তাদের মনুষ্যধর্ম শ্রদ্ধেয়।

অবশ্য বৈদিক সভ্যতার বিধান মানলেই, মনুষ্যধর্ম নিপাতে যায় না ; এবং রবীন্দ্রনাথ যদিও ভাবেন যে মানুষ অমৃতের পুত্র, তবু তিনি মনুষ্যধর্মেরই পুরোহিত। কিন্তু তাঁর পটভূমিকা নিরুপাখ্য ব'লেই, বিশ্বমানবের চিত্রকেও তাতে বেখাপ্পা লাগে না ; এবং আধুনিকেরা পরস্পরের মধ্যে খুঁটি-নাটির মিল ধরতে পেরেই আত্ম-পরের প্রভেদ ভুলেছে। অতএব কেবল সন্ধানের বিচারে সাম্প্রতিক দর্শনের জয় হয়তো অনিবার্য। অন্ততঃপক্ষে অধুনাতনীরা দেখে শেখার সুযোগ পায়নি ; তারা সাধারণত ঠেকেই শিখেছে ; এবং সেই জন্যে যেখানে সম্মানের মাত্রা সিদ্ধির উপরে নির্ভর করে না, শুধু সাধনার মুখ চায়, সেখানে তাদের পাশ্চাত্য পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সাধুবাদের যোগ্য। তাছাড়া বর্ণসঙ্করতায় বাংলা সাহিত্য অভ্যস্ত ; এবং রবীন্দ্রনাথের

নিজের বিশ্বাস যে আদর্শের দিক দিয়ে, এমনকি ভাবের হিসাবনিকাশে, তিনি খাঁটি বাঙালী নন।

বস্তুত প্রাক্‌মাইকেলী যুগেও কমঠবৃত্তির আদর ছিল না; এবং ভারতচন্দ্রের চরিত্র যদিও আর্যপন্থী, তবু তাঁর ভাবনায় ও ভাষায় মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং হাল আমলের বনেট্‌-পরা সরস্বতীও দেবতা; তিনিও বরদা ও নমস্যা; এবং দর্শন দূরের কথা, প্রতীক ও কবিপ্রসিদ্ধির প্রয়োজন কাব্যে যত দিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, তত দিন অ্যাফ্রোডাইটি উর্বশীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তবে শিল্প হেতুপ্রভব হলেও, তার ভূমিকার সমস্তটাই যদৃচ্ছালব্ধ নয়, তাতে অতিদৈবের স্থান আছে; এবং সাহিত্যপ্রসঙ্গে উপযোগবাদ যেহেতু অকাট্য, তাই তার উদ্দেশ্যে ও সার্থকতায় দ্বিরুক্তি নিষিদ্ধ। ফলে আমাদের সাগরলঙ্ঘনের কৈফিয়তে শুধু কালনিষ্ঠার নাম শুনে আমার জিজ্ঞাসা বারণ মানে না, সিন্ধুপারের মায়াকাননে বন্দিনী সীতার কুশল-প্রশ্নও স্বতই মনে আসে।

এখানে আবার রবীন্দ্রনাথই আমাদের আদর্শ ও আশ্রয়; এবং কতকটা অবস্থাগতিকে আর অংশত রুসো-পরবর্তী পশ্চিমী লেখকদের দৃষ্টান্তে, তিনি অবাল্য নিজেকে ব্রাত্য-রূপেই দেখে এসেছেন। কিন্তু কোনও দিন কেবল অনুকরণে তাঁর মন ওঠেনি; এমনকি স্বরচিত রীতিকে মুদ্রাদোষের স্থায়িত্ব দিতেও তাঁর রূপকারী বিবেক আপত্তি তুলেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু আত্মসচেতন পুরুষ, তিনি অচেতন মানুষ নন; এবং উৎকর্ণ উন্মুখিতাই যেকালে রৈবিক জীবনযাত্রার বিশেষ গুণ, তখন তাঁর মনে পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাত সম্ভাবনীয়—অত্যাধুনিক বাংলা সাহিত্যও যে তাঁকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেনি, এ-কথা খুব জোর গলায় বলা শক্ত। তাহলেও তাঁর ঋণপরিগ্রহ দৈন্যবিরহিত ও বিলাসবর্জিত; তাতে অকর্মণ্যতার কোনও আভাস নেই; তাঁর হাতচিঠির আষ্টে-পৃষ্ঠে আন্তরিক প্রয়োজনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান।

দৃষ্টান্ত হিসাবে গদ্যকবিতা-নামক তাঁর অধুনাতন কাব্যপ্রকরণ উল্লেখযোগ্য; এবং আমাদের বেলা ওই অতিচ্ছন্দ স্বেচ্ছাচার যদিও বাক্‌সর্বস্ব ভূতের বাসা, তবু তাঁর পক্ষে সেটা সম্প্রতিবেত্তার অত্যাবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্য—পরিণামী

ব্যক্তিস্বরূপের স্বাধিকারবিস্তার। তৎসত্ত্বেও তিনি নিশ্চয় গদ্যচ্ছন্দের অপ-প্রয়োগ সব সময়ে বাঁচাতে পারেননি; এবং মাঝে মাঝে এই নববিধানে যে-সকল বিষয় ঢুকে পড়েছে, সে-সমস্ত হয়তো "পূরবী"-র আদিসমাজেই বেশী আরাম পেত। কারণ বংশের গুণে এবং তৎকালীন পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি-দর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিল যে জগৎ আনন্দময় এবং চূর্ণ মর্ত্যসীমার উত্তরে দেবতার অপার মহিমা বিদ্যমান। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও তাঁর অপসিদ্ধান্ত একেবারে অপসারিত হয়নি; এবং সুন্দরের অভ্যস্ত ধ্যানে তিনি এখনও বিমুখ নন ব'লেই, তাঁর হাতেও গদ্যকবিতা অল্প-বিস্তর অপব্যবহৃত।

তাহলেও কুৎসিতের দৌরাত্ম্যে তাঁর সমাধি আজকাল প্রায়ই উপক্রত; এবং ছন্দ-মিলের সামঞ্জস্যে প্রাক্তন অভিজ্ঞা আর উপস্থিত অভিজ্ঞতার মহামিলন অসাধ্য জেনেই তিনি বীভৎসের সঙ্গে মাধুর্যের সন্ধি-স্থাপন করতে চান গদ্যকাব্যের নৈরাজ্যে। বলাই বাহুল্য যে এই আর্যসমাজী মনোভাবের পিছনে সনাতনী অনমনীয়তা নেই, আছে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার বিস্ময়কর স্থিতিস্থাপকতা। তবু আমাদের খটকা থেকে যায়, সন্দেহ হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বধর্মে নিধন শ্রেয় নয় বটে, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ; এবং সেই জন্যে তিনি বোঝেননি যে প্রাচ্য মায়াবাদে দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্ট অব্যাখ্যাত ব'লেই, সারা এশিয়া আজ অগত্যা বস্তুতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে। উপরন্তু এখানেও প্রতর্ক থামে না; বরঞ্চ তার পরেই প্রশ্ন ওঠে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তিনি যে-উৎকর্ষে পৌঁছেছেন, নাটকরচনার বেলা সে-পরাকাষ্ঠা তাঁর নাগালে আসেনি কেন।

আসলে তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব ও বিরাট্ সিদ্ধি নিয়ে নাটকপ্রণয়ন হয়তো দুষ্কর। অন্ততঃপক্ষে ট্র্যাজেডির জনকমাত্রেই নিরাসক্ত ও আত্ম-বিস্মৃত; এবং অদৃষ্টবাদে আস্থা না রাখলেও, তার হয়তো চলে, কিন্তু টেরেন্স্-এর প্রতিধ্বনি ক'রে সে আজীবন বলতে বাধ্য যে মনুষ্যত্বের অপকর্ষও তার সুপরিচিত ও আত্মনিহিত। "পরিশেষ", "পুনশ্চ" ও "বীথিকা"-র এক-আধটা কবিতার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও এ-স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রনাথের আত্মমর্যাদাবোধে আটকায়; এবং তিনি যদিও সংস্কৃত কবিদের

আবশ্যিক শুভবাদ কাটিয়ে একাধিক বিয়োগান্ত নাটক লিখেছেন, তবু মহাপুরুষেরা সুদ্ধ যে অন্ধ নিয়তির পদানত, এ-কথা তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয় ঠেকে। অর্থাৎ তিনি মানেন না যে শুভাশুভের বিকল্প অনিবার্য ; এবং মানুষ কোন্ ছার, লাইব্‌নিৎস্ স্বয়ং বিশ্ববিধাতার মধ্যে সাধ ও সাধ্যের দ্বন্দ্ব দেখেছিলেন।

উত্তরসামরিক মানুষের পক্ষে এ-বিশ্বাসের ভাগ নেওয়া অসম্ভব ; এবং বাঙালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল-হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে তিনি বাংলা দেশে বৃথাই জন্মাননি, জ'ন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন। নচেৎ বঙ্গসাহিত্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ স্বপ্নপ্রয়াণে তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো দুষ্কর বটেই, এমনকি তিনিও যেকালে দুঃস্বপ্নের উপদ্রব একেবারে ঠেকাতে পারেননি, তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও, বিশ্বব্যাপ্ত বিভীষিকার সঞ্চারে চমকে উঠব।

কিন্তু চমকে ওঠাই যথেষ্ট নয় ; তার পরে যে আবার ফিরে শোবে, ভবিষ্যতে পুনর্জাগরণের সুযোগ তার ভাগ্যে জুটবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং রাবীন্দ্রিক গদ্যচ্ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী, একাবলীর উপযুক্ত মধুর মনোভাব ব্যক্ত ক'রেই আধুনিক বাঙালী কবির রক্ষা নেই, যুগধর্মে দীক্ষাগ্রহণ তার অবশ্যকর্তব্য। এ-কথা না মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময়প্রকাশ অনুচিত।

[ ১৯৩৬ ]

বুদ্ধির সিদ্ধান্তে বিশ্বাসের সমর্থন যেমন সাধারণত দুষ্প্রাপ্য, তেমনই ওই পরস্পরবিরোধী বৃত্তিদ্বয়ের সহযোগী নির্দেশ ব্যতীত জ্ঞানমার্গের মতো কর্মকাণ্ডও অলাতচক্রের প্রকারভেদ ; এবং সেই জন্যে যদিচ আবাল্য বুঝে আসছি যে অতিমানুষ রবীন্দ্রনাথ সুদ্ধ চিরায়ু নন, তবু একাশী বৎসরে তাঁর আমন্থর ভবলীলাসংবরণ অন্তত আমার কাছে যে-পরিমাণ আকস্মিক লেগেছে, সে-রকম অভিভাব আপাতত আধিদৈবিক সর্বনাশেরই অনুবর্তী। অবশ্য প্রায় বিশ বছর আগে তাঁর অকাল মৃত্যুর অমূলক সংবাদে কলিকাতা নগরী যখন এক বার বিচলিত হয়ে উঠেছিল, তখন ট্রামে সে-খবর শুনে, মনে পড়ে, আমি চোখের জল সামলাতে পারিনি ; এবং তার পরেও নানা সময়ে অনুরূপ জনরবে যে-শোক পেয়েছি, তার পুনরভিনয় চল্লিশোর্ধ্বে যত না অশোভন, ততোধিক অসাধ্য। উপরন্তু ইতিমধ্যে রাবীন্দ্রিক জীবনবেদের বিপরীতে চলতে চলতে লোকযাত্রা আমাকে ও আমার সমবয়সীদের নিয়ে আজ যেখানে উপনীত, সেখান থেকে দেখলে, তিনি বুদ্ধ, ক্রাইস্ট্‌ প্রভৃতি অনর্থক প্রবক্তাদের অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়াতেই মিশিয়ে যান ; এবং তৎসত্ত্বেও না মেনে উপায় থাকে না বটে যে তিনি সাহিত্য-প্রগতির অত্যাধুনিক পথপ্রদর্শকদেরও শীর্ষস্থানীয়, তথাচ সেই সঙ্গে এ-মন্তব্য অনস্বীকার্য ঠেকে যে, কল্পান্তের বিক্ষোভ পর্যন্ত তাঁকে সংস্কারমুক্তির প্রেরণা যোগায়নি ব'লেই, তাঁর ভাগ্যে শুদ্ধ রূপ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতির অবহিত ধ্যান-ধারণার অপার সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু এ-সমস্তই বুদ্ধির ব্যাপার ; এতে যেহেতু বিশ্বাসের অনুমোদন নেই, তাই রবীন্দ্রনাথের তিরোধান, কেবল আমার কেন, প্রত্যেক অর্বাক্‌পঞ্চাশ বাঙালীর পক্ষে পিতৃবিয়োগের

সমকক্ষ ; এবং এ-উক্তি উৎপ্রেক্ষামূলক রূপক-মাত্রই নয়, পিতা-শব্দের পরিচিত সংজ্ঞা-কটা যাঁদের বিদিত, তাঁরাই জানেন যে কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

সুতরাং আজ এ-বিবেচনায় আমাদের সান্ত্বনা নেই যে রবীন্দ্রনাথের মতো স্বাবলম্বী ও সিদ্ধার্থ পুরুষের কাছে বার্ধক্যের স্থবির মৌন নিশ্চয়ই দুর্বিষহ লাগত ; এবং পুরাকালে সফোক্লিস্ আর ইদানীং গ্যেটে ও টেনিসন্ বাদে অপর কবিরা যখন আশীর পরে আর কলম চালাতে পারেননি, তখন তিনিও সম্ভবত "ছেলেবেলা"-য় তাঁর অতুলনীয় সৃজনী শক্তির উপান্তে আর "রোগশয্যা", "আরোগ্য" ইত্যাদি বই-কখানাতে উক্ত প্রতিভার প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। কারণ যৌথ পরিবার-ভুক্ত পুত্র যেমন নিজের বা পিতার বয়স ভুলে স্বভাবত মনে করে যে তিনি সদা-সর্বদা তাকে বিপদে পরামর্শ আর সম্পদে সাধুবাদ যুগিয়ে যাবেন, তেমনই, আর সকলের উল্লেখ স্থগিত রাখলেও, অন্তত বাংলার উদীয়মান লেখক-মাত্রেই প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে ভেবে এসেছে যে এ-দেশের কবিগুরু অকুণ্ঠিত অভিনন্দনে তার মৌল সঙ্কোচ ঘুচিয়ে তারই অহৈতুক আত্মপ্রসাদ বাড়াবার জন্যে স্বকীয় সাম্রাজ্যের কোনও একটা পরিত্যক্ত বা সদ্যোবিজিত অংশে তাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবেন ; এবং বদান্যের দানও যেহেতু অবিস্মরণীয়, তাই বয়ঃ-কনিষ্ঠদের প্রতি তাঁর প্রকৃতিকার্পণ্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই সাম্প্রতিক স্বীকারোক্তিতে আমরা বিনয়ব্যবহারের বিন্দু-বিসর্গ খুঁজে পাইনি, নিরাসক্ত সমালোচনা-নামক কৃতজ্ঞতার বিকারে ভজাতে চেয়েছি যে, সহস্র ঋণ সত্ত্বেও, আমরা এমনই অকিঞ্চন যে তাঁর ঐশ্বর্যে যদি ফাঁকি না থাকত, তবে আমাদের দুরবস্থা অসম্ভব হত। বিশ্লেষণে বেরিয়ে পড়বে যে এতাদৃশ মতামতের আড়ালে যে-ঈর্ষ্যা আছে, তা শিল্পী-সাহিত্যিকের সুপ্রসিদ্ধ পরশ্রীকাতরতাই নয়, এ-রকম মাৎসর্য নাতিহ্রস্ব অপত্য-সম্পর্কের অনিবার্য উপসর্গ ; এবং রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে আমাদের ব্যক্তিগত অশক্তির দায় মূলাভাবে আমাদেরই উপরে চড়বে জেনে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানিনি যে, তাঁর মধ্যে মানুষী দোষ-গুণের অপ্রতুল নেই ব'লেই, তিনিও মৃত্যুর ইচ্ছাধীন।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যের পিতৃ-পদবাচ্য নন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে-প্রক্রিয়ার নাম আরোপ, তারই সার্বভৌম অভিব্যাপ্তিতে তিনি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর মানস প্রতিমূর্তি; এবং রাবীন্দ্রিক ভাষার কালগত সামান্যীকরণই এই অদ্বৈতসিদ্ধির মুখ্য হেতু বটে, কিন্তু ভাষা ও অভিজ্ঞতার সংযোগ যেকালে নিতান্ত দুশ্ছেদ্য, তখন আমাদের ভাবনা-বেদনাও মোটের উপর তাঁর দৃষ্টান্তে নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে এ-রকম প্রভাব বৈবিক মাহাত্ম্যের নিঃসংশয় প্রমাণ হোক বা না হোক, উক্ত সোঽহংবাদের দুর্বিনীত বিজ্ঞাপনই বাঙালীকে আর সকল ভারতবাসীর চক্ষুশূল ক'রে তুলেছে; এবং বাঙালীর ঔদ্ধত্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথের বিদূষণ যদিচ অন্যায়, তবু আমাদের আত্মশ্লাঘা তাঁর আত্মসচেতন ব্যক্তিস্বরূপেরই অপকর্ষ। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয়তা যে-পরিমাণে সর্বগ্রাহ্য, বাঙালীর জাত্যভিমান ঠিক সেই অনুপাতে অস্বীকার্য; এবং এ-কথা সে নিজেও বোঝে ব'লে, এক দিকে সে যেমন পথান্তর সত্ত্বেও সাধ্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্কে চলে, তেমনই অন্য দিকে, পাছে ছোঁয়াচ লেগে তার প্রাতিভাসিক কীর্তিকলাপের বিলোপ ঘটে, সেই ভয়ে সে নিজের সঙ্গে অপর প্রাদেশিকদের নিঃসন্দেহ সাদৃশ্যটুকুও মানতে চায় না। একটু খুঁজলেই, ধরা পড়বে যে এতখানি মমত্ববোধ কেবল তাদের বেলায় সহজ, যারা নিজেদের দারিদ্র্য ভুলতে না পেরে মৃত্যুর আশঙ্কায় নিরন্তর তটস্থ থাকে; এবং মরণের উপলব্ধি যেহেতু সর্বত্র পরোক্ষ, তাই উগ্রতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যতীত আর কোনও উপায়ে মুমূর্ষু নিঃস্বের মানরক্ষা সম্ভব নয়। এত দিন ধ'রে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন ও অনুপম সাধনা প্রতিবিম্বপাতে বাঙালীর মুখ বাঁচিয়ে আসছিল, তাঁর দেহাবসানে বাংলার ভঙ্গুর প্রাণসামগ্রীর আবরণ ঘুচে, ফুটে বেরোল তার অকিঞ্চিৎকর আর্তি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালীর যথাসর্বস্ব হলেও, তাঁর বিশ্ববীক্ষা অত্যল্প কালের মধ্যে বাংলার ঐতিহাসিক, তথা ভৌগোলিক, চতুঃসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল; এবং যে-একদেশদর্শী শুভবাদ তাঁর প্রাকাম্যের উত্তর সাক্ষ্য, তাতে ধ্রুপদী মনুষ্যধর্মের সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য নেই বটে, কিন্তু মহামানবের প্রতিনিধিত্বে তাঁর পদমর্যাদা ব্যাস, হোমর ও শেক্‌স্‌পীয়র-এর

সমান। কারণ সংসারে অমঙ্গল ও অন্যায় যত প্রশ্রয়ই পাক না কেন, সে-সমস্তের অভিধা কখনও শ্রেয়োবোধের মতো নির্বিকার থাকেনি, যুগে যুগে, উপলক্ষে উপলক্ষে বদ্‌লেছে; এবং তার ফলে সক্রেটিস্‌-প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ভাবতে পেরেছিলেন যে বাহ্য সুযোগ-সুবিধার দিকে না দেখে, যেই অন্তর্যামীর পানে তাকায়, আত্মস্থ মানুষ অমনই আর্ষসত্যের স্বরূপ চেনে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ স্থান, কাল ও পাত্রের নিয়োগ সাধ্যপক্ষে সইতে চাননি; সকল প্রকার প্রথা ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে পীড়া দিয়েছিল; এবং তাঁর সাধনালব্ধ স্বাচ্ছন্দ্য সহধুরীর অভাবে শেষ পর্যন্ত যাতে স্বৈরাচারে না দাঁড়ায়, সেই চেষ্টায় তিনি যৌবনে শান্তিনিকেতন আর প্রৌঢ় বয়সে বিশ্বভারতীর বিরাট্‌ প্রাঙ্গণে স্বদেশবাসীকে সাহচর্যে ডেকেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর পৌনঃপুনিক আহ্বানে যদিচ দেশ-বিদেশে আশানুরূপ সাড়া জাগেনি, তাহলেও তাঁর ত্যাগে পুষ্ট উক্ত শিক্ষাপরিষদের প্রযত্নে শুধু বঙ্গীয় সংস্কৃতি নয়, সমগ্র ভারতের চিৎপ্রকর্ষই আজ বেশ খানিকটা উন্নত; এবং তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নাম যখন মনে পড়ে, তখন সমতলবেষ্টিত কোনও এক সমুচ্চ শৈলশৃঙ্গের ছবিই যেমন মানস পটে ভেসে বেড়ায়, তেমনই এই অপ্রতিকার্য স্তরভেদের জন্যে দায়ী তাঁর পরমুখাপেক্ষী স্বজাতির স্বার্থবুদ্ধি। অন্ততঃপক্ষে তাঁর আদর্শে বা উদ্যমে অধিকারবাদের গ্লানি নেই; এবং তবু আমার বিবেচনায় তাঁর অব্যর্থ জীবনের যৎকিঞ্চিৎ বৈফল্য ওইখানেই। অর্থাৎ সে-বৈফল্যের ব্যাখ্যা বোধহয় এই যে প্রাতিস্বিক মহত্ত্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধি থেকেই তিনি জনসাধারণকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন; এবং তাই তিনি চোখ-কানের আপত্তিতেও বোঝেননি যে প্রাচ্য পুরুষসিদ্ধির প্রস্তাব আত্যন্ত মৌখিক।

অবশ্য তার মানে এমন নয় যে তিনি এশিয়ার মোহপাশে জড়িয়ে প'ড়ে য়ুরোপকে তফাতে রেখেছিলেন; এবং তাঁর অধিকাংশ ইংরাজী বক্তৃতা যেমন পাশ্চাত্ত্য শোষণনীতির তীব্র প্রতিবাদ, তাঁর অনেক বাংলা প্রবন্ধ তেমনই ভারতীয় অনাচারের অপ্রিয় নিন্দা। পক্ষান্তরে দুর্মুখ যে সত্য-নিষ্ঠার একমাত্র আদর্শ, তা তিনি মানতেন না, তিনি জানতেন যে অনেক সময় অনুকম্পার অভাবেই অপলাপ বাড়ে; এবং সেই জন্যে তিনি আমরণ

কখনও শুচিবায়ুর প্রশ্রয় দেননি—কি পূর্বে, কি পশ্চিমে, যেখানেই স্বরাট্ মানবাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সেখানেই তাকে অকাতরে অর্ঘ্যনিবেদন ক'রে গেছেন। আসলে মানুষের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল অসীম ; তাঁর দীর্ঘ জীবনে একাধিক বার নরপিশাচদের ধ্বংসতাণ্ডব দেখেও তিনি মুহূর্তমাত্র ভাবতে পারেননি যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতায় সকলের অধিকার ও আস্থা সমান নয় ; এবং এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদিও অন্ধ-উপাধিরই উপযুক্ত, তবু সে-অন্ধতা যে দুর্বল দৃক্‌শক্তির নিদর্শন নয়, নিরপেক্ষ সঙ্কল্পের অত্যুত্তম উদাহরণ, তাও এক রকম তর্কাতীত। কারণ সুধীশ্রেষ্ঠ ফর্স্টর ঠিকই বলেছেন যে ব্যক্তির মৃত্যু আর সভ্যতার বিনাশ দুইই নিরতিশয় নিশ্চিত বটে, কিন্তু উভয়ত্র আমাদের কর্তব্য এমন ভাবে চলা যাতে দর্শকের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে ব্যক্তি অমর আর সভ্যতা চিরন্তন ; এবং উক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয় যতই মিথ্যা হোক, যে-কোনও একটাকে ছাড়লে, মনের মুক্তি দূরের কথা, দেহের পুষ্টি পর্যন্ত দুঃসাধ্য লাগে। আমার বিচারে এই দুটি লোকোত্তর প্রত্যয়ের প্রাদুর্ভাব রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে ও চর্যায় যতখানি স্পষ্ট, অন্য কোথাও ততটা পরিষ্কার নয় ; এবং তাই তাঁকে হারিয়ে বঙ্গদেশই সর্বস্বান্ত নয়, সারা পৃথিবীও দুর্দশাগ্রস্ত—বিশেষত আজ যখন সমস্ত আকাশে সংবর্তের ঘোর ঘটা, ঝঞ্ঝাবাতে অতিজীবিতের আর্তনাদ আর নবজাতকের অবেদ্য ক্রন্দন, সন্ধিক্ষণের আলোকে অনিশ্চয়, হতাশা আর অভীপ্সার দ্বন্দ্ব।

স্বভাববৈগুণ্যে আমি আজন্ম দুঃখবাদী ; আমার অনুমানে সমাজবিবর্তন তো জীবপ্রগতির বিমুখ বটেই, এমনকি জড়জগতের মতো মনুষ্যসংসারেও যাদৃচ্ছিক শৃঙ্খলার আনুপূর্বিক হ্রাস সকল রকম ক্ষতিপূরণের অন্তরায় ; এবং সেই জন্যে আমার ভয় হয় যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ও দিগ্বিজ্ঞান ব্যতীত প্রলয়সঙ্কুল কালস্রোতে সভ্যতার নিরুদ্দেশযাত্রা বুঝি বা কূল খুঁজে পাবে না। কিন্তু মানবেতিহাসে উপনিপাত এই প্রথম নয় ; এবং প্রতি বারে যখন যুগান্তের দুর্যোগ কেটে সুপ্রভাত এসেছে, তখন এ-বারেও, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্হিত ব'লেই, নরলোক চির তিমিরে তলিয়ে যাবে না। উপরন্তু এ-সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই গণনীয় যে, শুধু আমাকে আর আমার ভোগাসক্ত

সগোত্রদের ঝেঁটিয়ে ফেলে নয়, রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের আমূল উচ্ছেদেই আগন্তুক নববিধান বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল সাধবে; এবং সেই ব্যবস্থাপরিবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও সংস্কারস্বপ্ন হয়তো তদানীন্তন বিবেচকদের কাছে ঠিক ততখানি কৌতুকপ্রদ ঠেকবে, বর্তমান উদারচেতাদের বিচারে যতটা হাস্যকর মনুসংহিতার বিধি-নিষেধ। পক্ষান্তরে সে-দিনেও রবীন্দ্ররচনাবলীর সাহিত্যিক মূল্য তিলার্ধ কমবে না; তখনকার বিদগ্ধেরাও একবাক্যে মানবে যে, কি গদ্যে, কি পদ্যে, এতখানি রসকৈবল্যে খুব কম লেখকই পৌঁছাতে পেরেছে; এবং সময়ের গতি যেহেতু সামান্য থেকে বিশেষের দিকে, তাই ভাবী পণ্ডিতেরা যেমন অগত্যা তাঁর সর্বতোভদ্র সৃজনী প্রতিভারই গুণ গাইবে, তেমনই অনাগত চিত্রকরেরা ঈর্ষ্যান্বিত চোখে দেখবে তাঁর আলেখ্যশিল্পের অশিক্ষিত পটুত্ব। তাছাড়া ভবিষ্যৎ নিসর্গবিলাসীরা তাঁর স্বভাবোক্তিতে শুনবে বঙ্গশ্রীর মর্মবাণী; আগামী ঐতিহাসিকেরা তাঁর ছোট গল্পে প্রত্যক্ষ করবে বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ তথা আচার-ব্যবহার; এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মন্দারমাল্যে ফুটে থাকবে বঙ্গীয় চিৎপ্রকর্ষের অনেকান্ত সঙ্গতি।

আমার বিশ্বাস সারস্বত সমাজ শ্রেণীবিভক্ত নয়, সে-গণতন্ত্র সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত; এবং সাহিত্যসমালোচকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যদিও এ-অনুমানের বিপক্ষে, তবু লেখকবিশেষের পদবী-পরিচ্ছেদ শিল্পবুদ্ধির বিষয়-বহির্ভূত ব'লে, আমি সাধ্যপক্ষে বিচার করতে প্রস্তুত নই রবীন্দ্রনাথ ভাবী পাঠক-পাঠিকাদের ভোটে কোন্ কবির ঈষদূর্ধ্বে বা নাতিনিম্নে স্থান পাবেন। তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই আদি ও অকৃত্রিম কবি; এবং অন্তত মনোবিকলনীদের মীমাংসায় প্রাথমিক প্রবর্তনাই পরিণামের বিধানকর্তা। মনে পড়ে অন্ধ গুরুজনদের অজস্র বিদ্রূপ সয়ে, যেন যুগান্তরে, রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে আমার পুলকিত পরিচয়; এবং তার অব্যবহিত পূর্বে পিতৃদেবের অধ্যাপনায় কোল্‌রিজ্‌-এর গ্রন্থাবলী-পাঠে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলুম বটে, কিন্তু মাতৃভাষার অনুগ্রহ-ব্যতিরেকে কবিতার হৃদয়সংবেদ্য, ঐকান্তিক আবেদন যেহেতু আমাদের মর্মে পৌঁছায় না, তাই

"এন্‌শেন্ট্‌ ম্যারিনর"-ও আমাকে "গীতাঞ্জলি"-র মতো মাতিয়ে তোলেনি। অবশ্য তদনন্তর অস্তাকাশে পাখা ঝাপটাতে শিখে দূর থেকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে-বিরাট্‌ দৃশ্য দেখেছি, তার পাশে স্বদেশের সব কিছুই কেমন নাতিবিস্তীর্ণ ঠেকেছে ; এবং ইতিমধ্যে রৈবিক আদর্শে কাব্যসৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টায় আত্মধিক্কৃত যৌবন কাটিয়ে অবচেতন অসূয়ার তাড়নায় আমি রটাতে ছাড়িনি যে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমী কবিদের চেয়ে তো নিকৃষ্টই, এমনকি সেই সঙ্গে তিনি তাদের অক্ষম অনুকারক-মাত্র। তাহলেও যখনই ভেবেছি, তখনই না মেনে উপায় থাকেনি যে কাব্যের আনন্দময় স্বরূপ-সম্বন্ধে তিনিই আমার অদ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ; এবং তৎক্ষণাৎ বোধির অতিযুক্তি উদ্ভাসে বুঝতে পেরেছি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে রসোপলব্ধি কেন ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। কাব্যকলার কৌশল-সম্পর্কেও বাংলা দেশের যতখানি জ্ঞান, সে-সমস্ত তাঁর শিক্ষাপ্রসূত তথা দৃষ্টান্তলব্ধ ; এবং সেই জন্যে, ভক্তবৃন্দের মনে আঘাত লাগবে জেনেও, আমি এক বার লিখেছিলুম যে রৈবিক সাহিত্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য এই যে আজকালকার কবিযশঃপ্রার্থীদের রচনারম্ভও প্রাঙ্‌-"মানসী" কবিতাবলীর চেয়ে অধিক অনবদ্য।

আসলে আমাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূল্য-নিরূপণ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার চেয়েও হাস্যকর ; এবং সে-চেষ্টায় আমি স্বভাবত উদাসীন। এমনকি আমার পক্ষে তাঁর বিভিন্ন পুস্তকের স্তরভেদ-নির্ণয় পর্যন্ত সহজসাধ্য নয় ; তাঁর রচনারীতি, চিন্তাপদ্ধতি ও অনুভূতিপ্রকরণের নিঃসন্দেহ ক্রমবিকাশ সত্ত্বেও প্রায় তাঁর প্রত্যেক বই আমার কাছে অনিন্দ্য ও অখণ্ড ঠেকে ; এবং সেগুলির যে-কোনওটিতে যদি তাঁর কাব্যজীবনের সমাপ্তি ঘটত, তবু আমি তাঁকে মহাকবি ব'লে জানতুম। উপরন্তু এই প্রাতিপদিক অবৈকল্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যেও সুলভ নয় ; এবং যাঁদের মতে মুক্তিনির্গমের দাবি বর্ণবিচার ব্যতীত টেঁকে না, তাঁরাই সর্বাগ্রে স্বীকার করবেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু উল্লিখিত কুললক্ষণের জোরে অক্ষয় স্বর্গে উচ্চাসন পাবেন। কিন্তু সে-অমরাবতীর পরিধি যত না অপরিসর, তার অধিবাসিসংখ্যা ততোধিক অপরিমেয় ; এবং অন্তত জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন যে আভিজাতিক বিবিক্তির সুযোগ জনগণের আয়ত্তে না এলে, সভ্যতা মিথ্যা

ও মানবজাতি অসার্থক। অতএব ব্যক্তি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টা-দ্বৈতই আমার বিবেচনায় তাঁর চরম ও পরম পরিচয়; এবং পৃথিবী-সম্বন্ধে আমার যে-অল্প অভিজ্ঞতা আছে, তার নির্বন্ধে আমি অগত্যা মানতে বাধ্য যে নিছক কবিত্বে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হোন বা না হোন, নিপট মনুষ্যত্বে তাঁর সমকক্ষ আমাদের যুগে খুব বেশী জন্মায়নি। তাই করুণা জাগে সেই অজাত নর-নারীদের জন্যে, যারা তাঁকে চিনবে কেবল তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যস্থতায়, যাদের মানসে তিনি আঁকা থাকবেন মাত্র নামমাহাত্ম্যে; এবং যখন মনে পড়ে যে আমার ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎ স্নেহ প্রচুর পরিমাণে জুটেছিল, তখন প্রাণধারণের গ্লানিও আর অসহ্য লাগে না, খেদ-ক্ষোভের তলায় তলায় বুঝতে পারি তাঁর সংস্পর্শে আমার দিনগত পাপের বোঝা কতখানি ক্ষয়ে গিয়েছিল। তবে এ-রকম স্মৃতি শেষ পর্যন্ত হানিকর; এর উপসংহার শ্মশানবৈরাগ্যের অকর্মণ্য উচ্ছ্বাসে; এবং রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ অসংযমকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন, তাঁর ঐতিহ্যবোধের মূল মন্ত্র ছিল উত্তরাধিকারের সাদর অঙ্গীকারে পুরুষকারের নিরন্তর চক্রবৃদ্ধি।

[ ১১ অগস্ট ১৯৪১ ]

# উক্তি ও উপলব্ধি

সাহিত্যসাধনায় সাধ ও সাধ্যের সামঞ্জস্য দুর্ঘট ব'লে, আমার লেখা যদিও অবোধ্য, তবু আমি পড়তে ভালোবাসি প্রাঞ্জল রচনা। তবে সারল্যের অভিধা আপেক্ষিক ; এবং প্রকার ও প্রকারীর অভেদই যেহেতু শিল্পসৃষ্টির মূল সূত্র, তাই স্বল্পাঙ্গ ভাষা রূপকথার পক্ষে যতই উপযোগী হোক না কেন, অনুরূপ উপায়ে জটিল বিষয়ের বিবৃতি স্বভাববিরুদ্ধ তথা ভ্রান্তিজনক। অর্থাৎ স্থূল বুদ্ধির সামান্যীকরণ সব সময়ে সত্যের নাগাল পায় না ; এবং সাধারণ্যই বিজ্ঞানের অম্বিষ্ট বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে ব্যাপক সিদ্ধান্তের মূল্য সরল সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী। ফলত মহাকর্ষের আইন্‌ষ্টাইন্-কৃত সঙ্কেতে ন্যূটনী বোধসৌকর্য নেই ; এবং প্রথমোক্তের মতে সংক্ষিপ্ত সৌকুমার্যের স্বপ্ন সৌচিককেই সাজে, বস্তুনিষ্ঠের ধ্যান-ধারণা অন্য রকমের। অবশ্য ভাষা ভাবের বাহক, না বিধায়ক, তা এখনও তর্কাধীন ; এবং সে-বিবাদ না মেটা পর্যন্ত প্রসাদগুণের সংজ্ঞা-নিরূপণ অসম্ভব। তাহলেও এমন রীতি নিশ্চয়ই বিরল যা উপলক্ষনির্বিশেষে বিশদ ; এবং উক্ত বৈশিষ্ট্য যখন সমগ্র ভাষাকে পেয়ে বসে, তখন আর সন্দেহ থাকে না যে ভুক্তভোগীর সমাজে স্বাবলম্বী অনাদৃত। সুতরাং বাঙালীর ঋজু বাক্যবন্ধ হয়তো বা তার অলস চিত্তবৃত্তির সাক্ষ্য ; এবং পাঁচ শ বছর ধ'রে কলম চালিয়েও সে প্রত্যক্ষকে আয়ত্তে আনতে পারেনি, অথবা অনেকান্ত চিন্তাকে মানাতে শেখেনি যুক্তির শৃঙ্খলা।

কারণ বাংলা গদ্যের বয়স মাত্র এক শ বছর ; এবং তৎপূর্বে যে-পদ্যে আমাদের হৃদয়াবেগ ফুটত, তাও ছিল প্রধানত শ্রাব্য। অবশ্য সকল দেশের কাব্যেই ব্যাকরণ, শব্দবিন্যাস ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজ ; এবং

আবৃত্তিযোগ্য গাথার বিষয়বস্তু অগত্যা এতই সুপরিচিত যে ওই জাতীয় রচনা আসলে নৈর্ব্যক্তিক, নতুবা সামবায়িক। পক্ষান্তরে বাংলার প্রাচীন কবিতা যেহেতু লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকত, তাই শৈথিল্য তাকে লজ্জা দিত না ; এবং ছন্দের ত্রুটি যেমন সুরের সহযোগে শুধরে যেত, তেমনই বিভক্তির বিপর্যয়, তথা অন্বয়ের অসঙ্গতি, ঢাকা পড়ত কথকের অভিনয়-কৌশলে। সম্ভবত সেই জন্যে মাইকেলের প্রাগ্‌বর্তী সংস্কৃতজ্ঞেরাও অমিত্রাক্ষর চালাতে সাহস করেননি ; এবং পদান্ত অনুপ্রাসেই মিত্রাক্ষরের দাবি মিটত, অপরাপর ধ্বনির বৈসাদৃশ্য কেউ কানে তুলত না। উপরন্তু বর্ণাশ্রম ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও তখনকার সমাজে স্তরভেদ খুব বেশী দূর এগোয়নি ; এবং বিদগ্ধ আর যথাজাতের মধ্যে রসজ্ঞানের পরিমাণবৈষম্য দেখা গেলেও, জাতিগত পার্থক্য প্রকাশ পেত না। বলাই বাহুল্য যে ঈদৃশ নির্বিরোধ গ্রাম্য সংস্কৃতির লক্ষণ ; এবং মুসলমানী আমলে বঙ্গদর্শনের পাপ বৈদিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা খণ্ডাতে হত না বটে, কিন্তু এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশের অনাচারী আবহে সামন্তদের প্রভুভক্তি টিঁকত না, তারা দিল্লীশ্বরের বাধ সাধত স্থানীয়দের মন যুগিয়ে। ফলত মোগল দরবারের বিলাসবোধ বাঙালীর অন্তঃকরণে পৌঁছায়নি ; এবং তার স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা রাষ্ট্রশাসনের বহির্ভুক্ত ভেবে সে রাজকার্য সারত পরের ভাষাতে।

এ-অবস্থায় লোকশিল্পের প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক, কেননা লোকশিল্প সর্বত্রই গতানুগতিক প্রয়োজনের সেবক ; এবং এই নিরূপকরণ দেশে দৈবাৎ বৃটিশ্‌ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপাত না ঘটলে, এখানকার রসিকমণ্ডলী আজও বোধহয় চর্বিতচর্বণে তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু অন্তর ও বাহিরের তাৎকাল্য এত দুঃসাধ্য যে উনিশ শতকের মধ্যভাগেও বিবর্ধমান নাগরিক সভ্যতা বাংলা ভাষার নাগালে আসেনি ; এবং বঙ্কিম যখন উপন্যাসরচনার প্রথম প্রেরণা পান, তখন অগত্যা তিনি ইংরাজীর শরণ নিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত, বিদ্যায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, তাঁর মন ছিল প্রাচীনপন্থী ; এবং সেই জন্যে পরবর্তী গ্রন্থাবলী থেকে তদানীন্তন জগৎকে তাড়িয়ে তিনি বাকী জীবন বাংলাতেই কথা কয়েছিলেন বটে, তবু সে-বাংলার ভঙ্গিমা আমাদের চোখে যেমন সাংস্কৃতিক ঠেকে, তেমনই তাঁর সমসাময়িকেরা

তাতে দেখেছিলেন বিদেশের অন্ধ অনুকরণ। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র প্রাদেশিক বঙ্গের শেষ প্রতিনিধি নন, তিনি সার্বভৌম বর্তমানের অন্যতম অগ্রদূত ; এবং গৌড়ীয় ঐতিহ্যের অনাদি পরম্পরা মধুসূদনেই সমাপ্ত, যদিও তিনি আমাদের মঙ্গলকাব্যকে বওয়াতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের প্রণালীতে। সুতরাং সাজ-সজ্জার বৈজাত্য সত্ত্বেও বীরাঙ্গনা তারা নিরতিশয় বাঙালী ; এবং সেই তারার আদর্শে অনুপ্রাণিত, বাক্‌স্বচ্ছন্দ দেবযানী ভারতীয় ছদ্মবেশে শেলি বা ওই রকম কোনও ইংরাজ কবির মানস কন্যা।

অবশ্য আদিম বঙ্গের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা থেমে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার অনেক আগে ; এবং সেই জন্যে "মেঘনাদবধ"-কাব্যের সমালোচনা-কালে তিনি বোঝেননি রাবণসভার বর্ণনায় মাইকেল কেন পূর্বসূরীদের প্রতিধ্বনি করেছিলেন, অথবা কষ্টকল্পনার প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি নিজে প্রাকৃত বাংলার সনাতন সারল্যে পৌঁছেছিলেন প্রায় শেষ বয়সে, যখন অভিব্যক্তি অভিজ্ঞতার দাসত্ব ঘুচিয়ে স্বৈরাচারের সুযোগ খোঁজে ; এবং এই দিক থেকে "ছেলেবেলা"-র সিদ্ধি যদিও অসামান্য, তবু সে-বইয়ের সঙ্গে "জীবনস্মৃতি" মিলিয়ে দেখলে, ধরা পড়বে যে প্রাগুক্ত পুস্তক বিষয়ের ব্যতিরেক-বশত প্রাঞ্জল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ গদ্যই সর্বসম্মতিক্রমে সহজ ; এবং আধুনিক বিচারে তাঁর সারগর্ভ প্রবন্ধাদি বৈশদ্যের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু তাঁর সমসাময়িকদের কাছে সেই সব লেখা অসম্ভব রকমের দুরূহ ঠেকত। অতএব এমন সন্দেহ হয়তো অন্যায় নয় যে বর্তমান বাঙালীর বাক্‌শক্তি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্বুদ্ধ ব'লেই, সে জানে না যে জটিল ভাবনার গ্রন্থি-মোচন তাঁর ধর্ম নয়, তিনি গ্রন্থিচ্ছেদনে সিদ্ধহস্ত ; এবং বিশ্লেষণে প্রকাশ পায় যে তাঁর তুলনামূলক রচনারীতি যেহেতু নিরবকাশ চিন্তার পরিপন্থী, তাই তা সুখপাঠ্য, অথচ দুর্বোধ্য। উদাহরণত "বিশ্বপরিচয়" উল্লেখযোগ্য ; এবং অর্ধশিক্ষিতদের উদ্দেশে লিখিত সেই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের ভাষা যতই স্বচ্ছ হোক, তাতে যুক্তির অভাব উপমাকে স্বাধিকারপ্রমত্ত ক'রে তুলে, অর্থের সর্বনাশ সেধেছে।

আসলে যুক্তির বিস্তার বাংলার স্বভাব-বিরুদ্ধ ; এবং নিরুক্তির নির্বন্ধেও একাধিক ভাবের অনুবন্ধ বাঙালীর পক্ষে এতই কষ্টসাধ্য যে তার লেখায়

শাখাসংবলিত বাক্য নাতিসুলভ। তৎসত্ত্বেও বঙ্গভাষা সাধারণ্যের পরিপন্থী ; এবং গুণবাচক শব্দের জন্যে আমরা তো সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী বটেই, এমনকি আধুনিক সংসারের অনেক স্থূল ব্যাপারও বাংলা ভাষার অতীত। ফলত ইংরাজীর সংমিশ্রণ ব্যতীত শিক্ষিত বাঙালীর আলাপ-আলোচনা অচল ; এবং ভাষাসঙ্কর রসসৃষ্টির অন্তরায় ব'লে, সে প্রায়ই সোজা কথাকে ঘুরিয়ে লেখে। এই তির্যক প্রকাশভঙ্গির আবিষ্কর্তাও রবীন্দ্রনাথ ; এবং পরিণত বয়সের নাট্যগ্রন্থে সুদ্ধ তিনি যেহেতু এই রীতির প্রয়োগ করেছিলেন, তাই সে-সকল রচনা কেমন যেন অবাস্তব ঠেকে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটকমাত্রেই হয় ঐতিহাসিক, নয় রূপক ; এবং তাঁর উপন্যাস-গল্পের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা ঘটনাবর্তের ফেনপুঞ্জ নয়, অভিজাত আদর্শের নির্বিকার প্রতীক। কিন্তু আমার মতে তাদের আচার-ব্যবহার বা আশা-আকাঙ্ক্ষা ততটা অবিশ্বাস্য নয়, যতটা অভাবনীয় তাদের কথোপকথন ; এবং যে-ভাষায় তাদের আদান-প্রদান চলে, তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে কেউ কোনও দিন শুনেছে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ তিনি কখনও মানেননি যে সাহিত্য জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি ; এবং তিনি যদিও জানতেন যে দিনগত পাপক্ষয় প্রাণধারণের অনন্য উপায়, তবু তাঁর বিশ্ববীক্ষায় কুৎসিত অনাবশ্যক—তার প্রাদুর্ভাব যেমন সুন্দরের অভাবে, তেমনই তার অভাবে সুন্দরের প্রাদুর্ভাব।

আজকালকার পদার্থবিজ্ঞানীরা যাই ভাবুন না কেন, অন্তত মনোজগৎ কার্য-কারণের অধীন ; এবং রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অতিমানুষিক প্রাকাম্যের পূজারী ছিলেন, তাই লৌকিক ভাষার আবেদন তাঁর কাছে পৌঁছেছিল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মারফতে। কারণ প্রামথিক সাহিত্যে নৈমিত্তিক নিত্যের অগ্রগণ্য ; এবং সেই জন্যে প্রয়োজনমতো ইংরাজী শব্দের আহরণে প্রমথনাথ অপেক্ষাকৃত অকুণ্ঠিত। তাহলেও তাঁর প্রতিভা রুচিপ্রধান, তথা ঐতিহ্যপ্রভব ; এবং এই দিক থেকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্বকৃত তুলনা অত্যন্ত সার্থক। অর্থাৎ বীরবলী লেখায় অধীত বিদ্যার সদ্ব্যবহার দেখে দুর্মুখেরা যখন রটান যে সে-অপূর্ব রচনারীতি বিজাতীয়, তখন তাঁরা ভুলে যান যে ভারতচন্দ্রও সাবেকী ভাষাকে সাময়িক সংস্কৃতির সমানুপাতিক

ক'রে তুলেছিলেন যাবনিক শব্দ-সমষ্টির সাহায্যে ; এবং চৌধুরী মহাশয় শ্রমলাঘবের লোভেই কচিৎ-কদাচিৎ বিদেশী বাক্যের শরণ নেন বটে, তবু বাংলার বাচনিক পদ্ধতিতে যে-বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব, তার প্রতি সাধারণত তিনি বিমুখ। সুতরাং তাঁর প্রসাদগুণ বিকলনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ; এবং বাঙালীর কান বাদী-বিবাদীর ঐকতানে অনভ্যস্ত ব'লে, তিনি সাধ্যপক্ষে অনেকান্ত ভাবনা এড়িয়ে চলেন। ফলে তাঁর উক্তি সর্বদাই ক্ষুরধার, কিন্তু সর্বত্র সুসম্বদ্ধ নয় ; এবং যাঁরা তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ, যেমন শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তাঁদের চিন্তাধারায় অবিচ্ছেদের অভাব যেন আরও পরিষ্কার, যদিও দুরূহকে তাঁরা মোটেই ভয় পান না।

পক্ষান্তরে নিছক বর্ণনায় ধূর্জটিপ্রসাদ প্রায় অদ্বিতীয় ; এবং তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে কথোপকথন তো আশ্চর্য রকমের স্বাভাবিক বটেই, এমনকি তাঁর জ্ঞানগম্ভীর প্রবন্ধাদি যদি না প'ড়ে, শোনা যায়, তাহলে অর্থগ্রহণের বাধা অনেকাংশে ঘোচে। অর্থাৎ তাঁর আলোচনা আলাপের মতোই স্বচ্ছন্দ ; এবং তর্কের অকাট্য জালে প্রতিবাদীর বুদ্ধিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে তিনি স্বমতপ্রতিপাদনের প্রয়াস পান না, আভাসে-ইঙ্গিতে সহৃদয় শ্রোতার ভাবানুষঙ্গ জাগিয়েই তিনি ছুটি নেন। মুশ্‌কিল এই যে বিদ্যায় ও ব্যুৎপত্তিতে তাঁর সমকক্ষ খুব বেশী নেই ; এবং সেই জন্যে তিনি যে-সংক্ষিপ্ত পথে সাক্ষ্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌছান, সেখানে অনুগামীর সংখ্যা স্বতই অল্প। তৎসত্ত্বেও বঙ্গোত্তর পৃথিবী যে বাংলা ভাষার অধিকার-বহির্ভূত নয়, তার প্রমাণ ধূর্জটিপ্রসাদের গ্রন্থাবলী ; এবং সেই বিস্তৃত জগতের দ্বার আপামর বাঙালীর সামনে খুলে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। উপরন্তু অন্নদাশঙ্কর দেখিয়েছেন যে সারল্য আর তারল্যের মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ ; এবং কথ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হলেও, তাঁর বক্তব্য সাধারণত অনবকাশ ও সর্বতোমুখ। অবশ্য তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নন ; এবং মানুষমাত্রেই যেহেতু সীমাবদ্ধ, তাই তিনিও অনেক বিষয়ে নিরুৎসুক। কিন্তু তাঁর রচনা বিশেষ ভাবে রসঘন ; এবং প্রাকৃত বাংলা প্রাঞ্জল ব'লেই, তাঁর লেখা বিশদ নয়, তাঁর স্বচ্ছ অভিব্যক্তি স্পষ্ট অনুভূতির আধার।

অর্থাৎ প্রসাদগুণের উৎপত্তি অনাবিল উপলব্ধিতে ; এবং আত্মোপলব্ধিও

যখন সোহংবাদে সমাপ্ত, তখন লেখকের ব্যক্তিস্বরূপ তন্ময় রীতিতেই প্রকাশ্য। উপরন্তু ভারতীয় সমাজের অসংহতি সম্প্রতি চরমে পৌঁছেছে; এবং এখানে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে আমাদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম আজ পর্যন্ত অনারব্ধ। এমনকি মধ্যবিত্তেরও পুরুষানুক্রমিক সচ্ছলতার বালাই নেই; এবং সন্ততির অভাবে সংস্কার নিরর্থক। সুতরাং এ-যুগের সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য সাহিত্যও মন্ময় নয়; এবং যাঁর চিৎপ্রকর্ষ যত অসামান্য, তিনি যদি ততোধিক নৈর্ব্যক্তিক হতে না পারেন, তবে তাঁর আত্মপ্রকাশের আশা বিড়ম্বনা। পক্ষান্তরে অহংকারবিস্মৃতির অনন্য উপায় বিনা প্রশ্নে অবগতির আজ্ঞা-পালন; এবং অবগতি যেহেতু ঐকান্তিক, তাই তার বিজ্ঞাপন ন্যায়ত অসম্ভব। সৌভগ্যবশত অনুব্যবসায়ীই কায়মনোবাক্যে হেতুবাদী; এবং সেই জন্যে স্বগত অভিজ্ঞতার মর্ম অনুদ্‌ঘাটিত রেখে, তিনি দর্শকের দৃষ্টিগোচরে আনেন অভিজ্ঞান। ফলে উভয়ের পার্থক্য ঘোচে না বটে, কিন্তু মতিগতির সাদৃশ্য হয়তো বা বাড়ে; এবং বহিরাশ্রয়ী শিল্পীদের এ-বিশ্বাস যে অমূলক নয়, তার সাক্ষ্য শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর বিবর্ধমান পাঠকমণ্ডলী। কারণ তাঁর মনীষাও অসাধারণ; এবং তিনি সহজাত প্রতিভায় সন্তুষ্ট নন, চৈতন্যের ব্যাপ্তি-কামনায় নানা বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। তথাচ তাঁর লেখা স্বানুরক্তির প্রচারপত্র নয়, সমাজের যে-স্তর শিক্ষিত বাঙালীর অবলম্ব, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র; এবং বুদ্ধদেবের উচ্ছ্রিতি সেখানে বদ্ধমূল ব'লে, তার পরিচয়ে আমরা তাঁকেই পাই।

বুদ্ধদেব বসুর মতো সাবলীল লেখক এ-দেশে বেশী জন্মায়নি; এবং নির্বিকার স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে তাঁর নিরন্তর পরিণতি আপাতত চোখে পড়ে না। আসলে তাঁর বর্তমান বস্তুনিষ্ঠা সজ্ঞান সাধনার ফল; এবং সারস্বত জীবনের প্রারম্ভে তিনিও বিবিক্তি খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। কারণ তাঁর আবাল্যপ্রখর দৃক্‌শক্তি তাঁকে কৈশোরেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে উত্তররৈবিক কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে সূর্যাবর্তের আবহ স্বাস্থ্যকর নয়; এবং তিনি যেহেতু তখনও জানতেন যে রীতির বৈশিষ্ট্য আর বিষয়ের বৈচিত্র্য অন্যোন্যনির্ভর, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাতে চেয়েছিলেন অভিনব প্রসঙ্গের সাহায্যে। কিন্তু প্রস্তাব যতই অপূর্ব হোক না কেন,

তাতে যদি সত্যের অপলাপ ঘটে, তবে সাহিত্যে তার স্থান নেই ; এবং এ-কথা আজ তিনি সর্বান্তঃকরণে মানেন ব'লেই, বুদ্ধদেব বসু প্রসাদগুণের প্রতিভূকল্প। অর্থাৎ সত্য নির্বিরোধী : তাকে স্বীকার করলে, চৈতন্যের গ্রন্থিমোচন এক রকম অনিবার্য ; এবং আত্মবিজ্ঞাপনব্যতিরেকে, বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব-নির্বিশেষে, হিতোপদেশের লোভে না ম'জে, প্রত্যয়প্রতিপাদনে বিরত থেকে, অভিজ্ঞতার অবিকল অভিব্যক্তি কী উপায়ে সম্পাদ্য, তার সন্ধান মেলে বুদ্ধদেবের গল্পে ও প্রবন্ধে। অবশ্য তাঁর কৃতিত্ব অন্য জাতির রচনাতেও অবিসংবাদিত ; এবং কবি হিসাবে তিনি তো প্রথম শ্রেণীর বটেই, এমনকি তাঁর উপন্যাস, নাটক ও ভ্রমণকাহিনীর প্রশংসায় অনেকে শতমুখ। তবু আমার বিবেচনায় তাঁর প্রধান সম্পদ বিশুদ্ধ অনুভূতি ; এবং সেই লিরিক্ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বাহন ছোট গল্প ও গীতিকবিতা।

তার মানে এ নয় যে বুদ্ধদেব বসু চরিত্রবিশ্লেষণে অপারগ, অথবা শিল্পগত শৃঙ্খলায় অনভ্যস্ত। বরঞ্চ উল্টোটাই সত্য ; এবং মনস্তত্ত্বের ঘটনামূলক পটভূমি তিনি অনায়াসে গ'ড়ে তোলেন। তাহলেও মানবহৃদয়ের রহস্য-সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল অপেক্ষাকৃত কম ; এবং সেই জন্যে উপন্যাসের পরিণামী প্রসারে তিনি কালে-ভদ্রে গন্তব্য হারান। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি ব্যাপক : তিনি তফাৎ থেকে দেখেন ব'লেই, সমস্ত অবস্থাটা একত্রে তাঁর চোখে পড়ে ; এবং তিনি মানুষ চেনেন বোধির সাহায্যে : পর্দার পর পর্দা সরিয়ে তাঁকে ব্যক্তির অন্তরাত্মায় পৌছাতে হয় না। সুতরাং তাঁর লেখা অবসাদহীন ; ঘনিষ্ঠতাজাত বিতৃষ্ণা তাঁর করুণাকে ব্যাহত করে না ; এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য এত নিবিড় যে ঐকান্তিক অভিনিবেশ কাটাতে তিনি ইচ্ছাশক্তি বা কর্তব্যজ্ঞানের অপেক্ষা রাখেন না, প্রতিবেশের অণুতম পরিবর্তনে তাঁর মন বদলায়। ফলে অস্বাভাবিক তাঁর চক্ষুশূল ; এবং তাঁর রচনাবলীতে বর্তমানের অনেক সমস্যা যদিও উপস্থিত, তবু আধুনিক সমাজের ব্যাধি ও বিকার তাঁর অনুকম্পায় বঞ্চিত। উপরন্তু তাঁর সহজ বিচারে পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন বাঙালী যেমন হাস্যকর, বাংলার প্রগতিবিলাসীরা তেমনই অপ্রকৃতিস্থ ; এবং তথাচ তিনি সমাজ-শুদ্ধির প্রয়োজন বোঝেন বটে, কিন্তু তিনি যেহেতু জানেন যে প্রস্তুতি নয়,

বিপ্লবের উপলব্ধিই কবির ধর্ম, তাই ওজস্বিনী বক্তৃতার ভার প্রচারকদের উপরে ছেড়ে দিয়ে তিনি নিযুক্ত থাকেন বাস্তবের ধ্যানে।

এ-দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের সগোত্র ; এবং আভিজাতিক শুচিবায়ুর বিরুদ্ধে কৈশোরিক বিদ্রোহ সত্ত্বেও তিনি আজীবন কলাকৈবল্যের সাধক। অর্থাৎ সুনীতির মুখাপেক্ষা শিল্পের স্বভাব নষ্ট করে ব'লেই, সাহিত্যবিচারে তিনি ইষ্টানিষ্টের পার্থক্য মানতেন না ; এবং এই সমভাবের ফলে যেমন একদা তাঁর দুর্নাম রটেছিল, তেমনই তদানীন্তন রুচিরক্ষকদের মধ্যে মতভেদ ছিল না যে "চোখের বালি" ও "চিত্রাঙ্গদা" অশ্লীল। অবশ্য ইতিহাস এমনই পরিহাসরসিক যে পর জাবনে অনাচারী কবিদের প্রতি কটূক্তিপ্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের বিবেকে বাধেনি ; এবং রচনাকালে তাঁর যে-সব গান জিতেন্দ্রিয়দের কানে কামনিবেদনের মতো শোনাত, সেগুলির অধিকাংশই আজ ধর্মসঙ্গীতের তালিকা-ভুক্ত। কিন্তু ক্রমবিকাশে বিষয়াসক্তির বিলোপ না ঘটলে, পরিণত বয়সেও শ্রেয়োবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞানের সমীকরণ তাঁর সাধ্যে কুলাত কিনা সন্দেহ ; এবং বুদ্ধদেব বসু যদিচ এখনও পর্যন্ত লোক-ব্যবহার মেনে নিতে অসম্মত, তবু তিনি সম্প্রতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছেড়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যে পৌঁছেছেন। আজকাল এই নিসর্গনিষ্ঠাই তাঁর চিত্তকে সর্বদা নির্মল রাখে ; এবং সেই জন্যে শুদ্ধ চৈতন্যের অবর্তমানেও তাঁর লেখা রবীন্দ্ররচনাবলীর মতো আনন্দঘন। আসলে তাঁদের প্রতিভায় যতই তফাৎ থাক না কেন, তাঁদের প্রকৃতি এক রকমের ; এবং এই জাতিগত সাদৃশ্যকে যাঁরা অনুকরণের পর্যায়ে ফেলতে চান, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক্ কবিদের বংশভুক্ত হয়েও রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের বৈশিষ্ট্য হারাননি, তখন অনুরূপ অধিকার বুদ্ধদেবেরও প্রাপ্য ; এবং বুদ্ধদেব যেহেতু রোমাণ্টিক্ সম্প্রদায়েরই অন্তর্বর্তী, তাই শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, আরও অনেক পূর্বসূরীর প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছে।

রোমাণ্টিক্-শব্দের অভিধা অদ্যাবধি অনিশ্চিত ; এবং পল্লবগ্রাহীদের ভাষায় বিশেষণটা তার সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যে-ব্যক্তি অনশনে দিবাস্বপ্ন দেখে, অথবা খামখা খেয়ালে ধ্রুপদের তাল ভেঙে দেয়। কিন্তু অন্তর্দর্শী জানেন যে ক্লাসিক্ যুগেও প্রথাবিমুখ লেখক দুর্লভ নয় ; এবং উদাহরণত য়ুরিপিডিস্-

এর নাম তো উল্লেখযোগ্য বটেই, এমনকি ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক সফোক্লিস্-এর মধ্যেও বিবাদী মনোভাবের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সে যাই হোক, মধ্য যুগের রোমন্থজীবী য়ুরোপে গ্রীসের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ফিরিয়ে এনেছিলেন রোমাণ্টিক্-এরা ; এবং তাঁদের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে পরবর্তী পুরাবিদেরা যদিও ক্লাসিক্-উপাধির আরোপ করেছিলেন নিজেদের উপরে, তবু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রীক্ সংস্কৃতির প্রসার বাড়েনি, রোমক সভ্যতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। মনুষ্যধর্মের উজ্জীবন পুনশ্চ উনিশ শতকে ; এবং এই কালের আরম্ভ যেমন প্লেটো-ঈস্কিলাস্-এর অনুবাদে, এর সমাপ্তি তেমনই বস্তুতন্ত্রী সাহিত্যে। অতএব বুদ্ধদেব বসুও একাধারে রোমাণ্টিক্ তথা বহিরাশ্রয়ী ; এবং যেকালে ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্ তাঁর গোষ্ঠীপতি, তখন প্রাঞ্জলতা তাঁর কুললক্ষণ। অবশ্য এ-দেশেও উক্ত উত্তরাধিকার তাঁর একচেটিয়া নয় ; এবং স্বজাতিদের মধ্যে অনেকেই সাফল্যে ও সম্ভাবনায় তাঁর সমকক্ষ। তৎসত্ত্বেও প্রসাদগুণের সংজ্ঞা-নিরূপণে তাঁকেই প্রতিমান-রূপে ব্যবহার করলুম এই কারণে যে তিনি আমার বিপরীত ; এবং সেই জন্যে আমার ভিতরে যে-ঐশ্বর্যের নিতান্ত অভাব, তাতে তিনি স্বায়ত্ত সমৃদ্ধ।

বলাই বাহুল্য যে বাঙালী লেখকদের তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় ; এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে এখানে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই স্বনামধন্য, কেউ কেউ বা প্রাতঃস্মরণীয়। অতএব বুদ্ধদেবের সঙ্গদোষে তাঁদের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না ; এবং তাঁদের সংসর্গে তাঁর গৌরব বাড়বে। উপরন্তু এ-সন্নিপাত আপতিক, আবশ্যিক নয় ; এবং আমার আত্ম-জিজ্ঞাসা যদিও তাঁদের উত্তর-সাপেক্ষ, তবু তাঁরা পরস্পরের প্রতিযোগী বা সহযোগী নন, স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ তাঁরা আমার নিন্দা-স্তুতির অতীত ; এবং বুদ্ধদেবও যেকালে তাঁদেরই এক জন, তখন তাঁর কীর্তি তাঁরই নিকষে বিচার্য। অন্ততঃপক্ষে আমি জানি যে তাঁর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা অনির্বচনীয় ; এবং আমার লেখায় তাঁর পরিচয় খুঁজলে, সন্ধানীর নৈরাশ্য অনিবার্য। কারণ আমার মন অন্তর্মুখী ও দৃষ্টি বিকল ; এবং অভিলাষ সত্ত্বেও বহির্জগতের ব্যূহভেদ আমার সাধ্যে কুলায় না। সম্ভবত সেই জন্যে বুদ্ধদেব

বসুর বিষয়াশ্রিত প্রতিভা আমাকে এতখানি টানে ; এবং তাঁর একাধিক ত্রুটি—যথা উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন, গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জনে ঔদাস্য, অথবা ইংরাজী বাচনিক পদ্ধতির হুবহু অনুবাদ—আমাকে যেমন পীড়া দেয়, তেমনই বিস্ময় জাগায় তাঁর অবাধ, অনায়াস ও সমান্তরাল ভাবনা-বেদনা।

প্রকৃত পক্ষে আদর্শ ও আজীব্যের অদ্বৈতই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকে ছিদ্রান্বেষীর কটাক্ষ থেকে বাঁচিয়ে রাখে ; এবং উক্ত সঙ্কলন সেখানেই থামে না, নির্বিকল্প সমাধির মতো বিবর্তের অবরোহ অস্বীকার ক'রে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি ও বিশ্বের, জড় ও চেতনের, মর্ত্য ও স্বর্গের নির্দ্বন্দ্ব ঘটায়। অবশ্য এই মরমী মহামিলন যুক্তির ধার ধারে না ; এবং তাই বৈনাশিক বুদ্ধি এর বিরুদ্ধে আবহমান কাল খড়্গহস্ত। কিন্তু যেই ভাবতে বসি, অমনই দেখি যে এর সঙ্গে বস্তুবাদের অসঙ্গতি নেই ; এবং যে-সূত্রের নির্দেশে সত্তাশাস্ত্র ভগবানের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে নিশ্চিত, তার বিপরীত তর্কে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যিক স্থায়িত্ব নিঃসন্দেহ হোক বা না হোক, আমার বিবেচনায় বিশ্বনিন্দুক ছাড়া আর কেউ না মেনে পারবে না যে অনুলিখিত কবিতা একাধারে আত্মোপলব্ধিতে সার্থক ও ভূমানন্দে ভাস্বর :

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকের অম্লান ক্ষমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সঙ্গম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

[১৯৪৬]

শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী ; এবং জনশ্রুতি সত্য হলেও, আশ্চর্যজনক নয়। কারণ ইচ্ছানিদ্রাও সাধনাসাপেক্ষ ; এবং মধ্যম শ্রেণীর রুদ্ধশ্বাস লোকারণ্যে প্রভাতী নিদ্রার জন্যে যতখানি অভ্যাস দরকার, তার পক্ষে চল্লিশ বৎসর তো নিমেষমাত্র বটেই, এমনকি ইতিমধ্যে রূপকথার সাহায্যে দিবাস্বপ্ন দেখাও সেই শিক্ষানবিসির অঙ্গ। কিন্তু মেয়েদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র : সকল গৃহস্থ অবগত আছেন যে শাশুড়ীর পদে না পৌঁছানো পর্যন্ত স্ত্রী-জাতির চিত্তশুদ্ধি দুর্ঘট ; এবং অগ্নিপরীক্ষাই যেহেতু সংস্কৃতির সনাতন উপায়, তাই গল্প-গুজব-নামক পরচর্চার গুরুতর দায়িত্ব ধুরন্ধরীদের উপরে ছেড়ে দিয়ে বাঙালী বধূ সেই পরাকাষ্ঠার দিকে এগোয় পাকপ্রণালীর প্রজ্বলিত পথে। যাক সে-কথা, এতে সন্দেহ নেই যে নভেল আমাদের অবসর-বিনোদনের সাথী ; এবং সেই জন্যে তার অবস্থা বাংলা কাব্যের চেয়েও শোচনীয়, প্রায় বাংলা প্রবন্ধের মতোই সঙ্গীন। আসলে অর্থবিজ্ঞানের টান-যোগান শিল্পরাজ্যেও অকাট্য ; এবং স্বয়ং ভগবান যখন নিরুদ্দিষ্ট আত্মপ্রকাশে অপারগ বা অসম্মত, তখন নিরপেক্ষ মৌলিকতা বাংলা উপন্যাসে নিশ্চয়ই দুর্লভ।

অবশ্য লেখক-পাঠক, কোনও পক্ষ, ও-নিয়মের অস্তিত্ব মুখে মানেন না ; এবং বাঙালীর স্বভাব এমনই গতানুগতিক, তার কৌতূহল থাকলেও, দৃক্‌শক্তিতে সে এত দরিদ্র যে উক্ত স্বকীয়তার অভাব সে ঢাকে তার স্বল্পাঙ্গ সমাজব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে। কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রা অন্য দেশেও বৈচিত্র্যহীন ; আষ্টপ্রহরিক সংসারে রোমাঞ্চ চির দিনই বিরল ;

এবং অমানুষ বা অতিমানুষ কাল্পনিক জীব। উপরন্তু আধুনিক কালে য়ুরোপীয় ঘটনাপ্রবাহ যদিও অপেক্ষাকৃত দ্রুত, তবু প্রাচ্য মানুষের মন পাশ্চাত্যের মতোই জটিল ; এবং এ-দেশে টল্‌স্টয়্‌-এর জন্ম অভাবনীয় বটে, কিন্তু ডস্টয়েভ্‌স্কি-র অভ্যুদয়ে তিলমাত্র বাধা নেই। তবে সাহিত্য আমাদের কাছে অনুশীলনের সামগ্রী নয় : আমাদের মধ্যে যাঁরা গম্ভীর প্রকৃতির, তাঁদের চিত্তবৃত্তি ধর্মানুরক্ত ; এবং অন্যেরা উপজীবিকার অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং হয় চিরাচরিত অধ্যাত্ম চিন্তা, নয় অনায়াস আমোদ-প্রমোদ, এ ছাড়া অপর কিছুতে মেধার অপব্যয় আমাদের মতে অনভিপ্রেত ; এবং সেই জন্যে বাংলা দেশে যেমন মনীষীর সংখ্যা অগণ্য, তেমনই মননশীল সাহিত্যের—বিশেষত মননশীল কথাসাহিত্যের—অনটন অসম্ভব রকমের বেশী।

সৌভাগ্যক্রমে খ্যাতি আর শ্রেয়োবোধের তুলাদণ্ড প্রায়ই আলাদা ; এবং যে-বই লিখে নির্বিচার পাঠকের সাধুবাদ মেলে, তাতে সাধারণত সাহিত্যিক বিবেকের আশ মেটে না। সেই জন্যে পশ্চিমের অধিকাংশ সাহিত্যসেবী তাঁদের স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচারকে দেখেন ভয়ের চক্ষে ; এবং তাঁরা প্রাণপাত ক'রে যে-শিল্পসামগ্রীর জন্ম দিয়েছেন, তার উপভোগও সমান আয়াসসাধ্য হোক, এইটাই তাঁদের স্বাভাবিক ইচ্ছা। অতএব তাঁদের লুব্ধ দৃষ্টি সহজেই অষ্টাদশ শতকের দিকে ছোটে, যখন অধিকাংশ মানুষ পাঠশালার ধার ধারত না বটে, কিন্তু যারা পড়তে জানত, তারা অধ্যয়নকে স্বার্থসিদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্র অথবা অনিদ্রানিবারণের মহৌষধ ব'লে ভাবত না। অবশ্য সেই চিৎপ্রকর্ষ যে-আভিজাত্যিক অধিকারভেদ ও নিরীহনিগ্রহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তার পুনরুজ্জীবনে এ-কালের আপত্তি আছে অথবা কিছু দিন আগে পর্যন্ত ছিল। তাহলেও গড্ডলিকাস্রোতে আত্মবিসর্জন কোনও আধুনিক লেখকের মনঃপূত নয় ; এবং তাঁরা বরং নির্বাসনে যাবেন, তবু ভারতীর সভায় অনধিকার প্রবেশের অবকাশ রাখবেন না, এই তাঁদের দৃঢ় সঙ্কল্প।

ফলত সাম্প্রতিক সাহিত্যের অনেকখানি ব্যাসকূট ; এবং বাকীটা শ্লেষ আর দুরুক্তি, যার উদ্দেশ্য নির্বোধের দুঃসাহসকে আটকানো। প্রাণিজগতে

তার উপমা খুঁজলে, আপনা থেকে মনে আসে সজারু আর শামুকের কথা, অথবা সেই প্রাক্‌পৌরাণিক কৃকলাস-জাতির, যারা বৈশিষ্ট্যের মোহে স্বভাববিচ্যুত হয়ে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপারটা এখনও এত দূর গড়ায়নি। এই অদ্বৈতবাদের দেশে জ'ন্মেও আমাদের সুমনা সাহিত্যিকেরা কখনও ভোলেননি যে শিল্প একটা বিনিময়ক্রিয়া; এবং ললিত কলার কল্পলোকে স্রষ্টার আসন যদিও সর্বোচ্চে, তবু দ্রষ্টার স্থান তার নাতিনিম্নে। কিন্তু জাতিগত সংস্কার শিশু-শিক্ষার চেয়ে দুর্বল; এবং আমাদের আধুনিক ভাবুকেরা যেহেতু পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়াতেই মানুষ, তাই তাঁরা সকলেই পূর্বোক্ত অসামান্যতার ভক্ত। অবশ্য মাইকেলের সময়েও বিদেশী আদর্শই বাঙালী কবিদের অন্তঃপ্রেরণা যোগাত। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে মামুলী মানুষের অবসর-সঙ্কোচ সে-যুগে চরমে গিয়ে ঠেকেনি ব'লে, তখনও প্রত্যাখ্যান সৎসাহিত্যের ধাতে বসেনি; কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, পরিগ্রহণই ছিল ভাবরাজ্যের মৌল বিধান।

তাই মাইকেলের অনুস্বর-বিসর্গবর্জিত সংস্কৃত একখানা যে-কোনও অভিধানের সাহায্যেই আপামর সাধারণের বোধগম্য; অথচ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিতান্ত চলতি বাংলা বহুভাষাবিদ্ পাঠকের অপেক্ষা তো রাখেই, এমনকি একাধিক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হলে, বীরবলী সাহিত্যের গূঢ় তাৎপর্য অনাস্বাদিত থেকে যায়। তার মানে এ নয় যে চৌধুরী মহাশয় হরিজন আন্দোলনের বিরুদ্ধে, তার মানে শুধু এই যে প্রমথনাথ অর্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারেন। তাঁর আজীবন অধ্যয়ন নামের পরে কতকগুলো নিরর্থ অক্ষরের বহর বাড়িয়েই থামেনি, পাণ্ডিত্য তাঁর সকারী ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রতাকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছে। কাজেই তাঁর রচনা স্বভাবত সমধর্মীর মুখ চায়; এবং তাঁর প্রতিভা ও সৌভাগ্য যেহেতু অল্প বাঙালীর ক্ষেত্রে জোটে, তাই সমসাময়িকদের কাছে তিনি যে-শ্রদ্ধাঞ্জলি পেলেন না, তা হয়তো নিরবধি কালই তাঁকে দেবে। কিন্তু তিনি যদিও পাঠকের দরদে বঞ্চিত, তবু এখনকার লেখকমাত্রেই বোধহয় তাঁর অনুকম্পায়ী; এবং ধূর্জটিপ্রসাদ-প্রমুখ যাঁদের সাহিত্যজীবন তাঁরই সংস্পর্শে

বিকম্পিত, তাঁদের মনোভাবে বীরবলী ব্যক্তিবাদের প্রকোপ অন্তত আমার চোখে সুস্পষ্ট।

উপরে যা বললুম, তার সাক্ষ্যে ধূর্জটিপ্রসাদের বিপক্ষে চিন্তাচৌর্যের অভিযোগ-খ্যাপন আমার অভিপ্রায় নয়। বরঞ্চ তাঁর অত্যধিক স্বাবলম্বনেই আমি ধাক্কা খাই; এবং আমার মতে তাঁর স্বাধীন ধ্যান-ধারণা সর্ববাদিসম্মত যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না, তিনি সাধারণত ভাব থেকে ভাবান্তরে যান স্বকীয় অনুষঙ্গের পথে। ফলে তাঁর প্রবন্ধাদির সিদ্ধান্তে আমি অনেক সময়ে অগত্যা সায় দিই বটে, কিন্তু যে-প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায়, সেখানে প্রায়ই আমার পা পেছলায়। অর্থাৎ সাহিত্যে আমি নৈরাত্ম্যরীতির পক্ষপাতী; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আমার অনাস্থা এত গভীর যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জ্ঞাপনের ব্যর্থ চেষ্টায় আমার কোনও উৎসাহ নেই; এবং অনুষঙ্গ যেহেতু প্রাতিস্বিক উপলব্ধির ধ্বংসাবশেষ, তাই তার সংসর্গ আমাকে স্বপ্নাবিষ্টই করে, নিঃসংশয় সত্যের সাক্ষাতে আনে না। সেই জন্যে আমার বিবেচনায় এই নৈপথ্যপ্রকরণ সন্দর্ভে অচল, তার প্রয়োগ প্রশস্ত শুধু রসরচনাতে।

কারণ রস সম্ভোগের সামগ্রী: তার স্বরূপ-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হয়তো অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তার সংঘাতে অবিচল থাকা রসিকের পক্ষে দুষ্কর; এবং কাব্যাদি সাহিত্য যেকালে পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধনেই সন্তুষ্ট, তখন আত্মরতিতে কবিতার তেমন ক্ষতি হয় না, যেমন হয় সত্যসন্ধানী প্রবন্ধের। অবশ্য সত্যও বিসংবাদের আশ্রয়; তার চতুর্দিকে তার্কিকের এমন ভিড় যে অনেকের বিচারে কৈবল্য লোকযাত্রার লক্ষ্যই নয়, মনুষ্য-সংসার হিতবাদী। তাহলেও সত্যের রাজ্যে আমি স্বপ্রাধান্যের প্রয়োজন দেখি না। হয়তো আমার মনের গঠন প্রাগৈতিহাসিক ব'লে, আমি এখনও ন্যায়শাস্ত্রের উপরে বিশ্বাস রাখি; অন্তত তার নঙর্থক নির্দেশে যে অসত্যকে চেনা যায়, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আসলে স্বতোবিরোধের অনুভূতি দেহীর পক্ষে অসম্ভব; এবং আমরা সকলেই যেহেতু দেহী, তাই অন্বীক্ষার এই প্রাথমিক নিয়মটি আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অমোঘ। সুতরাং আকাশের প্রকৃত বর্ণ-সম্বন্ধে যতই বাদানুবাদ বাধুক না কেন,

আকাশ যে একই সময়ে নীল আর অনীল নয়, এ-প্রসঙ্গে আবালবৃদ্ধবনিতা একমত।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজতাত্ত্বিক; এবং সেই জন্যে অপবাদ-ন্যায়ের নেতি-বচনে তাঁর মন গলে না, তিনি এমন নির্বিকল্প সত্য খোঁজেন যার শাসনে সমাজের বর্তমান নৈরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আসবে। অথচ ব্যাবহারিক-উপাধি সর্বাগ্রে সামাজিক সত্যেরই প্রাপ্য; এবং আচার আর আসক্তি যেহেতু হরিহরাত্মা, তাই এ-বিষয়ে মতান্তর সহজেই মনান্তরে গিয়ে ঠেকে। কেননা এ-ক্ষেত্রে সত্য আর নিজ গুণে মর্যাদাবান নয়, অভিজ্ঞের অধ্যাসও তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার জন্ম হয়তো দেহাতে; হোলির দিন-পনেরো আগে থেকে বিশ-পঁচিশ জন গ্রামভাইয়ের সঙ্গে ভাঙের নেশায় মেতে, খোল-খত্তাল নিয়ে চীৎকার না করলে, আমি হয়তো আনন্দ পাই না। কিন্তু তাতে সঙ্গীতজ্ঞ প্রতিবেশীর কান ফাটবার উপক্রম হয়; তারা তখন লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে। তবে ন্যায়বিচারে উভয় পক্ষই এখানে সমবল; এবং আমার আমোদ-আহ্লাদের অধিকার যেমন নিঃসন্দেহ, তাদের বিরক্তির কারণও তেমনই তর্কাতীত। কাজেই বিবাদ বাধবামাত্র, তুলা-মূল্যের কথা ওঠে; এবং পাড়াপড়শীরা বলেন যে তাঁদের চিৎপ্রকর্ষের ওজন যখন বেশী, সেকালে আমাদের দলে-ভারী মাৎলামি তাঁদের চোখ-রাঙানিকে মানতে বাধ্য।

এ-কলহে ধূর্জটিপ্রসাদ সেই অল্পসংখ্যক দলেই যোগ দেন; এবং তাঁর উচ্চতর শিক্ষা-দীক্ষার জোরে তিনি পাঠোদ্ধারসহকারে অনায়াসেই দেখান যে অধিকাংশ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাধক আমাদের মতো ইতর সাধারণকে তফাতে রেখে তাঁদের মতো উত্তম বিশেষকে ভজেছেন। কিন্তু স্বপক্ষে তিনি যতই সাক্ষী ডাকুন না কেন, তাঁরা যেহেতু প্রত্যেকে আত্মোপলব্ধির গুণগানে শতমুখ, তাই সে-সকল জবানবন্দিতে আমার আত্মপ্রত্যয়ই প্রতিষ্ঠা পায়; এবং ধূর্জটিপ্রসাদের বিনয় যে-পরিমাণে কমে, আমি ঠিক সেই অনুপাতে বুঝি যে তাঁর যুক্তিতে ফাঁক না থাকলে, তিনি কখনও প্রামাণ্য-সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চয় হতেন না। সেই জন্যে "আমরা ও তাঁহারা"-র বিজ্ঞানসম্মত মতামতেও আমি কান পাতিনি; এবং "চিন্তয়সি"-র

সুচিন্তিত তত্ত্বসমূহ আমার প্রতিবাদ জাগিয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আছে ব'লেই, জানি যে ওই বই-দুটির লেখক দাম্ভিক নন, যথার্থ মানবপ্রেমিক; এবং সারা জীবন হিতৈষণার চেষ্টায় কাটিয়ে আজ যদি তিনি আমার মঙ্গল-সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশী বোঝার দাবি করেন, তবে সে-দাবি না মানতে পারি, কিন্তু তাতে ধৈর্য হারানো নিতান্ত মূর্খতা।

আসলে ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিমান হলেও, বুদ্ধিসর্বস্ব নন; তিনি হৃদয়বান ও আশুচেতন; এবং তাই তাঁর সদ্যঃপ্রকাশিত উপন্যাসের* নায়ক খগেনবাবু শেষ পর্যন্ত আর অগাধ পাণ্ডিত্যে তুষ্ট রইলেন না, প্রজ্ঞাপারমিত সমর্পণেই আত্মদর্শনের ছেদ টানলেন। কিন্তু সমাপ্তি যদিও ভাবপ্রধান, তবু "অন্তশীলা"-য় ভাবালুতার নাম-গন্ধ নেই। জ্ঞান যে একটা কৃত্রিম প্রক্রিয়া, তার নির্দেশে যে পরমার্থের সাক্ষাৎ মেলে না, এবং বুদ্ধিই যে সর্বত্র বিরোধ বাধায়, এই বের্গসনী সিদ্ধান্তে ধূর্জটিপ্রসাদ পৌঁছেছেন বুদ্ধিরই পরামর্শে, আবেগের তাড়নে নয়। তবে বুদ্ধির স্বাধিকার একটা কিংবদন্তীমাত্র; অন্ততঃপক্ষে সব বুদ্ধিজীবীই বৈনাশিক নন; এবং মানুষের মধ্যে যেমন দেহ ও মনের দ্বিত্ব আছে, মনকে যেমন ভাব ও চিন্তায় ভাগ করা যায়, তেমনই বুদ্ধিও দ্বিমুখী—এক দিকে বিকলনে ব্যস্ত, অন্য দিকে সঙ্কলনে নিরত। ধূর্জটিপ্রসাদের বুদ্ধি এই শেষ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু সঙ্কলন ন্যায়াতিরিক্ত কর্ম। যে-সমগ্রতা ভগ্নাংশসমূহের যোগফল নয়, তা অখণ্ড ভূমার মতো অচিন্ত্য ও অনির্বচনীয়; বুদ্ধি শুধু তার দূত, তার সখা বোধি অথবা মরমী অনুভূতি। সম্ভবত সেই জন্যে এই অন্তরঙ্গ উপন্যাসে বাস্তবতার বহিরাশ্রয় নেই; প্রাতিভাসিক প্রত্যক্ষজগৎ বিচ্ছিন্ন বুদ্বুদের মতো অন্তঃশীল চৈতন্য-স্রোতের উপরে ভাসমান।

উপরন্তু চৈতন্য যেহেতু চির দিন ব্যক্তিপ্রভব এবং অনুভূতি সর্বত্র সোহংবাদী, তাই আপাতত খগেনবাবুই যদিও গল্পের নায়ক, তবু প্রকৃত পক্ষে পুস্তকখানির মুখপাত্র স্বয়ং গ্রন্থকর্তা। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের মন এমন অকপট, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এত ব্যাপক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা এ-রকম মর্মস্পর্শী যে এই আত্মচরিতও আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

* অন্তঃশীলা—শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত (বাক্)

খগেনবাবু ও তাঁর পার্শ্বচরিত্রগুলি আমাদের সকলেরই প্রতিভূ : তাঁদের মতো আজকের মানুষ বিশেষ ও সামান্য, মস্তক ও হৃদয়, প্রেম ও প্রভুত্ব ইত্যাদি উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন ; এবং এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে আমরা অনেকে তাঁদের বিপরীতগামী বটে, তথাচ নির্দ্বন্দ্ব তাঁদের ন্যায় আমাদেরও কাম্য। সেই জন্যে কথাসাহিত্য হিসাবে বইখানার একাধিক স্খলন-পতন-ত্রুটি সত্ত্বেও "অন্তঃশীলা"-কে আমি স্মরণীয় মনে করি। চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধে মতপ্রকাশের সময়ে যে-স্বকীয়তার আতিশয্যে ধূর্জটিপ্রসাদ পাঠকের সমর্থন হারান, এখানে সেই ঐকান্তিক রীতিই পুস্তকটির মূল্য বাড়িয়েছে। কারণ যে-সত্য সার্বজনীন নয়, তা যেমন অগ্রাহ্য, তেমনই সার্থক অভিজ্ঞতামাত্রেই প্রামাণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ; তার বিরুদ্ধে নাস্তিকের প্রতর্ক খাটে না ; তাকে সবিনয়ে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

এত বাগ্‌বিস্তারের অনেকখানিই হয়তো অনাবশ্যক। কিন্তু তার ফলে এ-কথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে "অন্তঃশীলা" ঠিক শিশুপাঠ্য উপন্যাস নয় ; বইখানি ভাবুকের জন্যে লেখা এবং ভাবুকের দ্বারা লিখিত। তাহলেও তার আখ্যানভাগ চমৎকার ; এবং সাধারণ কথক যেখানে এসে থামেন, সেইখানে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রস্তাবনা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই খগেনবাবুর চরম ট্র্যাজেডির উপরে যবনিকা নামে ; তাঁর আত্মঘাতিনী স্ত্রী সাবিত্রীর সৎকার শেষ ক'রে, তিনি এসে আশ্রয় নেন রমলাদেবীর বাড়িতে, যাঁর কুমন্ত্রণাই সাবিত্রীকে আত্মহত্যার পথে চালিয়েছিল। এই থেকে যে-সম্পর্কের সূত্রপাত, তারই অন্তঃপ্রেরণায় খগেনবাবুর অহংকৃত অবিদ্যা কাটে, এবং তিনি ক্রমশ বোঝেন যে সাবিত্রীর মৃত্যুতে একটা হাস্যকর নির্বন্ধাতিশয্য থাকলেও, আসলে সে-দুর্ঘটনা তাঁরই অমানুষিক আদর্শের সঙ্গে মনুষ্য-ধর্মের সাংঘাতিক সংঘাত-প্রসূত। তাঁর আদর্শনিকষে রমলাদেবীই খাঁটি সোনা আর সে নিজে রাংতা, সাবিত্রীর অবচেতনা এই সত্যটাকে অস্পষ্ট ভাবে জেনেছিল ব'লেই, তাঁদের দাম্পত্যজীবন ভিতরে ভিতরে বিষিয়ে ওঠে ; খগেনবাবুর মাসতুতো বোন, যার সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা এই দারুণ দ্বন্দ্বের প্রকাশ্য কারণ, বস্তুত সে-বেচারা উপলক্ষমাত্র—অত্যন্ত নগণ্য ও অতিশয় নিরপরাধ।

সুতরাং খগেনবাবু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, প্রথমটা রমলাদেবীর সংসর্গ থেকে পালিয়ে এবং শেষ কালে সুপ্রাচীন সাধকী পদ্ধতিতে বিঘ্নকে, বিপদকে কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়ে। ফলে তাঁর ভারসাম্যহীন, বুদ্ধিগত, বিরস জীবন হঠাৎ অধ্যাত্ম সম্পদে রসিয়ে ওঠে,—শুধু তাঁর একলার নয়, রমলাদেবী ও তাঁর পরম ভক্ত, আত্মত্যাগী সুজনেরও; এবং তাঁরা তিন জনে এই যন্ত্রঘর্ঘরিত বিংশ শতাব্দীতেই ফিরে ফিরতি বোঝেন যে বিদেহ মিলন কেবল মরমীদের অসার স্বপ্ন নয়, দেহাত্মবাদী সাম্প্রতিক মানুষও সে-অঘটনসংঘটনে সিদ্ধহস্ত। এই অদ্বৈতসিদ্ধির পরে তাঁদের সকলের সংস্কারমুক্তি মিলবে কিনা, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি। তবে আমার বিশ্বাস যে অনন্তর তাঁদের অঙ্গ থেকে সমাজবন্ধনের নাগপাশ খ'সে পড়বে, এই রকম একটা ইঙ্গিতই "অন্তঃশীলা"-র উপসংহারে বর্তমান। কিন্তু আমার সারসংগ্রহে বইখানিকে রূপকের মতো দেখাচ্ছে; এবং তাই অবিলম্বে বলা দরকার যে এ-উপন্যাসের দার্শনিক ভূমিকা যাই হোক না কেন, গল্পটি উপাদেয় ও চরিত্রগুলি জীবন্ত। তবে উপাখ্যানের সম্পূর্ণ রস পাবেন তাঁরাই, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্য যাঁদের নখদর্পণে।

কেননা কাহিনীটিতে ঘটনাবৈচিত্র্য নেই, অবস্থানপরিকল্পনা কোনও অব্যর্থ পরিণতির ধার ধারে না, একটা সুচিন্তিত প্লট্-কে সর্বাঙ্গীণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্যই নয়; তিনি চান দুটি চরিত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি দেখাতে। অর্থাৎ নভেলের সংজ্ঞা-সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ আঁদ্রে মোরোয়া-র সঙ্গে একমত; তাঁরা দু জনেই ভাবেন যে সাবেকী দৃষ্টান্তে কতকগুলো ছাঁচে-ঢালা প্রতিমার পুতুলনাচে জীবনের অনুকরণ ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, তার কর্তব্য স্বসমুখ পাত্র-পাত্রীর বিবর্তনের ছবি আঁকা; এবং এই চেষ্টায় ধূর্জটিপ্রসাদ বিশেষ সাফল্য পেয়েছেন। অবশ্য লেখকের সঙ্গে খগেনবাবুর জীবনগত সাদৃশ্য না থাক, চারিত্র্যগত ঐক্য যে খুব বেশী, তা পূর্বেই বলেছি; এবং তাই হয়তো এই চিত্রের জন্যে অতিপ্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু রমলাদেবীর মতো গতানুগতিক বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্যই বিস্ময়কর; এবং এই দিক থেকে তাকালে, বইখানিকে একেবারে

বাহুল্যবর্জিত ঠেকে: আলেখ্যের কোনও রেখা নিরুদ্দিষ্ট নয়, সকল আচরণ সার্থক; এবং চরিত্রটি যেখানে পূর্ণতায় পৌঁছেছে, সেইখানেই পুস্তকের পরিসমাপ্তি।

খগেনবাবুর ছবিও সর্বত্রই বিশ্বাস্য। ধূর্জটিপ্রসাদের পাঠাভ্যাসের প্রসাদে তিনি মাঝে মাঝে হয়তো একটু ভারাক্রান্ত; কিন্তু লেখকের অন্যান্য রচনার এই দোষটাও এখানে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তাদের সম্বন্ধে নায়কের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা কোথাও অসামঞ্জস্য আনেনি; এমনকি তত্ত্বসঙ্কুল উদ্ধারগুলোও চরিত্রচিত্রণের উপাদান যুগিয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুর মারফৎ আমাদের জানিয়েছেন যে প্রুস্ৎ, জয়েস্, ভর্জিনিয়া উল্ফ্ ইত্যাদি অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত; এবং সে-খবর না পেলেও, তাঁর আদর্শ-সম্বন্ধে আমাদের ভুল ঘটত না। তথাচ "অন্তঃশীলা" বাংলা উপন্যাস; এবং বাঙালীদের মধ্যে একা ধূর্জটিপ্রসাদই বোধহয় এই উপন্যাসপ্রণয়নে সক্ষম। আসলে অর্জিত বিদ্যায় তিনি যদিও বৈদেশিক, তবু তাঁর প্রবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বিশুদ্ধ স্বদেশী; এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ় বটে, কিন্তু তিনি যে স্বভাবতই বিশ্লেষণবুদ্ধির অনুর্বর মার্গের প্রতিকূল, তার ভূরি প্রমাণ "অন্তঃশীলা"-র প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। সেই জন্যে আধুনিক কাল তাঁর কথকালির প্রশস্তি গেয়েই থামবে; তাঁর মতো দু নৌকায় পা রেখে উভয়সঙ্কট পেরিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়।

[ ১৯৩৫ ]

সুতরাং খগেনবাবু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, প্রথমটা রমলাদেবীর সংসর্গ থেকে পালিয়ে এবং শেষ কালে সুপ্রাচীন সাধকী পদ্ধতিতে বিঘ্নকে, বিপদকে কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়ে। ফলে তাঁর ভারসাম্যহীন, বুদ্ধিগত, বিরস জীবন হঠাৎ অধ্যাত্ম সম্পদে রসিয়ে ওঠে,—শুধু তাঁর একলার নয়, রমলাদেবী ও তাঁর পরম ভক্ত, আত্মত্যাগী সুজনেরও; এবং তাঁরা তিন জনে এই যন্ত্রঘর্ঘরিত বিংশ শতাব্দীতেই ফিরে ফিরতি বোঝেন যে বিদেহ মিলন কেবল মরমীদের অসার স্বপ্ন নয়, দেহাত্মবাদী সাম্প্রতিক মানুষও সে-অঘটনসংঘটনে সিদ্ধহস্ত। এই অদ্বৈতসিদ্ধির পরে তাঁদের সকলের সংস্কারমুক্তি মিলবে কিনা, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি। তবে আমার বিশ্বাস যে অনন্তর তাঁদের অঙ্গ থেকে সমাজবন্ধনের নাগপাশ খ'সে পড়বে, এই রকম একটা ইঙ্গিতই "অন্তঃশীলা"-র উপসংহারে বর্তমান। কিন্তু আমার সারসংগ্রহে বইখানিকে রূপকের মতো দেখাচ্ছে; এবং তাই অবিলম্বে বলা দরকার যে এ-উপন্যাসের দার্শনিক ভূমিকা যাই হোক না কেন, গল্পটি উপাদেয় ও চরিত্রগুলি জীবন্ত। তবে উপাখ্যানের সম্পূর্ণ রস পাবেন তাঁরাই, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্য যাঁদের নখদর্পণে।

কেননা কাহিনীটিতে ঘটনাবৈচিত্র্য নেই, অবস্থানপরিকল্পনা কোনও অব্যর্থ পরিণতির ধার ধারে না, একটা সুচিন্তিত প্লট্-কে সর্বাঙ্গীণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্যই নয়; তিনি চান দুটি চরিত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি দেখাতে। অর্থাৎ নভেলের সংজ্ঞা-সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ আঁদ্রে মোরায়া-র সঙ্গে একমত; তাঁরা দু জনেই ভাবেন যে সাবেকী দৃষ্টান্তে কতকগুলো ছাঁচে-ঢালা প্রতিমার পুতুলনাচে জীবনের অনুকরণ ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, তার কর্তব্য স্বসমুখ পাত্র-পাত্রীর বিবর্তনের ছবি আঁকা; এবং এই চেষ্টায় ধূর্জটিপ্রসাদ বিশেষ সাফল্য পেয়েছেন। অবশ্য লেখকের সঙ্গে খগেনবাবুর জীবনগত সাদৃশ্য না থাক, চারিত্র্যগত ঐক্য যে খুব বেশী, তা পূর্বেই বলেছি; এবং তাই হয়তো এই চিত্রের জন্যে অতিপ্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু রমলাদেবীর মতো গতানুগতিক বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্যই বিস্ময়কর; এবং এই দিক থেকে তাকালে, বইখানিকে একেবারে

বাহুল্যবর্জিত ঠেকে : আলেখ্যের কোনও রেখা নিরুদ্দিষ্ট নয়, সকল আচরণ সার্থক ; এবং চরিত্রটি যেখানে পূর্ণতায় পৌঁছেছে, সেইখানেই পুস্তকের পরিসমাপ্তি।

খগেনবাবুর ছবিও সর্বত্রই বিশ্বাস্য। ধূর্জটিপ্রসাদের পাঠাভ্যাসের প্রসাদে তিনি মাঝে মাঝে হয়তো একটু ভারাক্রান্ত ; কিন্তু লেখকের অন্যান্য রচনার এই দোষটাও এখানে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ গ্রন্থ ও গ্রন্থ-কর্তাদের সম্বন্ধে নায়কের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা কোথাও অসামঞ্জস্য আনেনি ; এমনকি তত্ত্বসঙ্কুল উদ্ধারগুলোও চরিত্রচিত্রণের উপাদান যুগিয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুর মারফৎ আমাদের জানিয়েছেন যে প্রুস্ৎ, জয়েস্, ভর্জিনিয়া উল্ফ্‌ ইত্যাদি অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ; এবং সে-খবর না পেলেও, তাঁর আদর্শ-সম্বন্ধে আমাদের ভুল ঘটত না। তথাচ "অন্তঃশীলা" বাংলা উপন্যাস ; এবং বাঙালীদের মধ্যে একা ধূর্জটিপ্রসাদই বোধহয় এই উপন্যাসপ্রণয়নে সক্ষম। আসলে অর্জিত বিদ্যায় তিনি যদিও বৈদেশিক, তবু তাঁর প্রবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বিশুদ্ধ স্বদেশী ; এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ় বটে, কিন্তু তিনি যে স্বভাবতই বিশ্লেষণবুদ্ধির অনুর্বর মার্গের প্রতিকূল, তার ভূরি প্রমাণ "অন্তঃশীলা"-র প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। সেই জন্যে আধুনিক কাল তাঁর কথকালির প্রশস্তি গেয়েই থামবে ; তাঁর মতো দু নৌকায় পা রেখে উভয়সঙ্কট পেরিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়।

[ ১৯৩৫ ]

# "চোরাবালি"

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে আমার বন্ধু ; এবং আমি তাঁর ভক্ত—অন্ধ না হলেও, পক্ষপাতী। সুতরাং এ-প্রবন্ধ মোহপ্রবণ ; এবং এর বিরুদ্ধে একদেশ-দর্শিতার অভিযোগ তো ন্যায়সঙ্গত বটেই, এমনকি এতাদৃশ একচক্ষু বিচার-বিবেচনার সার্থকতা সুদ্ধ তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু বিদূষণ আর কাব্য-জিজ্ঞাসার মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান ; এবং অনুকম্পা কেবল সৌহৃদ্যের শ্রেষ্ঠ সম্বল নয়, সৎসমালোচক যেকালে স্বভাবতই অনুকম্পায়ী, তখন বন্ধুবাৎসল্য বৈদগ্ধ্যের বাধ সাধে না, অনুরাগীর অশোভন উচ্ছ্বাস রসগ্রাহীর উপকারে লাগে। উপরন্তু বিষ্ণু দের কবিপ্রতিভা অসামান্য ও অভিনব ; এবং অপরিণত বয়স থেকেই তিনি যদিও সুপরিণত কাব্যসৃষ্টি ক'রে আসছেন, তবু তাঁর কলাকৌশল, অন্তত বাংলা সাহিত্যে, এ-রকম অপূর্ব যে শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব ব্যতীত তৎপ্রণীত কবিতাগুলির যথার্থ মূল্যনির্ধারণ অসম্ভব। তবে দরদ যেমন উদীয়মানের পক্ষে লোভনীয়, তেমনই সমবেদনার অভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠেরও সমূহ ক্ষতি ; এবং সমানধর্মীর সাক্ষাৎ আজ না পাওয়া যাক, অচির ভবিষ্যতে নিশ্চয় মিলবে, এই আশাতেই সকল কবি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর গুণ-গানে শতমুখ। কারণ রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় একাধিকের ঐক্য-জাত ব'লেই, রসাত্মক বাক্যের আধুনিক নাম সাহিত্য ; এবং এই শব্দতত্ত্ব নিরুক্তকারের কাছে যতই অমূলক ঠেকুক না কেন, তবু সক্রেটিস্-এর মতে বক্তা ও শ্রোতার হৃদয়সংবেদ্য সহযোগ ব্যতীত, সৌন্দর্য কোন্ ছার, সত্যসন্ধানও পণ্ড শ্রম। বুঝি বা সেই জন্যে কোল্‌রিজ্ দুরূহতার অস্তিত্ব মানতেন না ; বরং তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃত কাব্যের অভিভাব পাঠকের অন্তরাত্মায় পৌঁছায় অর্থবোধের বহু পূর্বে।

উপরে যা বললুম, তার পরে হয়তো এমন সন্দেহ মার্জনীয় যে বিষ্ণু দের অভিনব কাব্য অভাবনীয় রকমে কণ্টকাকীর্ণ, এবং তিনিও আর পাঁচ জন সমসাময়িকের মতো স্বাতন্ত্র্য ও উৎকটতার মধ্যে ছেদ টানেন না, কাব্যামোদীর বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিয়েই আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। কিন্তু এ-দিক থেকে তিনি নিতান্ত নিরপরাধ; এবং তাঁর মনীষা যেহেতু প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যোগফল, তাই ব্যাসকূটের চর্বিতচর্বণ তাঁর কাছে নূতন লাগে না, পূর্বাচার্যদের দেখে তিনি বোঝেন যে প্রবহমাণ ঐতিহ্যের ব্যক্তিগত বিকাশেই বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। অবশ্য এই ঐতিহ্য কেবল বঙ্গদেশীয় নয়, বিশ্বমানবিক; এবং সেই জন্যে উনিশ-শতকী ইংরাজদের যে-আদর্শ রবীন্দ্রসাহিত্য তথা আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা, শুধু তার নির্দেশ মনে রাখলে, বিষ্ণু দের প্রসাদগুণ হয়তো আমাদের এড়িয়েই যাবে। কিন্তু রসরচনার স্বরূপ-সম্বন্ধে অনর্জিত সংস্কার কাটিয়ে যাঁরা এক বারও স্বকীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁদের আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না যে কাব্যলক্ষ্মীর নির্বিকার স্বভাবের সঙ্গে এ-কবির পরিচয় সত্যই অন্তরঙ্গ। ফলত বিষ্ণু দের তুল্য নিরাভরণ লেখক এ-দেশে বিরল, এবং তাঁর কাব্যে ছন্দ, মিল, উপমা, অলঙ্কার ইত্যাদির প্রয়োগ তো স্থমিত বটেই, এমনকি বিষয়মাহাত্ম্যে বা অর্থগৌরবে ভাবের স্বল্পতা তিনি কোথাও ঢাকতে চাননি, সার্বজনীন অনুভূতির ঐকান্তিক অঙ্গীকারেই সাধারণ চিত্রকল্পাদির মধ্যে প্রাণস্পন্দ জাগিয়েছেন।

অর্থাৎ বিষ্ণু দে বোঝেন যে প্রসঙ্গনির্বাচনে সমভাব কবিচিত্তের প্রধান লক্ষণ, এবং নির্ভরের উচ্ছ্রিতি যদি কাব্যকে অমৃতলোকে পাঠাত, তবে নবীন সেনের পাঠকসংখ্যা শেষ পর্যন্ত শূন্যে ঠেকত না, অথবা হেরিক্-এর সমসাময়িক হেন্‌রি মূর-কে আজ কেবল পুরাবিদেরা মনে রাখতেন না। আসলে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হয়তো বা রসপ্রতিপত্তির অন্তরায়; এবং লুক্রিশিয়াস্ ও দান্তে ছাড়া আর কোনও কবি তত্ত্ব আর কাব্যের অদ্বৈত ঘটাতে পেরেছেন ব'লে অন্তত আমার স্মরণে নেই। সম্ভবত সেই জন্যে দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়েও মালার্মে কবিযশঃপ্রার্থী দগা-কে জানিয়েছিলেন যে কাব্যের উপাদান ভাবনা নয়, ভাষা; এবং সাহিত্যিক ভাষার স্বাবলম্বন

রিচার্ড্স্-এরই আবিষ্কার বটে, কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তীরাও মানতেন যে কবিতার অর্থ অভিধানসাপেক্ষ নয়, সার্থকতার নামান্তর। অবশ্য এ-অভিমতে অতিশয়োক্তির আভাস আছে ; কারণ ভাষার উৎপত্তিতে ধ্বনির প্রাধান্য থাক বা না থাক, শব্দমাত্রেই যে সাঙ্কেতিক, তা এক রকম সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং কলাকৈবল্যের পুরোধারাও বিষয়ের সংক্রাম একেবারে এড়াতে পারেন না, খুব জোর উপমার মায়া কাটিয়ে ঘন ঘন উৎপ্রেক্ষার শরণ নেন। তাহলেও বাগর্থ আর যাথার্থ্যের সম্পূর্ণ সমীকরণ অসাধ্য ; এবং কালগুণে শব্দের ধাতুগত অর্থে তো ঘুণ ধরেই, এমনকি তর্কের খাতিরে অভিধার অবিনশ্বরতায় সায় দিলেও, এ-সিদ্ধান্ত অপরিহার্য ঠেকে যে স্বতন্ত্র শব্দ আর অন্বয়ী শব্দের বহিরাশ্রয় প্রায়ই পৃথক, এত পৃথক যে ন্যায়ত উভয়ের তাৎকাল্য অনেক ক্ষেত্রেই অচিন্ত্য।

উদাহরণত আকাশকুসুম উল্লেখযোগ্য ; এবং অন্বীক্ষাশাস্ত্রের অনুসারে এ-পদার্থ যত না নিরুপাখ্য, ভূতবিদ্যার মতে নীলাকাশ ততোধিক অবাস্তব। সুতরাং সাত্ত্বিক কবিদের মধ্যে অত্যধিক বিষয়াসক্তির নিদর্শন বিরল ; এবং তাঁদের দৈনন্দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিমর্ত্য কল্পনার অসার উপজীব্যে কোনও দিন মেটে না বটে, কিন্তু মরমী সাহিত্যের নিরন্তর ব্যর্থতা দেখে তাঁরা স্বভাবতই ভাবেন যে বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠার ব্যর্থ অনুকরণ কবির কর্তব্য নয়, স্বাধিকারপ্রমত্ত শব্দসমূহের সামঞ্জস্যসাধনই তার আত্মকৃত্য। এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে ভাষা অভিধা ও অভিপ্রায়ের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত ; এবং প্রথমের পরাকাষ্ঠা যেমন গণিতে, দ্বিতীয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তেমনই কবিতায়। অতএব কবিতার সঙ্গে সত্যাসত্যের আদানপ্রদান নেই, তার সম্বল সম্ভাব্যতা ; এবং কবিমাত্রেই যদিও বোঝেন যে বিষয় ও বিষয়ীর অন্তঃপ্রবেশেই অভিজ্ঞতার উৎপত্তি, তবু একা বিষয়ী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মমতা জাগায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানোক্ত বিষয় শুধুই অনুমেয়, নিশ্চিত নয় ; সে-বস্তু এ-রকম নিরুপাধিক যে চৈতন্য কোন্ ছার, আমাদের সংবেদনাও প্রতিভাসের আজ্ঞাধীন ; এবং সে-প্রতিভাস কেবল ব্যক্তিগত নয়, এমনকি ব্যক্তিবিশেষের বেলা একই প্রতিভাস এত বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার উদ্ভাবক যে মনস্তত্ত্বে কার্য-কারণের উল্লেখ পর্যন্ত

হাস্তকর। কিন্তু কাব্যোপজীবিকার এই অনিত্যতার দরুন অনাবাসিক কবিরা প্লেটোনিক্ গণতন্ত্রে অন্ন-জল পান বা না পান, এর ফলে নৈমিত্তিক সংসারে ক্ষতির চেয়ে লাভই তাঁদের বেশী।

কারণ তাঁদের অন্তর-বাহিরের মধ্যে যখন হেত্বাভাসটুকুও অবর্তমান, তখন গতানুগতিক পরিস্থিতির আশ্রয়েও তাঁরা প্রাক্তন অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করেন না, প্রাচীন ও সার্বজনীন প্রতীকগুলোকে আর্বচীন আত্মোপলব্ধির কাজে লাগান; এবং বিষ্ণু দের ক্ষেত্রেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি— নদী ও বন, মেঘ ও পর্বত, সমুদ্র ও আকাশ, রাত্রি ও দিন ইত্যাদি চির-পরিচিত চিত্রকল্পাদির সাহায্যেই তাঁর স্বকীয় প্রেমানুভূতির অপূর্ব দ্বন্দ্বসমাস সূচিত হয়েছে। উপরন্তু এ-জন্যে আমাদের ধন্যবাদই তাঁর প্রাপ্য, এখানে বিস্ময়প্রকাশের অবকাশ নেই; এবং মনোবিকলন-সম্বন্ধে যাঁদের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানও আছে, তাঁরাই জানেন যে অল্পসংখ্যক ভাবচ্ছবিই যেহেতু অনন্ত বিভাবের বাহক, তাই স্বপ্নের তাৎপর্য-বিচারে মানস প্রতিমাদির বাহ্য রূপ নিতান্ত গৌণ, মুখ্য সেগুলোর অন্তঃসঙ্গতি ও অন্যোন্যসম্পর্ক। দুর্ভাগ্যক্রমে উনিশ শতকের কবিরা এ-সত্য মনে রাখেননি; চোখের সামনে বিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত বিস্তার দেখতে দেখতে, তাঁরা স্বভাবতই ভুলে গিয়েছিলেন যে স্বয়ং ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্-এর মতে মহার্ঘ্য অভিজ্ঞতা কাব্যের মূলধন নয়, স্মৃতিসঞ্চিত আবেগের সুগ্রথিত উর্ণাজালেই কবিতালক্ষ্মী বাসা বাঁধেন; এবং বাঙালী কাব্যবিবেচকেরা সেই উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র ব'লে, তাঁদের কাছে "বলাকা"-র মূল্য "ক্ষণিকা"-র চেয়ে বেশী। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের সাক্ষ্য তাঁদের বিপক্ষে; এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ন্যায়বুদ্ধির নির্দেশে রসবিচারে নামলে, শুধু লোকসাহিত্যকেই অসম্বদ্ধ লাগে না, চীন-জাপানের গাঢ়বদ্ধ ধ্রুপদেও অতিবস্তুবাদের খামখা খেয়াল ধরা পড়ে।

সুতরাং সাধকের মতো কাব্যামোদীও বুদ্ধির অহংকার ছাড়তে বাধ্য; এবং তাতে যে কৃতকার্য, সে-উপভোক্তা তথাকথিত জটিলতাকেও আর ডরায় না; বরঞ্চ তার আত্মসমর্পণে লেখক-পাঠকের মধ্যে একটা ঐকান্তিক সালোক্য ঘটে। তখন বোঝা যায় যে ঐতিহ্যভ্রষ্ট উনিশ শতকেও অবলম্বনের স্পষ্টতা অথবা বিষয়ের প্রাধান্য কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত না,

সে-মর্যাদা যোগাত কবির ব্যক্তিস্বরূপ, যার সঙ্গে রচনারীতির সম্বন্ধ, অন্তত ফরাসীদের বিবেচনায়, হরি-হরের চেয়েও নিবিড়। ফলত সে-দেশের অভিধানে নূতন শব্দের অব্যাহত প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেখানকার সাহিত্যে নূতন বাক্যবিন্যাসের অবাধ স্বাধীনতা অনাবশ্যক ; এবং তৎসত্ত্বেও কর্নেই আর রাসীন্ এক নন, তাঁদের তুলনায় ব্রাউনিং ও টেনিসন্-এর সাদৃশ্য অনেক বেশী। হয়তো সেই জন্যে ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্ আর শেলি উভয়ে একই ভরদ্বাজ-পক্ষীর বিষয়ে কবিতা লিখে অতখানি মূলগত পার্থক্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ; এবং যুবাসুলভ পদস্খলন যেমন প্রথমোক্তকে বকধার্মিক বানিয়েছিল, তেমনই শেষোক্তের কৈশোরিক উচ্ছৃঙ্খলতা শেষ পর্যন্ত ধরেছিল বিশ্ববিদ্রোহের রূপ। পক্ষান্তরে ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে জন্মান্তরীণ রহস্যের কোনও যোগ নেই ; এবং আমাদের স্বাতন্ত্র্য যেহেতু পরাধীন শিক্ষা আর যদৃচ্ছালব্ধ সংস্কারের ফল, তাই শত চেষ্টাতেও মানুষ কমঠবৃত্তি বজায় রাখতে পারে না, তার সকল ক্রিয়া-কর্মে ফুটে বেরোয় প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ছাপ। আত্মসন্ধানী কবিরা অগত্যা কলাকৈবল্যে নিরুৎসুক ; এবং তাঁরা বিষয়বিমুখ শুধু এই জন্যে যে বস্তুবিলাসের আধিক্য যেমন বিশ্ববীক্ষার পরিপন্থী, তেমনই সাহিত্য আর সমাচারদর্পণ সর্বসম্মতিক্রমে বিপরীতধর্মী।

কবি বরঞ্চ প্রত্নাস্থিবিদের সঙ্গে তুলনীয়, যিনি এক টুকরো শিলীভূত কপালে কল্পবিশেষের সমগ্র জীবনেতিহাস দেখেন ; এবং এ-কথা না ভুললে, আধুনিক কাব্যের আপাতবিলগ্ন প্রকাশপদ্ধতিকেও আর প্রলাপের মতো শোনায় না, বোঝা যায় যে স্বয়ংসিদ্ধ বিকল্পনা সুদ্ধ পাকে-প্রকারে সাধারণ্যেরই অংশভাক্। অর্থাৎ কবি যখন তাঁর ভাবনা-বেদনা তথা পঠন-পাঠনের জন্যে পারিপার্শ্বিকের মুখাপেক্ষী, তখন অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখেও তিনি তাঁর ঐকান্তিক অধিগম ঘোষণা করেন না, খুব জোর সাময়িক চিৎপ্রকর্ষের সীমারেখা টানেন। এমনকি যাঁরা জ্ঞাতসারে সমাজের সর্বনাশ সাধেন, এই সামান্য বিধির হাত থেকে তাঁদেরও নিস্তার নেই ; কারণ দার্শনিকদের মতে অভাবও সদর্থক, এবং আজ পর্যন্ত নেতিবাদ শুধু ব্রহ্মবিদ্যার অনন্য পন্থা বটে, তবু ন্যায়ত অবিরোধ আর অদ্বৈতের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান। কাজে কাজেই পলায়নে প্রাণরক্ষা কবির

পক্ষে অসম্ভব ; এবং বৃদ্ধ বয়সে মনের পাপ যেমন শুচিবায়ুতে ফুটে বেরোয়, তেমনই ওয়াইল্ড্-এর মতো সংসারসেবীরাই ঊর্ধ্বশ্বাসে শিল্পশুদ্ধির গুণ গায়। কিন্তু তাতেও বিষয়ের উপদ্রব থামে না ; লেখকের দিক থেকে যতই আপত্তি থাক না কেন, অবশেষে প্রকৃতিই প্রতিশোধ নেয়, এবং লোকযাত্রাই সর্বত্র জেতে। তবে কাব্যবস্তু সব সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, প্রায়ই তন্মাত্র-পদবাচ্য ; এবং সেই জন্যে কাব্যের আবেদন যুগধর্মের নামাঙ্কিত হয়েও যুগে যুগে বদ্‌লায়, আর ধরা পড়ে যে কবিজনোচিত মাত্রাজ্ঞান সমালোচকশোভন মূল্যজ্ঞানেরই নামান্তর।

অতএব বিষয়াতিরিক্ত কাব্যচর্যা আর নৈর্ব্যক্তিক পুরুষসিদ্ধি আপাতত একই পর্যায়ের ব্যাপার ; এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধেই যেমন আত্মসমাহিতি আসে, তেমনই সাময়িক নির্ভর ঘুচিয়ে স্বগত আবেগে পৌঁছাতে পারলেই, কবিতা সার্থক হয়। আমার বিশ্বাস বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ রচনা-সমূহে এই আর্য-সত্যের অমর্যাদা ঘটেনি ; এবং সকল কর্মপ্রবৃত্তির মতো তাঁর কবি-প্রতিভাও অবস্থাগতিকেই জাগে বটে, কিন্তু সে-উত্তেজনার তাড়নে তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসেন না, এমন একটা ব্যাপক পরিস্থিতি খোঁজেন যাতে শুধু স্বকীয় অনুভূতির স্বাক্ষর থাকে না, অনুরূপ অভিজ্ঞার আরও অনেক স্তর বিনা বিবাদে প্রশ্রয় পায়। অবশ্য এতাদৃশ ব্যাপ্তির চতুঃসীমা স্বভাবতই অনিশ্চিত ; এবং এর পরিকল্পনা যত না কষ্টকর, এর সম্যক উপলব্ধি ততোধিক দুঃসাধ্য। উপরন্তু বিষ্ণু দের আদর্শ আর আচার সর্বত্র সমতালে চলে না : কাব্যকে তিনিও কালে-ভদ্রে আত্মবিজ্ঞাপনের কাজে লাগান ; সুলভ করতালির লোভ তাঁর ধ্যান-ধারণাতেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ বিঘ্ন আনে ; এবং অধীত বিদ্যা, অর্জিত অভিজ্ঞতা ও অভীষ্ট সঙ্কল্পের সংমিশ্রণ শ্রমসাপেক্ষ জেনে তিনিও মাঝে মাঝে চকিত চাতুরীর শরণ নেন। কিন্তু যেখানে তিনি সত্যই সফল—এবং সে-রকম কবিতাই "চোরাবালি"-তে* বেশী, সেখানে তাঁর প্রতিযোগী নেই ; এবং সে-সমস্ত রচনা যদিও একাধিক বার একাগ্রতাসহকারে পাঠ্য, তবু সেগুলি এতই রসোত্তীর্ণ যে পারদর্শী পাঠকেরা উপভোগের আতিশয্যে নিশ্চয়ই পথকষ্ট

* চোরাবালি—বিষ্ণু দে প্রণীত ( ভারতীভবন )

ভুলে যাবেন। তাঁরা তখন বুঝবেন যে বিষ্ণু দের দায়িত্বপূর্ণ লেখনী অসার আত্মপ্রকাশের গরজে অস্থির নয় ব'লেই, তাঁর লেখা অল্প-বিস্তর অসরল; এবং উত্তরসঙ্গম বিষাদের বশেও তিনি যেহেতু আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয়ে মাথা ঘামান না, স্ত্রীসহবাসের সঙ্গে ব্রহ্মসাযুজ্যের সুপ্রসিদ্ধ তুলনা স্মরণ ক'রে হেসে ওঠেন, তাই তাঁর কাব্যে প্রেমের মতো একনিষ্ঠ হৃদয়াবেগ সুদ্ধ সমাজ ও সভ্যতার রঙ্গভূমি।

প্লেটো তো পড়েছি, তবু
বুঝিনি কো সুরেশের—
মানস জীবন।
সে কি খুঁজে খুঁজে ফেরে
এ শহরে
খোঁপার ছায়ায়
কেশগুচ্ছ কানে কানে
চুড়ির নিক্কণে
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে, হাতে হাত ভিড়ে
ডিয়োটিমা? সক্রাটিস্ খুঁজেছে যেমন?
কি বলেন বর্ট্রাণ্ড্ রসেল্?
মার্কিনী বেন্ লিন্‌সে বা?

ছিল দুই কবি, দুই (যত দূর জানি
প্রকাশ্যে) কুমার—
ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ্ আর কোল্‌রিজ্
তাদের বাঁচাল, পথ দেখাল যে জন
অষ্টাদশ শতকের ক্লেদসিক্ত বুদোআর, বিপ্লবের
দাবদাহ থেকে,
জাগ্রত নয়ন, মন প্রজ্ঞাসুকুমার,

নাম তার—
শ্লেগেল্ হেগেল্ নয়,
ডরথিই নাম জানি তার।
ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে,
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে বিচিত্র সন্ধ্যায়,
গোধূলিমায়ায় মুগ্ধ মোটরের সিটে,
চুম্বনতাড়নাকম্প্রবায়ু সিনেমায়
মেলে নাকো ডিয়োটিমা, তার কিছু আছে কি প্রমাণ?

( শিখণ্ডীর গান, পৃষ্ঠা, ৭৩-৭৪ )

এই সংক্ষিপ্ত সামান্যীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ "ওফেলিয়া"-নামক কবিতা; এবং সেটি প'ড়ে নেপথ্যবিলাসীর কৌতূহল মিটুক বা না মিটুক, অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয় তার রসবৈচিত্র্যে মজবেন। কারণ বাহ্যত "ওফেলিয়া" যদিচ গীতিকবিতার শ্রেণী-ভুক্ত, তবু তার ভাববিস্তার একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকের উপযোগী; এবং তাতে কবি শুধু প্রেমিকসাধারণের সুদীর্ঘ জীবনকাহিনীর সার-সংগ্রহ করেননি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখিয়েছেন যে এ-রূপকথার বিয়োগান্ত পরিণতির জন্যে কোনও পক্ষ অপরাধী নয়, সমাজবাসী জীব-মাত্রেই প্রাক্তন পাতকের উত্তরাধিকারী ব'লে, ট্র্যাজেডি এখানে অবশ্যম্ভাবী। তথাচ দিনানুদৈনিক সংসারযাত্রায় ট্র্যাজেডির প্রবেশ নিষিদ্ধ; সেখানে শোচনীয় ঘটনার অন্ত নেই বটে, কিন্তু সে-সকল দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ কার্য-কারণের সন্ধান পায়, অথবা ত্রুটিসংশোধনের উপায় শেখে; এবং যে-চিত্তশুদ্ধির লোভে দর্শক বারংবার ট্র্যাজেডিসন্দর্শনে ছোটে, প্রাত্যহিক শোকে-তাপে সে-অন্তর্বেদনার অবকাশ মেলে না। সেই জন্যে ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকারা বস্তুত নাট্যকারদের নিগূঢ় উপলব্ধির মুখপাত্র হলেও, সকলেই বিনা ব্যতিরেকে অলৌকিক মহিমার অংশীদার; এবং বিষ্ণু দের ওফেলিয়া-ও যেহেতু কোনও প্রকৃতিকৃপণা পার্থিবা নন, সার্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক, তাই তাঁর সঙ্গে কবি নিজে কথা কননি, অতিমর্ত্য হ্যাম্‌লেট্-এর মধ্যস্থতা মেনেছেন। ফলত তাঁর ব্যক্তিগত অভাববোধের গোষ্পদে শেক্‌স্‌পীয়র-এর বিশ্বমানবিক ছায়া তো পড়েছেই, তাছাড়া

হ্যাম্‌লেট্‌ রহস্যের ঘনান্ধকারে আরও একটা আকাশপ্রদীপ জ্ব'লে উঠেছে তাঁরই প্রযত্নে। অবশ্য এই নূতন আলোকের তৈল ও সলিতা যুগিয়েছেন ফ্রয়েড্‌ আর উইল্‌সন্‌ নাইট্‌। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বিষ্ণু দের কৃতিত্বও কিছু কম নয়: দীপাধারটি একেবারেই তাঁর নিজস্ব; এবং যিনি অধ্যয়ন-রূপ পরচর্চাকালেও স্বধর্ম ভোলেন না, তাঁর অবৈকল্য স্বতই নিঃসংশয়।

মরণে মোরা করিনি জয়, জীবনে বাহুডোরে
অতনুরতি বাঁধিনি আজও মোরা।
বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে
অনির্বাণ তবুও পথে ঘোরা॥

মুক্তি-ইশারা নয়নে তোমার দূরবিহঙ্গ নভোবিহার,
শান্তিতুষার মুঠিতে তোমার, ছড়াও বারেক বৃষ্টিধারে।
হৃদয় ওড়াও আকাশে, জীবন হোক তুষার॥

উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা-আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণমায়ারে হানো॥

এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমী আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া-আসা॥

অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই!
ধূমকেতু এই বিরাটদাহন বিশ্ব আমার তোমার চোখেই
পেয়েছিল তার পরমাগতি॥

(ওফেলিয়া, পৃষ্ঠা, ২৬-২৭)

সত্য বলতে কি, এ-রকম নৈরাত্ম্য উপকরণে এতখানি স্বকীয়তার সৃষ্টি আমার পরিচিত অন্য কোনও বাঙালী কবির সাধ্যে কুলায় না; এবং এই

অনন্য পদ্ধতির পরাকাষ্ঠা "ক্রেসিডা"-শীর্ষক কবিতায়। কেননা এখানে তিনি বাদী, বিবাদী ও অনুবাদী ভাবের নাটকীয় প্রতিসাম্য ঘটিয়েই সন্তুষ্ট হননি, যে-প্রশস্ত পরিমণ্ডল গ'ড়ে তুলেছেন, তার মধ্যে চসর, হেন্‌রিসন্ ও শেক্‌স্‌পীয়র তুল্যমূল্য। উপরন্তু শুধু করকৌশলপ্রদর্শনের জন্যে তিনি এ-অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পাননি ; তাঁর প্রণয়সংক্রান্ত ভাবনা-বেদনা প্রবর্ধমান ব'লেই, উক্ত মহাকবিদের প্রত্যেককে পৃথক ভাবে তাঁর অসম্পূর্ণ লেগেছে। প্রিয়ার কৃপাকটাক্ষে পৃথিবীবিস্মরণ এখন তাঁর কাছে লজ্জাকর ঠেকে ; তিনি আর মানতে প্রস্তুত নন যে বাঞ্ছিতার আত্মদানে ভবব্যাধির জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়ায় ; এবং তাই ক্রেসিডা-র বিশ্বাসঘাতকতায় শেক্‌স্‌পীয়রী মুমূর্ষা তাঁকে আর টানে না, চসরী জিজীবিষায় প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাত থেকে বেঁচে তিনি আবার সংসারধর্মে মন দেন। তবে স্মৃতির দৌরাত্ম্য অত সহজে থামে না ; তৎসত্ত্বেও নবোঢ়ার বাহুবন্ধনে ক্রেসিডা-র ছায়ামূর্তি মাঝে মাঝে তরবারিবৎ বাজে ; এবং তখন অর্ধসভ্য জাতিদের মতোই তাঁর বিচারেও প্রেম ও যুদ্ধের তফাৎ থাকে না, তিনি ভেবে বসেন কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশ বুঝি সে-সর্ববল্লভার মধ্যে মূর্তিমান। কিন্তু বিষ্ণু দের মতে ট্রয়লাস্-এর এ-মতিভ্রম শোকাবহ নয়, তার আসল ট্র্যাজেডি এই যে অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়েও সে মহাকালেরই ক্রীড়নক ; এবং সময়ে মানুষের মূল্যজ্ঞান বাড়ে না, তার স্মরণশক্তিই কমে। ফলত উপসংহারে তিনি হেন্‌রিসন্-এর পদাঙ্কে চলেছেন ; এবং সে-কবি যদিচ নীতির খাতিরেই ক্রেসিডা-কে কুষ্ঠরোগে ভুগিয়েছিলেন, তবু বহু বৎসর বাদে পাত্র-পাত্রীর পরিচয়হীন সাক্ষাৎকারে বিষ্ণু দে বোধহয় এই সত্যই প্রত্যক্ষ করেছেন যে প্রাণযাত্রায় প্রত্যাবর্তন নেই, এবং অভ্যাসবশে আমরা ক্রমাগত পিছনে তাকাই বটে, কিন্তু কার্যত পুনরুজ্জীবিত অতীতের সাদর সংবর্ধনা মর্ত্যবাসীর স্বভাব-বিরুদ্ধ।

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে' দেবে ?
উদ্বায়ু আজও হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান্-খান্॥

পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে।
স্তব্ধ নিথর পাঁচ-সায়রের বিল ॥

তুমি চলে' গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক
বধির ওষ্ঠাধরে।
তার পরে এল রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিল শ্বেত বাহু দুটি—

স্মরণ তোমার হানে আজও তরবারি ॥

( ক্রেসিডা, পৃষ্ঠা, ৯১-৯২ )

বলাই বাহুল্য যে কবিতামাত্রেই অনির্বচনীয়; অন্ততঃপক্ষে তার গদ্য ব্যাখ্যা অসম্ভব; এবং আমার মতে "ওফেলিয়া" ও "ক্রেসিডা" যেহেতু উৎকৃষ্ট কাব্য, তাই সে-দুটির মর্মোদ্‌ঘাটন আমার অভিপ্রেত নয়, আমি সে-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াই এত ক্ষণ ব্যক্ত করেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী; এবং যে-পাঠকের পড়া-শুনা আমার চেয়ে বেশী, তিনি কবিতা-দুটির মধ্যে আরও অনেক কিছু খুঁজে পাবেন। কারণ নৃতত্ত্ব বা নব্য মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে অজ্ঞতা-বশত আমি যদিও কবিতাদ্বয়ের উপরে উক্ত দুই শাস্ত্রের প্রভাব-নিরূপণে অক্ষম, তবু এ-কথা আমারও সুবিদিত যে বিষ্ণু দের মতো এলিয়ট্-ভক্ত কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগ্বিদিক বেড়িয়ে আসেন। এ-অবস্থায় কালে-ভদ্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে তিনি বাধ্য; এবং আমার বিবেচনায় "অপস্মার"-কবিতাটির উপভোগার্থে মৃগীরোগের জন্মবৃত্তান্ত তো অনাবশ্যক বটেই, এমনকি সে-ব্যাধির প্রসঙ্গে ক্রেৎস্‌মার-এর মন্তব্য জানার পরেও রতিজনিত আত্মবিস্মরণের সঙ্গে বিচিত্রবীর্য বা দশরথের আত্মীয়তা ধরা পড়ে না।

কোনও গোরোচনা গৌরী কি
বাঁধেনি চরণে পরাণে ?
শোনোনি কি ঘুমপাড়ানি
জরৎকারীর শিথানে ?
হিংস্র অভাব হরি' কি
আলাদীন দীপ জ্বালেনি ?
কোনও বিচিত্রবীর্য কি
পূর্বজ কোনও দশরথ
রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার,
জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ
দায়ভাগে নির্লজ্জ কি
রেখে গেছে পিছে উপহার ?
তাই কি ঘুমের নীলিমা
বৈতরণীতে চেয়েছ ?
পলে পলে প্রাণ-পরাভব !
মরীচিকা-ফাঁকা ত্রিসীমা !
তাই কি রক্তে চেয়েছ
রসাতলব্যাপী নীল হিম
অপস্মারেই বিপ্লব ?

( অপস্মার, পৃষ্ঠা, ৫৯ )

তবে এতাদৃশ অপরিপাক বিষ্ণু দের পক্ষে অস্বাভাবিক ; এবং যেখানে তিনি সত্য সত্যই সফল, সেখানে তাঁর চর্যা ও চর্চা একাগ্র, বোধি ও ব্যুৎপত্তি ঐকান্তিক, অন্তর ও বাহির অভিন্ন। তখন তাঁর পাণ্ডিত্যকে আর অবান্তর লাগে না, দর্শন-বিজ্ঞানের প্রত্যয়াদিতে সুদ্ধ উপমার উপলক্ষণ জাগে ; এবং অনন্তর অনভিজ্ঞের জ্ঞানচক্ষু খুলুক বা না খুলুক, প্রজ্ঞা-পারমিত অনুষঙ্গের আহ্বানে অন্তত অনুকম্পায়ীরা নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দেয়। এই ইন্দ্রজালের সর্বপ্রধান নিদর্শন "চোরাবালি"-কবিতা ; এবং যাঁদের কাছে য়ুং-প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে চোরাবালি

আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা
ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন।

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?
দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠা-পড়া ?
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?
অঙ্গে রাখি না কাহারও অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনও বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূর দিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চির কাল থাকে বাকি ?
জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া।
চোরাবালি ডাকি দূর দিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর !
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?
হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—

হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।
পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাতঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে।
কাঁপে তনু বায়ু কামনায় থরো থরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার॥

( চোরাবালি, পৃষ্ঠা, ২১-২২ )

কিন্তু বিষ্ণু দে কেবল এক রকম কাব্য লেখেননি; এবং আমার রুচি সঙ্কীর্ণ ব'লে, আমি যদিও তাঁর নানার্থব্যঞ্জক কবিতা-কটির সম্বন্ধে এত বাক্যব্যয় করলুম, তবু স্বচ্ছ ও ঋজু কবিতার সংখ্যাই বর্তমান পুস্তকে বেশী। তবে সেগুলির প্রসঙ্গে কালক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন; এবং সেখানেও বিষ্ণু দের নাট্যরচনা নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সে-নাটক যেহেতু প্রায়ই ঐতিহাসিক, নচেৎ প্রহসন-জাতীয়, তাই তাতে শ্লেষ-বক্রোক্তির প্রাচুর্য থাকলেও, অর্থবৈচিত্র্য বা বিষয়াতিক্রমের অবকাশ অত্যল্প। সম্ভবত সেই জন্যে সে-সকল কবিতা আমাকে অপেক্ষাকৃত কম টানে; এবং যথাযথ সমাজচিত্রে আমি যত আনন্দই পাই না কেন, আমার ট্যুটনী মন কোনও মতে সামান্যীকরণের মোহ কাটাতে পারে না, ক্রমাগত পটভূমির পানে তাকাতে তাকাতে অবশেষে ছবির অস্তিত্ব সুদ্ধ ভোলে। অবশ্য পরিপ্রেক্ষিতই সামাজিক নকসার প্রাণ-স্বরূপ; এবং "শিখণ্ডী", "কবি-কিশোর" ইত্যাদি ব্যঙ্গকবিতাতেও বিষ্ণু দে নর-নারীর আপতিক সংস্থান দেখে হাসেননি, তাদের মানসিক অসঙ্গতিই তাঁর বিদ্রূপ জাগিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে ক্রেসিডা বা ওফেলিয়া-র মতো এই নিঃসম্বল লিলি-রমা-অলকার ভাগ্যে বিষ্ণু দের করুণাকণা জোটেনি; তিনি জানেন না অথবা জেনেও মানেন না যে এদের দৈন্যেও একটা

জাগতিক নিয়ম ক্রিয়াশীল ; এবং ফলে এরা তাঁর বিশ্ববীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেনি, শুধুই যুগিয়েছে তাঁর নেতিবাচক অবজ্ঞার উপলক্ষ। উপরন্তু এই তাচ্ছিল্য-সম্বন্ধে তিনি নিজেও নিশ্চিন্ত নন ; তাঁর উপেক্ষা অনেক সময়ে অহৈতুক আত্মশ্লাঘার উপায়মাত্র ; এবং সেই কারণে তিনি যখন উন্নাসিক ভেদবুদ্ধির প্ররোচনায় সুরেশাদির সংসর্গ ছেড়ে স'রে দাঁড়ান, তখনও তাঁর দুরুক্তি যেন খেদোক্তির মতো শোনায়, বোঝা যায় না তিনি কখন হাসছেন, কাঁদছেনই বা কখন।

প্রতিটি মুহূর্তে মোর মূর্তি পায় তিক্ত রসহীন
দুর্বাসা বিশ্বের ক্রূর সর্পফণা অশ্রান্ত কৌতুক।
সূর্য দেয় অর্থহীন স্বচ্ছ তার বিদ্রূপ যৌতুক,
রাত্রিশেষে নিদ্রাহীন চুম্বনের জ্বালা হানে দিন।
ভুলে' গেছি কিবা ভুল—দিন মোর ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো।
প্রত্যহ প্রভাতে জানি দিন মোর ব্যর্থতা-আহত
মিলাবে রাত্রিতে বৃথা,—এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস।
দীঘিকায় ভাসিলাম—তোমাদের তরঙ্গের মাঝে,
খাণ্ডবদাহের ক্ষত জুড়াল না হায় নারী, হায়!
কাজলগভীর মৃগনয়নের ঘন পক্ষ্মছায়ে
প্রাণবহ বসন্ত তো নাহি এল শ্যামপত্রসাজে
শীতমরুচিত্তে মোর নিঃশ্বাসের চৈতালী হাওয়ায়।

(কবিকিশোর, পৃষ্ঠা, ৪৬-৪৭)

পক্ষান্তরে কলাকৌশলের দিক থেকে তাঁর এই কবিতাগুলি প্রায় অনবদ্য ; এবং গম্ভীর কাব্যেও তিনি যদিচ অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তবু শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্যের অপরূপ সমন্বয়ে তাঁর লঘু কবিতা-বলীই অঘটনসংঘটনপটীয়সী। ফলত তাঁর পদ্য সর্বত্র অকাট্য নিয়ম মেনেও কোথাও আড়ষ্ট নয় ; তার সঙ্গে সংস্কৃত পদ তো অনায়াসে খাপ খায় বটেই, এমনকি তাতে ইংরাজী শব্দও অশ্রাব্য শোনায় না ; এবং তথা-

কথিত গদ্য কবিতা তাঁর হাতে অদ্ভুত সংযমের সাক্ষ্য—তার মাত্রাবণ্টন এ-রকম বিস্ময়কর যে পাঠকের অভিরুচি-অনুসারে তাকে গদ্য বা পদ্য হিসাবে পড়া সহজ।

তোমার প্রেমের সন্ধ্যাছায়ায় আলো কোথায়? প্লেটোর পেশীর মাভৈ তো নেই পাশে। ক্রিস্টিআনের মৈত্রী তুমি ছড়াতে যাও, বর্তমানের স্বপ্ন-ভঙ্গে, ভবিষ্যতের পারিজাতের বীজে। বিশ্বপ্রেমিক, বাতির পাশেই কালোর খেলা, চার পাশে তার আলো। আমায় তুমি নিলে, যেন সুরঙ্গমার রঙীন বিশ্ব মুছে' দিয়েই নিলে। পিতৃকালের বাড়ীবদল তোমার স্বভাবেই—এ কৈলাসে কেমন তরো হালচাল যে ভাবি।

(দ্বিধাদম্পত্তি, পৃষ্ঠা, ৬১)

কিন্তু আমার মন যে উদাস,
মাথুর তো নয়, শিথিল-পেশী।
গদ্যেই তাই বলি—
বিকল্প এ নয় গো প্রিয়া নয়।
তোমারই প্রেম থরো থরো
আমার প্রেমের তপশ্চারী একটিমাত্র চূড়ায়
দ্বৈতজনের ছায়াও আমি মাড়াইনে কো,
দ্বৈতাদ্বৈতের দোতুলদোলা স্বভাববিপরীতই।
একাধিকের সম্ভাবনা তোমার মনেই;
আদিম নারীর স্বত্বজমির চাষে।

(উন্মনা, পৃষ্ঠা, ৮০)

অথচ এই স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে তিনি কখনও কথ্য রীতি ভুলে যাননি, বৈয়াকরণিক বিধি-নিষেধে সাধারণত জলাঞ্জলি দেননি, সচরাচর মনে রেখেছেন যে গদ্য হোক, পদ্য হোক, কাব্যের ভাষা জীবন্ত; এবং জীবন্ত ভাষা যেমন একাধারে লৌকিক ও ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রাঙ্কিত, জীবন্ত ছন্দ তেমনই সার্বজন্য আবেগ আর অদ্বিতীয় অনুভূতির সঙ্কলন। তৎসত্ত্বেও

ছন্দের সঙ্গে আঙ্গিকের সমীকরণ অবশ্য অসম্ভব ; এবং বিষ্ণু দের স্বকীয় তাল-লয়-মানে অত্যাশ্চর্য শ্রুতিশুদ্ধির পরিচয় থাকলেও, তাঁর বাক্যযোজনা মাঝে মাঝে দোষাবহ, ক্রিয়াপদের অপব্যবহার অল্প-বিস্তর অস্বস্তিকর, শব্দনির্বাচন যে-পরিমাণে অনুষঙ্গবাহী, সে-অনুপাতে অভিধানসম্মত নয়। তবে অন্য উপায়ে তাৎপর্যের একাধিক স্তর একত্রে প্রকাশ পেত কিনা সন্দেহ ; এবং নিম্নলিখিত কবিতার দুষ্ট প্রকরণ অর্থগ্রহণের অন্তরায় নয়, বরং সহায়।

যদি মোর কারুশিল্প রচনারা করে' থাকে কোনও অপরাধ
কুম্ভীরক প্রবৃত্তিতে, প্রিয়া মোর, পল্লবপ্রচ্ছন্ন তব চোখে ;
যদি মোর রচনারা তব শুভ্র সুকুমার তনুর মাধুরী
রূপান্তরে ব্যর্থ হয় ; স্বপ্নসুকোমল তব আঁখিছায়াপাত
যদি না দিয়েই থাকে শিল্পে মোর ঘটকালি-সার্থক প্রসাদ ;
যদি মোর কল্পনার মন্দিরের তোরণে শিখরে দেখে লোকে
তোমারই হাসির দক্ষ অভিনব গভীরতা অনন্য চাতুরী ;
তবু তো কহিবে তারা—এ তো কভু ভয়ে ক্ষোভে ভ্রান্তিতে বা শোকে
মৃত্যুরে বহেনি কর। জীবনের উল্লাসই এ চেয়েছে বরিতে।
লজ্জা মোর অক্ষমতা ; তবু প্রিয়া, তুচ্ছ হবে যত অপবাদ—
গ্লানি শুধু অক্ষমতা, তাই আর তোমারেই নিমিত্ত করিতে।

( পঞ্চমুখ, পৃষ্ঠা, ২৯ )

উপরন্তু উল্লিখিত কবিতার মিল চমৎকার বটে, কিন্তু অনুরূপ সাফল্য অনেক সময় তাঁকে যেহেতু এড়িয়ে গেছে, তাই তাঁর অনুপ্রাস সাধারণত গতানুগতিক ও যমক শৈথিল্যসূচক ; এবং এ-অভিযোগের খণ্ডনে তিনি যদি একাধিক মহাকবির নাম নিয়ে বলেন যে পদান্ত মিলের কৃত্রিম যতিপাত উপলব্ধিগত ধ্বনিতরঙ্গের প্রতিকূল, তবে তাঁর বিরুদ্ধে এই আপত্তি উঠবে যে ওয়েনী অনিয়মের যথেষ্ট সুপ্রয়োগ তিনি করেননি। অন্ততঃপক্ষে তাঁর দীর্ঘ কবিতায় মিত্রাক্ষরের অভাব-প্রাদুর্ভাব নৈমিত্তিক নয়, সুবিধাসাপেক্ষ ; এবং যেখানে মিল আছে, সেখানে যখন দ্বিবর্ণের

সৌসাদৃশ্যে পাঠকের আবেশতন্ময়তা ভাঙে না, তখন ত্রিবর্ণ বা চতুর্বর্ণ যমকও সে নিশ্চয় সইতে পারে।

সে যাই হোক, এ-রকম নিন্দারোপের কোনও শেষ নেই : গ্রহপতিরা সুদ্ধ দুর্মুখের বাক্যবাণে ক্ষত-বিক্ষত; এবং কোমর বেঁধে ছিদ্রান্বেষে নামলে, শুধু বিষ্ণু দে কেন, যে-কোনও সাহিত্যিকের ত্রুটি-তালিকা মহাভারত ছাপিয়ে উঠবে। কিন্তু প্রারম্ভেই বলেছি যে বিনয় ও সহানুভূতি বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যের শ্রেষ্ঠ ভূষণ; এবং যাঁরা প্রকৃত কাব্যামোদী, তাঁরা বিনা তর্কে বুঝবেন যে বিষ্ণু দে যখন মাত্রাচ্ছন্দের মতো রাবীন্দ্রিক যন্ত্রকেও নিজের স্বরে বাজিয়েছেন, তখন তাঁর প্রতিভা নিঃসন্দেহ, তাঁর উৎকর্ষ স্বতঃপ্রমাণ, তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কারণ ছন্দোমুক্তি যদিচ সাম্প্রতিক কাব্যের মূল সূত্র, তবু এক জনের আলাপ-আলোচনা অন্যের থেকে বিভিন্ন শব্দের গুণে নয়, শব্দোচ্চারণের গুণে; এবং এই উচ্চারণপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য পদ্যের চেয়ে গদ্যেই সহজসাধ্য বটে, কিন্তু পদ্যের সার্বিক ঐকতানেও যাঁর স্বকীয় কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে না, তাঁর বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অবিসংবাদিত। সুতরাং আমার বিবেচনায় কবিপ্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র ছন্দঃস্বাচ্ছন্দ্য; এবং মূল্যনির্ণয় যেহেতু মহাকালের ইচ্ছাধীন আর অর্থগৌরবের আবিষ্কর্তা অনাগত সমধর্মী, তাই সমসাময়িক কাব্য-জিজ্ঞাসার নির্বিকল্প মানদণ্ড ছন্দোবিচার। এই দিক দিয়ে বিষ্ণু দের অবদান অলোকসামান্য; এবং সেই জন্যে তাঁর আর আমার মত ও পথের স্বভাবসিদ্ধ বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে আমি কেবল আনন্দ পাই। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস এই আনন্দ বন্ধুত্বের ধার ধারে না, বরং তাঁর কাছে যাঁদের কোনও রকম ব্যক্তিগত প্রত্যাশা নেই, তাঁদের নিরপেক্ষ সাধুবাদই বিষ্ণু দের অবশ্যলভ্য।

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?
অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে।

ক্রান্তিবলয় মিলায় সুমেরুলোকে।
আজি কি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা ?
অমৃতের ঝারি মদির ওষ্ঠাধরে
স্মৃতি-বিস্মৃতি শরতের ধারা ঝরে।
আজি কি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা ?
শরীর তোমার অলকানন্দা গান।
অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান
স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী।
ভাস্বর তব তনুতে অমৃতজ্যোতি।
প্রাণসূর্যের একান্ত সংহতি।
ক্রান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।
উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়।
তামসীরে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?
পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্তফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা ?
হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো,
দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা।

( মহাশ্বেতা, পৃষ্ঠা, ৬৭-৬৮ )

[১৯৩৭]

## "বাংলা ছন্দের মূল সূত্র"

এক সময়ে আমার বিশ্বাস ছিল যে বাংলা ছন্দ সংস্কৃত আর্যার সন্তান, কিন্তু যে-জৈব নিয়মের শাসনে অধিকাংশ প্রাণী বংশানুক্রমিক অবনতির অধীন, তারই প্রভাবে আর্যার মাত্রিক পবিত্রতা বাংলায় আর অবিমিশ্র নেই। শিশুশিক্ষালব্ধ অন্যান্য কুসংস্কারের মতো এ-ধারণাও শেষ পর্যন্ত টিঁকল না; প্রয়োগের তাগিদে এবং তাকিকের নির্বন্ধে অগত্যা মানলুম যে বাঙালীর ছন্দঃশাস্ত্র মূলে হয়তো আর্য ঐতিহ্যের ঋণ-মুক্ত। তবে বাল্য প্রত্যয় ক্ষণস্থায়ী হলেও, তার উপসর্গ দুর্মর; এবং সেই জন্যে সংস্কৃতের মোহ একেবারে কাটাতে না পেরে আমি জোর দিলুম প্রাচীন ছান্দসিকদের একটা নাতি-প্রয়োজনীয় বিধানের উপরে।

অবশ্য যে-বিধির কল্যাণে পদান্ত বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতা কবির রুচি-সাপেক্ষ, কেবল তার সাহায্যে যে বাংলা কবিতার ছন্দোলিপি বানানো যায় না, তা বলা বাহুল্য। সুতরাং কোনও এক অখ্যাত আলঙ্কারিকের কাছ থেকে আর একটা নিয়ম চেয়ে আনলুম, যার সাক্ষ্যে দেখানো গেল যে আর্যায় যতি ও ছেদ অভিন্ন। কিন্তু এতেও যখন বাংলার মাত্রাপরিমাণ পেলুম না, তখন ওই দুই বিধানের সমর্থনে এক তৃতীয় বিধানের পরিকল্পনা করলুম, যার ফলে আবার বাংলা শব্দান্ত বিরামের সঙ্গে যতি ও ছেদের কোনও প্রভেদ রইল না।

সুবিধার খাতিরে নিয়মনির্মাণের নামই অবৈধতা; এবং আমার উপর্যুক্ত বিধিগুলি সেই অভিধার উপযুক্ত। তবু আমার মনোভাব যুক্তির প্রসাদ থেকে একেবারে বাদ পড়েনি। আত্মজিজ্ঞাসাকে আমি এই তর্কের দ্বারা নিরস্ত করতে চেয়েছিলুম যে বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি সংস্কৃতের মতো

একটানা নয় ব'লে, বাংলা ছন্দে প্রতি শব্দের শেষে যে-অবকাশ আছে, তা সংস্কৃতে বর্তমান শুধু চরণের প্রান্তে ; এবং এই দুই অবকাশের কাল-পরিমাণে যদি তারতম্য না থাকে, তবে তাদের ধর্মেও পার্থক্য দেখা দেবে না—পদান্ত বর্ণের মতো প্রাগ্‌যতি অথবা প্রাগ্‌বিরাম বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতাও নিশ্চয় স্বয়ংবশ হবে।

অনুমানটা হয়তো নিতান্ত অন্যায্য নয় ; কিন্তু এত চেষ্টাতেও সকল সমস্যা মিটল না। অনেক পরিচিত দৃষ্টান্তে এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্কৃত বিধির ব্যতিক্রম তো ঘটলই, এমনকি বাংলা কাব্যের একটা বিরাট্‌ বিভাগ, অর্থাৎ স্বরমাত্রিক ছন্দ, কোনও মতে এই নিয়মের অধীনে এল না। বরং তাকে বিজাতীয় ছন্দোরীতির সাহায্যে বোঝা গেল, তবু তা সংস্কৃতের সঙ্গে খাপ খেলে না। স্বরমাত্রিককে বৈদেশিক ভাবতে পারলে, হয়তো গোলোযোগ চুকত ; কিন্তু সে-দিকে কোনও সুরাহা ছিল না। কারণ মেয়েলী ছড়া, গ্রাম্য প্রবচন ইত্যাদি যে-ছন্দে রচিত, অগত্যা যদি তাতেও পরদেশী প্রভাব খুঁজতে হয়, তবে হয়তো বাংলার প্রাণবস্তুই অস্বীকার্য।

কাজেই বহু প্রসিদ্ধ ছন্দোবিদের অনুসরণে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক দ্বৈত মেনে নিয়ে আমি মনে মনে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালুম যে স্বরমাত্রিক ছন্দই বাংলা কাব্যের আদিম বাহন ; তবে তার উৎপত্তি যেহেতু প্রাক্‌-সংস্কৃত যুগে, তাই সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিধিবদ্ধতা তার নাগাল পায়নি। উপরন্তু জগতের সকল কাব্যকলার মূল সম্ভবত এক : সংস্কৃত সাহিত্য স্বেচ্ছায় সেই সহজতার সংসর্গ ছেড়েছিল ; এবং সেই জন্যে বাংলা ছন্দের যে-অংশটা সংস্কৃতগন্ধী, তার নিয়ম পৃথিবীর অন্যান্য ছন্দঃপদ্ধতির অনুরূপ নয়, যেটা অবিকৃত, তার সঙ্গে বাহিরের সংযোগ সুস্পষ্ট।

এই অদ্ভুত ধারণার ইতিহাস প'ড়ে অনেকে নিশ্চয় হাসবেন। কিন্তু তাতে আমি লজ্জিত নই ; কারণ বাংলার শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ যে-ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষক, তার আনুগত্যে অসম্মান নেই, আছে কেবল গৌরব। আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি ; অকারণে বা অল্প কারণে পূর্বসূরিগণের সাধনালব্ধ সিদ্ধান্তের উপেক্ষা আমার বিবেকে বাধে। তাছাড়া বাংলা ছন্দের মূল সূত্রে-

আবিষ্করণও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত ; এবং বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় সত্যের স্থান নেই—বৈজ্ঞানিক নির্বিকল্পের পূজারী নয়, সে খোঁজে অনুমিতির ব্যাপকতা।

সে জানে যে পৃথিবীকে অচল ভেবে তার চার দিকে সূর্যকে তাড়িয়ে বেড়ালে, সত্যের অপলাপ হয় না, হয় শুধু অনুমিতিসংখ্যার অনাবশ্যক বৃদ্ধি। অর্থাৎ যদি পৃথিবীতে সৌর জগতের কেন্দ্র দেখি, তবে যতগুলি সমস্যার সমাধান অবশ্যকর্তব্য, সূর্যকে যখন কেন্দ্রে বসাই, তখন ততগুলো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দরকার নেই ; এবং তাই সারল্যের খাতিরে বৈজ্ঞানিক বলে যে আমাদের জগৎ সূর্যকেন্দ্রিক। ছন্দ-সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে ; এবং এখানেও সত্যাসত্যের বাদ-প্রতিবাদ অসার্থক, নবতর অনুমান অধিক ব্যাপক কিনা, বিবেচ্য কেবল এইটুকু।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকরণেও বাংলা কাব্যের ছন্দোলিপি বানানো যায় ; কিন্তু সে-উপায়ে বাংলা ছন্দের দ্বিধা বা ত্রিধা ঘোচে না। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশ মাথায় ধ'রেও আমি বাংলা ছন্দের ঐক্য চাই ; এবং যখন তা পাই, তখনও তাঁর অভিজ্ঞতা আমার কাছে মূল্যহীন ঠেকে না, শুধু বুঝি যে তাঁর পশ্চাদ্বর্তীরা সারল্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক এগিয়েছেন। আমি যত দূর জানি, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ঐক্যসাধনব্রতের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ; এবং এ-সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন।

"বাংলা ছন্দের মূল সূত্র"-নামক* আলোচ্য পুস্তিকাখানি সেই সন্দর্ভের সংক্ষেপসার ; এবং বইখানির রচনারীতি দেখে মনে হয় যে গ্রন্থকার বাংলা লেখায় এখনও অনভ্যস্ত। তাছাড়া তাঁর অপ্রাঞ্জল পরিভাষা, ছাপার ভুল ও ব্যাখ্যার অভাব ইত্যাদি দোষ বইখানির অর্থবোধে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু এ-সকল দুর্বোধ্যতা এবং দৃষ্টান্ত-উদ্ধারে অমার্জনীয় ভুল-চুক সত্ত্বেও, অন্তত আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নেই যে অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতি-সম্বন্ধে যা বলেননি, তা বক্তব্যই নয়।

* বাংলা ছন্দের মূল সূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

এই প্রশংসা আত্যন্তিক শোনালেও, বিবেচনাসম্ভূত ; এবং সত্য বলতে কি, অমূল্যধনের লেখা যখন প্রথমে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে পড়ি, তখন মনে কেবল প্রতিবাদ জেগেছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য পুস্তকাকারে হাতে আসার পরে আমার মুখ্য আপত্তিগুলির বোধহয় আর একটাও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য এখনও ছোট-খাট অনেক কৌতূহল অতৃপ্ত রয়েছে ; তবে সে-জন্যে হয়তো আমার স্থূল বুদ্ধিই দায়ী। কারণ আমার বিশ্বাস যে অমূল্যধন যদি তাঁর সূত্রগুলিকে উদাহরণ-সমেত সবিস্তারে লেখেন, তাহলে আর কোনও অভিযোগ থাকবে না ; এবং বাংলা ছন্দের মৌল সত্তা যাঁর অগোচর নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্গসংস্থানে তাঁর ভুল-ভ্রান্তি নিশ্চয়ই সাময়িক।

দুঃখের বিষয় এই ভবিষ্যদ্বাণী অনেকের কানে হাস্যকর লাগবে ; এবং ছন্দ-সম্বন্ধে গোটাকতক কার্যকর ধারণা থাকলেও, সে-বিষয়ে আমার যেহেতু কোনও ব্যক্তিগত গবেষণা নেই, তাই সাম্প্রতিক মাসিক পত্রের ভদ্রতাবিরুদ্ধ ছন্দোযুদ্ধে আমি দাঁড়াতে পারব না, কী নিয়ে এত আপত্তি-বিপত্তি, তা বোঝার আগেই নিরুপলক্ষ বাক্যবাণে প্রাণ হারাব। কিন্তু আমি পৌরুষেই বঞ্চিত, শ্রুতিশক্তিতে নয় ; এবং সেই জন্যে দূর থেকে যুযুৎসুদের শুধিয়ে জেনেছি যে এই কলহকোলাহলের মূলে রয়েছে বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ—দ্বন্দ্ব প্রভেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে। অমূল্যধনের প্রতি-বাদকেরা বলেন যে প্রকার-তিনটি বংশগত নয়, জাতিগত। অর্থাৎ তাঁদের মতে এই ত্রিধারা বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্তি, এগুলি অনাদ্যন্ত ও স্বসমুখ।

অমূল্যধনের বিবেচনায় বাংলা ছন্দ কার্যত তিন প্রকারের—শুধু তিন কেন, বহু প্রকারের—হলেও, তার মূল সূত্র এক ও অবিভাজ্য। এ যেন এক পিতার বহু সন্তান, তাদের কায়িক রূপে যতই তারতম্য ঘটুক, তাদের রক্তে কোনও পার্থক্য নেই ; তাদের তাল, লয় এক, শুধু ঢং আলাদা। নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে অমূল্যধনের মতই বেশী যুক্তিবান ; কারণ একই ভাষায় মাত্রাগণনার পদ্ধতি ত্রিবিধ, এমন পরিকল্পনা তো পীড়াদায়ক বটেই, এমনকি তা যদি গায়ে সয়ে যায়, তবু প্রয়োগের বেলায় দেখি যে অধিকাংশ প্রাচীন কবিতাই এই ত্রিধা আদর্শের বহির্ভূক্ত থেকে গেল।

এ-ক্ষেত্রে যাঁরা প্রাগ্‌রৈবিক কবিমাত্রকে ছন্দোভ্রষ্ট ব'লে ভাবতে না পারবেন, তাঁদের পক্ষে অমূল্যধনের পর্ব-পর্বাঙ্গবাদে আস্থাস্থাপন ছাড়া গত্যন্তর নেই ; এবং তার সাহায্যে যেমন একদেশদর্শিতা বাঁচে, তেমনই অসম্ভাব্যতাও প্রশ্রয় পায় না। অবশ্য পর্ব ও পর্বাঙ্গ অমূল্যধনের নূতন আবিষ্কার নয় ; ছন্দোবিচারকমাত্রেই ও-দুটির অস্তিত্ব মেনে এসেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তীরা ছন্দে কালের প্রভাব-সম্বন্ধে অমূল্যধনের মতো সচেতন ছিলেন না। তাই তাঁরা অক্ষর বা মাত্রা গুণেই ছন্দোলিপি বানাতে চেয়েছিলেন ; এবং অমূল্যধন দেখিয়েছেন যে পর্ব ও পর্বাঙ্গ, অর্থাৎ কালপরিমাণ, বাংলা ছন্দের প্রাণ।

এক ঝোঁকে কতকগুলো কথার উচ্চারণই বাঙালীর রীতি। কিন্তু বাক্যারম্ভে বাক্‌যন্ত্রের যে-শক্তি থাকে, বাক্যের শেষে স্বভাবত তা ক'মে আসে ; এবং বাংলা শব্দও যেহেতু কাটা কাটা ভাবে উক্ত হয়, তাই এখানেও সেই উত্থান-পতন ধরা পড়ে। এই জন্যে বাঙালীর আলাপে-প্রলাপে স্বরগাম্ভীর্যের একটা হ্রাস-বৃদ্ধি শোনা যায় ; এবং উক্ত স্বরকম্পনই বাংলা ছন্দের প্রধান উপকরণ। অতএব এই পর্ব-পর্বাঙ্গের আদর্শ ও পরিমাপ মনে রাখলে, অক্ষরমাত্রার কম-বেশীতে বাংলায় ছন্দঃপতন ঘটে না ; পাঠক বিনা কষ্টেই অক্ষরমাত্রাকে প্রয়োজনমতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ ক'রে নিতে পারে ও নেয়।

বলাই বাহুল্য যে এ-কথার ব্যাবহারিক মূল্য যৎসামান্য। কিন্তু ছন্দঃশাস্ত্র যেহেতু কাব্যরচনার পথ দেখায় না, শুধু কাব্যবোধের উপাদান যোগায়, তাই অমূল্যধনের আবিষ্কারকে আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। কারণ এর পরেও বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্তি যদিচ ওঙ্কারে পরিণত হবে না, তবু ত্রিবেণী-সঙ্গমের সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে। অর্থাৎ আমরা বুঝব যে আপাতদৃষ্টিতে বাংলা ছন্দকে স্বরাস্তিক, আক্ষরিক, মাত্রিক ইত্যাদি বিভাগে ফেলা গেলেও, আলোচনাটিকে এমন এক পর্যায়ে তোলা যায় যেখানে এই প্রকারভেদ নিতান্ত নিরর্থক।

তাহলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে, অথবা বাংলা কাব্যের আধুনিক কাণ্ডে, পূর্বানুমোদিত স্তরভেদ এখনও মোটামুটি খাটবে ; এবং যে-গন্থকারেরা অঙ্ক

ব্যতীত ছন্দ লিখতে অক্ষম, অমূল্যধনের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিয়ম জেনেও তারা কাজ গোছাতে পারবে না। তবে যারা শুধু কাজ চালিয়েই সন্তুষ্ট নয়, তারা অমূল্যধনের সিদ্ধান্তে না থেমে, ভবিষ্যতে তাঁকে ছাড়িয়ে ব্যাপকতর ঐক্য খুঁজবে বটে, কিন্তু তারাও না মেনে পার পাবে না যে সকলেই অমূল্যধনের কাছে ঋণী, এবং তিনি গন্তব্যে না পৌঁছালেও, দিক্‌ভ্রমে পথ হারাননি।

হয়তো ব্যক্তিগত কারণে ঐক্যসাধনের প্রয়োজন আমার কাছে সব চেয়ে বড় ; এবং সেই জন্যে আলোচ্য গ্রন্থের এই দিকটায় আমি বেশী জোর দিয়েছি। কিন্তু এটাও আমি জানি যে কেবল সাধারণ সূত্রের উপরে যে-মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, যাতে শুধু অভিন্নতাই সূচিত হয়, বৈষম্যের ব্যাখ্যা মেলে না, তার মূল্য অত্যল্প। সুতরাং অমূল্যধনের নির্দিষ্ট পথে বাংলা ছন্দের সমস্যামূলক ত্রিত্বের কোনও হেতু পাওয়া যায় কিনা, তার বিচারেই এ-প্রবন্ধ শেষ করা প্রশস্ত।

প্রথমেই শব্দান্তের বিরাম, পর্বান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ, এই তিন অবকাশের নাম নিয়েছিলুম। এগুলিকে পৃথক বলার সার্থকতা এই যে এদের কালপরিমাণ এক নয়, ক্রমবিবর্ধমান। ছেদ সাধারণত অর্থের সঙ্গে জড়িত—অর্থাৎ ছেদে থেমে পাঠকের বুদ্ধি সমাপ্ত বাক্যের মানে বোঝে, এবং আগামী বাক্যের ভাবগ্রহণের জন্যে কোমর বাঁধে। তাই ছেদের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক, অন্তত মিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পর্ক, খুব নিবিড় নয়। কিন্তু যতি নিঃশ্বাসগ্রহণের কাল। কাজেই যে-ছন্দে যতি দূরে দূরে স্থাপিত, সেখানে শব্দ ও অক্ষরগুলোর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত ; কেননা বাক্যের মধ্যে শ্বাস নেওয়া বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

ফলে বাঙালী যতিবিরল ছন্দে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্বরান্ত, হলন্ত ইত্যাদি সকল অক্ষরই প্রায় সমান ভাবে পড়ে, যৌগিক বর্ণকে তার যথার্থ মর্যাদা দেয় না। গদ্যে তো এ-রকম ঘটেই, এমনকি পয়ারও এই জাতীয় ছন্দ ; কারণ অন্তত আট মাত্রার পরে তার প্রথম অবকাশ, এবং দ্বিতীয় অবকাশ ছয় বা দশ মাত্রার পরে। সুতরাং গদ্যে বা পয়ারে বর্ণোচ্চারণের খুব স্পষ্টতা নেই, আছে একটা ঝোঁক অথবা তান ; এবং এই জন্যে যুক্ত-অযুক্ত, লঘু-গুরু,

সব অক্ষর পয়ারে একমাত্রিক-রূপে গণ্য। পয়ারের এই গুণকেই রবীন্দ্রনাথ শোষণশক্তি-নামে অভিহিত করেছেন।

পক্ষান্তরে অবকাশ যেখানে ঘন ঘন আসে, সেখানে শ্বাসের অনটন না থাকাতে প্রত্যেক বর্ণ তার প্রকৃত ওজন পেতে পারে। এই শ্রেণীর যতিবহুল ছন্দই মাত্রাবৃত্ত অথবা ধ্বনিপ্রধান-নামে পরিচিত। এর চাল দ্রুত, ধ্বনি তরঙ্গায়িত, এবং এর শোষণশক্তি ফলত সুপরিমিত। অর্থাৎ এতে যৌগিক স্বর, যুক্তাক্ষরের পূর্ব বর্ণ, অনুস্বর, বিসর্গ, হলন্ত অক্ষর ইত্যাদির মাত্রাসংখ্যা দুই এবং সময়ে সময়ে তিন।

তথাকথিত স্বরবৃত্ত অথবা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ, আমার মতে, শব্দান্ত বিরামের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এ-ছন্দে শব্দান্ত বিরামই শ্বাসের অবকাশ, যতি নিতান্ত গৌণ। কাজেই এখানে পাঠকের নিঃশ্বাসের পুঁজি সাধারণ উপায়ে ফুরায় না; তার সদ্ব্যবহার করতে গেলে, তাকে অতিরিক্ত কাজের ভার দেওয়া দরকার। ফলে বাংলা উচ্চারণে বাক্যারম্ভমাত্রেই যে-স্বরাঘাতের সূচনা হয়, এখানে সেটা, ইংরাজী উচ্চারণের মতো, শব্দে শব্দে ঝঙ্কার জাগায়।

অমিত্রাক্ষরের কারবার ছেদকে নিয়ে। এখানে লক্ষ্য শুধু অর্থ আর আবেগ, ছন্দঃশিল্পের কারিগরি নেহাৎ নগণ্য। হয়তো সেই জন্যে এতে যত নিয়মের ব্যতিক্রম চলে, অন্যত্র তা অসম্ভব। এখানে শ্বাসের অবকাশ এতই অপ্রচুর যে ছোট-খাট অসম্পূর্ণতার হিসাব রাখা আর তার সাধ্যে কুলায় না। একটা অবিরাম ও উদাত্ত ধ্বনিতরঙ্গের উপরে ত্রুটি ঢাকবার দায়িত্ব চাপিয়ে, পাঠক ছেদের উদ্দেশে এমনই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে যে তার স্বাভাবিক বিজোড়বিদ্বেষকে উপেক্ষা ক'রেও, তাকে তিন, পাঁচ বা সাত ইত্যাদির মতো অযুগ্ম সংখ্যায় কদাচিৎ থামানো যায়।

বিরাম, যতি ও ছেদ সম্বন্ধে যা বললুম, তার প্রকাশ্য উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস লেখক পরিশিষ্টে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করেছেন। এ-ধারণা যদি আমার ভ্রান্তি বা শৈশব যতিপ্রিয়তা থেকেই জ'ন্মে থাকে, তবু ক্ষুণ্ন হব না; কারণ এ-প্রসঙ্গে তাঁকে ভুল বুঝলেও, অন্যত্র তিনি আমার অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানদীপ জেলেছেন। তাহলেও সে-সব কথার

সংক্ষেপসার দিলুম না ; এবং সমগ্র গ্রন্থখানি এতঃসংক্ষিপ্ত যে তাকে আর কমানো আমার সাধ্যের অতীত। তাছাড়া পুস্তকখানির সারসংগ্রহের জন্যে যতটা সময় ও স্থানের দরকার, তা আমার নেই ; এবং তাই অমূল্যধন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েই আমি ছুটি নিচ্ছি।

[ ১৯৩৩ ]

## শিল্প ও স্বাধীনতা

স্বকীয় বিদ্যা-বুদ্ধির সম্বন্ধে অহৈতুক গৌরববোধ সকল মানুষের স্বভাবগত; এবং আমার আবাল্য অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও গুরুজনেরা আমাকে যদিচ চির কাল ধ'রে কোনও এক পরোপকারী পশুর সমপর্যায়ে ফেলে আসছেন, তবু অন্তত আকারে-প্রকারে সেই স্বনামধন্য জীবের বিজাতীয় হওয়ায় আমিও নিজের মেধা আর ব্যুৎপত্তির উপরে মানবোচিত আস্থা রাখি। কিন্তু বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক : তার কাছে আত্মপ্রসাদও প্রশ্রয় পায় না; এবং গণিতব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধবের মুখে যখন শুনি যে বস্তুবিশ্বের আদিম ও ক্ষুদ্রতম অধিবাসী পরমাণুর বিস্তার একেবারে অনন্ত, তখন আর এ-কথা না মেনে উপায় থাকে না যে আমার মতো নির্বোধের পক্ষে পরাবিদ্যা আর পদার্থবিদ্যা, দুইই যেহেতু অনধিকার চর্চা, তাই নেতিবাদের স্থানে অনিশ্চয়-বিধিকে বসিয়ে আমি ধীশক্তির পরিচয় দিচ্ছি না, আমার মর্মান্তিক অবিদ্যাই ফুটিয়ে তুলছি। অবশ্য আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রে অনেকেরই প্রবেশ ব্যাহত; এবং আমাদের আত্মশ্লাঘা সচরাচর এত দুর্মর যে পারি-ভাষিকের ধাক্কায় তা শুধু মচকায়, ভাঙে না। তাহলেও সম্প্রতি সেই সহজ স্থিতিস্থাপকতাও আমি হারিয়েছি; এবং আপেক্ষিক বা বৈশেষিক তত্ত্ব দূরের কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ্যেও আমার দৃষ্টি প্রতিহত।

উদাহরণত পাশ্চাত্ত্য জগতের সমরসজ্জা উল্লেখযোগ্য; এবং গত বিশ বছর যাবৎ সে-অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা যেকালে আগামী প্রলয়ের নিরন্তর বিভীষিকা দেখছে, তখন সেই অমোঘ সর্বনাশের অভ্যর্থনায় তাদের প্রাণপাত প্রযত্ন আমার বিচারে নিছক পাগলামি। কিন্তু অর্ধেক পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত, এমন ধারণাও অন্যায়; এবং এ-রকম

সিদ্ধান্ত আরও অমূলক যে আত্মম্ভরি সমাজপতিরা স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে স্বদেশীয়দের ক্ষেপিয়ে অহরহ নিজের আর পরের যথাসর্বস্ব খোয়াবার মতলব আঁটছেন। কারণ ধনিক শ্রেণী আর যাই হোক, একেবারে মূঢ় নয়; যে-কুলি-মজুরদের তারা চরিয়ে খায়, তাদের সমান বিবেচনা বোধহয় ফোর্ড্-রকিফেলার-এরও আছে; এবং ধনকুবেররা নিশ্চয়ই ভোগের জন্যে টাকা জমায়, প্রভাব ও প্রতাপ-অর্জনের আশাতেই অনুগতদের পিষে মারে। সুতরাং পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করায় শ্রেষ্ঠীদের বহুবিজ্ঞাপিত ষড়যন্ত্র আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে; আমি বুঝতে পারি না যে নগর-গ্রাম উড়িয়ে-পুড়িয়ে, আত্মীয়-স্বজনের গলা কেটে, মানবসভ্যতার উচ্ছেদ সেধে, দু-চারজন অতিজীবিত শক্তিশালীর কী লাভ।

তবে এ-ধরণের প্রশ্নই হয়তো ছেলেমানুষি; হয়তো জীবন্মুক্তেরাই নির্বাচনক্ষম, এবং মানুষ ফ্রয়েডী মুমূর্ষার পদানত; হয়তো রাজনীতি কার্য-কারণের ধার ধারে না ব'লেই, হাল আমলে তা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পদবাচ্য। অথবা হিতৈষীদের অনুমানই ঠিক: কানের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক সর্বত্র বিষমানুপাতিক নয়; এবং আমার মতো দ্বিপদ জন্তুর মধ্যেও চতুষ্পদী মস্তিষ্ক সুলভ। পক্ষান্তরে রাসভরাজ্যে সোহংবাদের প্রচলন নেই; এবং অস্থিলোভী কুকুরের গতিবিধি যদি গাধার সম্বন্ধেও খাটে, তবে সে নিশ্চয় আত্মধিক্কারের আক্রমণে আত্মহত্যার শরণ নেয় না—নিঃসঙ্গ শূন্যে আর কিছু না পেলে, নিজের প্রতিবিম্বে প্রতিপক্ষ দেখে জীবোচিত প্রতিযোগ বহাল রাখে। বোধহয় সেই জন্যে মানবচৈতন্যের রহস্য-কথনে নেমে হেগেল্ এক আর বহুর মধ্যে প্রভেদ করেননি; এবং ঘাত-প্রতিঘাতের চক্রবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁর শিষ্য মার্ক্স্ অরক্ষণীয় কৈবল্যকে প্রগতির চূড়ান্তে ঝুলিয়েছিলেন বটে, তবু লোকত স্বার্থ আর পরমার্থের অভিন্নতায় তাঁর বিন্দু-বিসর্গ সংশয় ছিল না। আমার বিশ্বাস আধুনিক মনোবিজ্ঞান মার্ক্স্-এর অনুগামী; এবং নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের ইতিহাসে পরিণামী প্রকর্ষের পদধ্বনি শুনুন বা না শুনুন, অন্তত এ-বিষয়ে তাঁদের মতান্তর নেই যে ব্যক্তি যেকালে সমাজব্যবস্থার দাস আর সমাজব্যবস্থা ভূতপ্রকৃতির মুখাপেক্ষী, তখন নিরঞ্জন বিবেক

কবিকল্পনার পরাকাষ্ঠা, এবং নির্লিপ্ত বিবেচনা আবশ্যিক পক্ষপাতের নিমিত্ত-মাত্র।

বলা বাহুল্য যে উক্ত সিদ্ধান্তের আড়ালে সংসারযাত্রার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নিহিত নেই : বরঞ্চ তার পরেই ঊর্ধ্বশ্বাস স্বর্ণমৃগের অনুধাবন ছেড়ে সনাতন সত্য-সমূহের ধ্যান-ধারণা আমাদের আশুকৃত্য ; এবং অনেকে তাই উল্লিখিত বুদ্ধিবিভ্রাটের জন্যে আমার মতো দীর্ঘশ্বাস না ফেলে শিল্পের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শান্ত, শিব, সুন্দরের আশাপথ চেয়ে থাকেন। কিন্তু কুৎসিতের অস্তিত্ব-সঙ্কোচে ক্রোচে-প্রমুখ হেগেল্-পন্থীদের নির্বন্ধ সত্ত্বেও তাঁদের প্রতীক্ষা প্রায়ই বিফলে যায় ; অনির্বচনীয় উপাদানে তাঁরা যে-"স্প্যানিশ্ দুর্গ" গড়েন, তার উপরে কচিৎ-কদাচিৎ অনধিগম্য ভূমার ছায়া পড়ে বটে, তবু তার ভিতরে মনুষ্যধর্ম বাসা বাঁধে না, সংস্কৃতিবিনাশীরাই তাদের অস্ত্র-শস্ত্র লুকায় ; এবং যখন সে-শত্রু তাড়াবার সময় আসে, তখন মায়াপুরী তো ধূলায় মেশেই, এমনকি স্থপতির জিজীবিষাও টিঁকে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমার তুল্য নির্বিবাদীর পক্ষেও শ্রেণীবিরোধের অঙ্গীকার অনিবার্য ; এবং জন্মান্তরীণ জড়বাদের প্রকোপে আমি এক দিকে যেমন সকল মানুষের নির্বিকার সামান্যতায় আস্থাবান, তেমনই ন্যায়নিষ্ঠার খাতিরে আমি অন্য দিকে মানতে বাধ্য যে আজকের অস্বাভাবিক অধিকারভেদ যে-পর্যন্ত না ঘুচছে, তত দিন সে-মৌল সৌসাদৃশ্যের স্ফূর্তি অসম্ভব।

ফলত আজ ঐতিহ্যবিলাসী ই. এম্. ফর্স্টর সুদ্ধ সাধারণস্বত্বের দিকে ঝুঁকেছেন ; এবং তিনি দলগত স্বার্থের সংঘর্ষকে কেবল উত্তরসামরিক য়ুরোপের আধিদৈবিক ট্র্যাজেডি ব'লে চেনেননি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও হয়তো বুঝেছেন যে ট্র্যাজেডির উপসংহারে অ্যারিস্টটেলী চিত্তশুদ্ধি সুনিশ্চিত। ইতিমধ্যে কলাকুশলীর তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যে তিনি বীতশ্রদ্ধ ; কারণ রূপকারেরাও না খেয়ে বাঁচে না, এবং খাদ্যসংগ্রহ ব্যয়সাপেক্ষ, অর্থাৎ পাকে-প্রকারে বিত্তবানেরই আয়ত্তে। তৎসত্ত্বেও তাঁর মধ্যে অবশ্য সাম্য-বাদের সংস্পর্শ নেই ; এবং এ-প্রসঙ্গে ফর্স্টর-এর নাম নিয়ে আমি যে-মনোভাবের পরিচয় দিয়েছি, হয়তো এক দিন তারই সাক্ষ্যে বামাচারীরা

আমাকে দণ্ডনীয় ভাববে। কিন্তু ভারত ও স্পেনের মধ্যে সাত সমুদ্র, তেরো নদীর অন্তরাল বর্তমান জেনেও আমি নিশ্চিন্ত থাকতে অপারগ; আমি আজ মানতে অক্ষম যে পশ্চিমের শ্রেণীবিচার আর প্রাচ্যের বর্ণাশ্রমধর্ম বিষম ধাতুতে গঠিত; এবং প্রথমটার ভিত্তি যেমন অপ্রাকৃত বিসংবাদে, শেষোক্তের মূল তেমনই অতিপ্রাকৃত অধিকারভেদে।

পক্ষান্তরে শ্রমবিভাগের সুবিধা আমার কাছে সুপ্রকট; এ-কথাও আমি একাধিক বার শুনেছি যে বিশ্বের প্রাণ বৈচিত্র্য; এবং দেহাত্মবাদী পাভ্‌-লোভ্‌ যে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যেতর প্রাণীর ভিতরে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন, তা সুদ্ধ আমার অবিদিত নয়। তবে সে-পার্থক্যের গুণে উকিলের ছেলে ডাক্তারি পড়ে, অথবা বৈজ্ঞানিকের ভাই কবিতা লেখে, মানবীর গর্ভে দেবতা জন্মায় না; এবং আসলে এ-রকম নানাত্ব আমাকে নিরবধি না টানলে, আমি নিশ্চয় মানতুম না যে রুষ-দেশী মধুচক্র হুলে ভরা। অন্ততঃপক্ষে সমাজব্যবস্থায় ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় আমার অনভিপ্রেত; এবং সেই জন্যে আমি নিঃসংশয়ে বুঝি যে মানুষমাত্রেই যদি স্বকীয়তা-বিকাশের সমান সুযোগ না পায়, তাহলে অচির ভবিষ্যতে দেশে দেশে তো রক্তগঙ্গা বইবেই, এমনকি তার পরে হয়তো যোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্য লুটে খাবার লোকও আর মিলবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ-আশঙ্কাতেও শুদ্ধ শিল্পীরা বিচলিত নন: এখনও তাঁরা স্বার্থসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর; এবং উপস্থিত নিগ্রহনীতি তাঁদের একটা প্রত্যাশাও মেটাতে না পারুক, অবস্থান্তরে পাছে আত্মরতিতে আঁচড় লাগে, এই ভয়ে তাঁরা শশকবৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

অথচ লক্ষ্মীমন্তদের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা প্রায় অনন্ত: সেই অধমেরা নাকি নিছক টাকার লোভে খেটে মরে, পুত্রার্থে পত্নী খোঁজে, পরিবার-বর্গকে দুর্নীতির সংক্রাম থেকে বাঁচাতে বররুচিদের অজ্ঞাতবাসে পাঠায়; এবং সেই সঙ্গে কলাকৈবল্যের প্রবক্তারা কেবলই ভুলে যান যে রূপকারী বিবেকে বিষয়বুদ্ধির নাম-গন্ধ নেই জেনেও লোকোত্তর প্লেটো তাঁর আদর্শ গণতন্ত্রে কবিদের স্থান দিতে চাননি। উপরন্তু তিন হাজার বছর ধ'রে অনেক ঠেকে লোকনায়কেরা সম্প্রতি শিখেছেন বটে যে প্লেটোনিক্‌

তিতিক্ষা অতিশয় অনাবশ্যক, তবু আধুনিকদের নিরাসক্ত সরস্বতীপূজা স্টালিন্-হিট্লার-এরও চক্ষুশূল ; এবং উভয় পক্ষের চিরকালীন মনোমালিন্য বাণীসেবকদেরই সৃষ্টি। কারণ নিজেদের সম্বন্ধে যে-কিংবদন্তী তাঁদের নিতান্ত প্রিয়, তা এই যে কাগজ-কলম এক বার নজরে পড়লে, আত্ম-প্রকাশের প্রলোভনে তাঁরা একেবারে আত্মহারা হন ; এবং হয়তো তাঁদের কপালদোষে প্রবাদ ও প্রমিতির প্রভেদ শুধু সর্ববাদিসম্মত নয়, প্রমাদের সঙ্গেই কবিপ্রসিদ্ধির সম্পর্ক যেহেতু নিকট, তাই যদি এ-কথা মানি যে সাহিত্যিকেরা আত্মপ্রকাশের গরজেই বই লেখেন, তবে এ-অনুমানও অনস্বীকার্য যে টাকা সুদে খাটিয়ে মহাজন করে আত্মপ্রকাশের সুরাহা।

অবশ্য কর্তাব্যতিরেকে কর্ম দুর্ঘট ; এবং এই জন্যে কর্মের উপরে কর্তার স্বাক্ষর যত না স্পষ্ট, কর্মপ্রবর্তনা আর ব্যক্তিবাদের সমীকরণ ততোধিক লোভনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একদল লোক যখন একটা গোখরো সাপের তাড়ায় দিগ্বিদিকে ছোটে, তখন তাদের প্রত্যেকের চাল-চলন আপাতত আলাদা ; কিন্তু দূর থেকে তাদের চাঞ্চল্য দেখে যিনি ভাববেন যে তারা ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিশ্রমেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, তিনি হয় অন্ধ, নয় ভাষাব্যবহারে অপটু। কারণ মানুষের আচার-ব্যবহারে ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার প্রাদুর্ভাব যেমন তর্কাতীত, তেমনই শ্রুতি-স্মৃতির বশবর্তিতা প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল ; এবং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সত্য সত্যই থাকলে, সে নিশ্চয় এমন কোনও অতিমর্ত্য সত্তার অধীশ্বর যার হ্রাস-বৃদ্ধি পার্থিব প্রয়োজনের প্রভাব-মুক্ত। কিন্তু জন্মাবধি সেই রকম অদ্বয়, অব্যয় আত্মার মাহাত্ম্য-কীর্তন শুনে শুনে আমার কর্ণপটহই আজ বিদীর্ণপ্রায়, সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ পরিচয়ে আমার দর্শনেন্দ্রিয় এখনও ধন্য হয়নি ; এবং দৈনিক পত্রে পড়ি বটে যে ভূতজগতের দিগ্বিজয় সেরে বিজ্ঞান ইদানীং প্রেতলোকে অভিযান পাঠাতে ব্যস্ত, তবু দু-একজন বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে সে-দুর্ভেদ্য রাজ্যের যে-সংবাদ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি, তাতে সে-দেশবাসীর অফুরন্ত আয়ুর প্রমাণ থাক বা না থাক, অন্তত এটুকু বোঝা গেছে যে সেখানে প্রতিভার চেয়ে মতিভ্রমের আদর বেশী।

অতএব সর্পাঘাত আসন্ন জেনে আর্তেরা অমর আত্মার আশ্বাসে বুক

বাঁধতে পারে না ; এবং অন্তর্যামীর আশীর্বাদে শাশ্বত সৌন্দর্য নখদর্পণে এলেও, সৎশিল্পী লোকরঞ্জনের অভিলাষেই আলস্য ভোলে। তবে সমষ্টি-গণিতের মতে সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুপাতে দৈবদুর্বিপাক সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ; এবং পলাতকেরাও যেমন কালে-ভদ্রে অপঘাতে মরে, তেমনই মন যোগাতে গিয়ে কেউ কেউ কেবল বিরাগ জাগায়। তখন হতভাগ্যেরা অগত্যা আত্মসমাহিতি সাধতে বসে, কিংবা উচ্চকিত ঐকতানে পানবৈরী শৃগালদেরও ছাপিয়ে তারা অহরহ রটায় যে স্বকীয়তার নিষ্পেষণ চিরপ্রথার মৌরসী অভ্যাস। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস এ-রূপকথার প্রতিবাদী ; এবং মৌখিক পরিচয়ে মালার্মে-কে যতই স্বাবলম্বী লাগুক না কেন, যদি খোঁজা যায়, তবে তাঁর জীবনবৃত্তান্তেও প্রচুর বিষয়াসক্তি বেরোবে। নচেৎ আপন কাব্যকলার ব্যাখ্যায় তিনি দেশ-বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন না, নতুবা প্রতীকী কাব্যের সঙ্গে ভাগ্নারী সঙ্গীতের তুলনা হাস্যকর ঠেকত, নয়ত তাঁর জটিলতার আড়ালে হেগেলী উৎক্রান্তির কম্বুরেখা ধরা পড়ত না, ভালেরি-র স্বপ্নজীবী বাসুকিই উঁকি পাড়ত।

আসলে শিল্প আর অচৈতন্যের আদান-প্রদান বিংশ-শতকী অপবিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়, প্রাচীনেরাও বোধহয় তাকেই প্রেরণা বলতেন ; এবং লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-র সাত্ত্বিক ভাবচ্ছবির মধ্যে যৌন বিকারের সন্ধান আধুনিক কুরুচির নমুনা হোক বা না হোক, মনস্বী এলিয়ট্-ও মুক্ত কণ্ঠে মেনেছেন যে বিষয়নির্বাচন কবিদের অধিকার-বহির্ভূত। হয়তো এই জন্যে রসসৃষ্টির লক্ষণ-বিচারে তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টটল্-এর মতদ্বৈত নেই ; এবং সৎসাহিত্যের মায়ামুকুরে তিনিও ম্যাথ্যু আর্নল্ড্-এর মতো সাময়িক জীবনযাত্রার প্রতিবিম্ব দেখেন। কারণ অবচেতনার মূল তো সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত বটেই, তার অতিজটিল শাখা-প্রশাখা সুদ্ধ আহত আকাঙ্ক্ষার গুপ্তি ; এবং আকাঙ্ক্ষা এমনই একনিষ্ঠ যে অনর্থেও সে অর্থকে চায়। আড্লার-প্রমুখ ভূয়োদর্শীরা আবার প্রাক্তন প্রবৃত্তিতে বীতশ্রদ্ধ : তাঁদের মতে মানুষমাত্রেই কোনও একটা দৈহিক অভাব নিয়ে জন্মায়, যার ক্ষতিপূরণে তার সারা জীবন কাটে ; এবং সাধারণত কানা-খোঁড়াই যেহেতু এক গুণ বাড়া, তাই কবিসুলভ সংবেদনশীলতা অনেক সময়ে নাকি

অঙ্গহানির ফল। তবে সকল অভাব সমান লজ্জাকর নয়; এবং আগামী ক্লৈব্যের ভয়ে মালার্মে যেমন শূন্যবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনই বিধেয় হবির ভোক্তাকে আমরণ খুঁজেছিলেন ব'লে, বোদলেয়র অশুচি কবিতা লিখেও অবশেষে পেয়েছেন ধর্মাত্মা-উপাধি।

মহাকবিদের চেতনা হয়তো স্বভাবগুণে বিস্তীর্ণ; এবং তাই অবদমিত কামনা-বাসনার অত্যাচার তাঁদের ভাগ্যে সম্ভবত অপেক্ষাকৃত অল্প। তৎসত্ত্বেও তাঁরা পারিপার্শ্বিকের তোয়াক্কা রাখেন না, এ-রকম দাবি পোষণীয় নয়; বরং শেক্‌স্‌পীয়র-এর লেখায় তদানীন্তন ঘটনাঘটনের উল্লেখ এত বেশী যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত পরিশ্রমী পাঠকও সেখানে দিশাহারা। উপরন্তু তাঁর সনেটসমূহে যে-কবিত্বশক্তি প্রকট, তার তুলনা না থাক, সেগুলির রচয়িতা একজন উমেদার, যিনি শুধু আশু অবস্থা-পরিবর্তনের লোভে অল্প বয়সে লণ্ডনে আসেননি, এমনকি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন; এবং বহু বৎসর ধ'রে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত দর্শকদের মন যুগিয়ে যুগিয়ে শেষ কালে যখন আশানুরূপ টাকা জমাতে পেরেছিলেন, তখন গ্রামে ফিরে তিনিই উইল বানিয়ে সহধর্মিণীকে সেরা খাটখানার ভোগ-দখল থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। দান্তে-র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই; কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে প্রচলিত তত্ত্ববিদ্যাকে ছন্দে বাঁধতে বাঁধতে তিনিও ভূতপূর্ব বন্ধুদের পাঠিয়েছিলেন অক্ষয় নরকে; এবং সেই কপোলকল্পিত শোধবোধের ফলেই তাঁর অসংখ্য দৈন্যগ্রন্থির গেরো খুলেছিল।

সুতরাং নিরপেক্ষ শিল্প, তথা নিরাসক্ত সাহিত্য, আপাতত সোনার পাথরবাটি অথবা আকাশকুসুমের মতো নিরুপাখ্য সামগ্রী; এবং তাহলে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের আবেদন যুগে যুগান্তরেও ফুরায় না কেন? কিন্তু এ-ভাবে উত্থাপন করলে, প্রশ্নটার সদুত্তর পাওয়া যাবে না: তার আগে বরঞ্চ এই কথাই জিজ্ঞাস্য যে শেক্‌স্‌পীয়র-এর অনুপূর্ব গুণগ্রাহীদের মধ্যে মিল কোথায় ও কতখানি। আমার বিবেচনায় সে-মিল শুধু শেক্‌স্‌পীয়র-এর নামে আর অভিধানে যথাযোগ্য শব্দের অভাব-বশত প্রত্যেকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপরে উপভোগ-আখ্যার আরোপে; এবং তাঁর সম্বন্ধে বেন্

জন্সন্-এর অবজ্ঞা বা স্যামুয়েল্ জন্সন্-এর উন্নাসিকতাই আজ আমরা বর্জন করিনি, সুইন্‌বর্ন্-এর উচ্ছ্বাস বা সাইমন্স্-এর নার্সিসাস্-বৃত্তিও আমাদের কাছে সমান অসহ্য। আসলে এ-যুগ আজকালকার পরকলা প'রেই শেক্‌স্‌পীয়র পড়ে, তাঁর উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতরে আধুনিক সুখ-দুঃখই খোঁজে, হয়তো বোঝে 'যে ট্যুডর রাজ্যের প্রজা ন্যায়ত এলিজাবেথী সভ্যতার মুখপাত্র, তবু ভাবে যে ষোড়শ শতাব্দী যেহেতু উপস্থিত স্মৃতিরই অংশভাক্, তাই সাম্প্রতিক বিশ্ববীক্ষা-ব্যতিরেকে প্রত্নতত্ত্বেরও মর্ম-গ্রহণ অসাধ্য। আমার বিশ্বাস সাহিত্যিক অমরতার এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই; এবং বোধহয় এই জন্যে উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি এক হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক।

শিল্পীই নিশ্চয় শিল্পের জন্মদাতা; এবং শিল্পবিষয়ের নির্বাচন হেতুপ্রভব বটে, তবু মনোজগতের গতিবিধি আমাদের কাছে এখনও এত অস্পষ্ট যে সেখানে কার্য-কারণের সম্বন্ধ গোলকধাঁধার সঙ্গে তুলনীয়। তাহলেও উৎপত্তির পরে শিল্পসামগ্রী বস্তুজগতেরই অধীন; এবং অনেক দার্শনিকের মতে বস্তু যখন সকল সম্ভবপর প্রতিভাসের সমষ্টি-মাত্র, তখন কলাবিচারে বিষয় গৌণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কলাবিদের সংঘটনীয় উপলব্ধিই মুখ্য। অর্থাৎ মহাকবিদের রচনা জড়প্রকৃতির মতো; এবং আমাদের নিসর্গনিরীক্ষার দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও পৃথিবী যেমন বদ্‌লায় না, তেমনই নানা পাঠকের হৃদয়ে বিবিধ প্রতিঘাত জাগালেও, কাব্যবিশেষের স্বরূপ অবিকার থাকে। কিন্তু এ-প্রকারভেদের একটা সীমা আছে: সংসারের বৈচিত্র্য শুধুই অমেয়, একেবারে অনন্ত নয়; এবং যে-ক্ষেত্রে অনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষার গুণে একাধিক পাঠকের মতিগতি মোটের উপরে এক রকম, সেখানে তাদের রসবোধও প্রায় অভিন্ন। সুতরাং প্রগতিসেবীরা সুদ্ধ মানবেন যে শেক্‌স্‌পীয়র-সম্পর্কে ল্যাম্ব্-এর ভাববিলাস আজও অভাবনীয় নয়; এবং সেই কেরাণীর জীবনব্যাপী ব্যর্থতা যদি ব্র্যাড্‌লী-কে সইতে হত, তবে তিনি হয়তো শেক্‌স্‌পীয়রী নায়ক-নায়িকার তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মনে রাখতেন না, আপনাকে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেন।

উপরন্তু ধ্রুপদী কবিরাও নিজ গুণে ঐকান্তিক একদেশদর্শিতা কাটিয়ে ওঠেননি, অথবা নৈরাত্ম্য রূপের প্রাণপণ ধ্যানে অমরতার বর পাননি। পুরাকালীন জীবন স্বল্পাঙ্গ ছিল ব'লেই, তার সমগ্র উপলব্ধি তাঁদের আয়ত্তে এসেছিল ; এবং মার্ক্স্-এর ব্যাপক সিদ্ধান্ত অপ্রমাদ হোক বা না হোক, স্বয়ং ধর্মপুত্র যখন ধনুর্বেদের জোরেই দুর্বৃত্তদমন করেছিলেন, তখন সাধারণ সংসারযাত্রার সঙ্গে প্রবর্ধমান যন্ত্রশিল্পের সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রুনো আর আইনস্টাইন্ তুলনীয় ; এবং আমার মতো অবৈজ্ঞানিকের কাছে তাঁদের মূল বক্তব্য যদিচ সমার্থবাচক, তবু এ-সত্য আমিও জানি যে প্রথমোক্তের নিষ্প্রমাণ জল্পনা-কল্পনা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আকার ধরেছে দূরবীক্ষণের গুণে, নব্য গণিতের প্রসাদে, আর বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় সাবকাশ মানুষের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে। অবশ্য সাহিত্যের উপকরণ স্বভাবত নাতিবহুল ; এবং সেই জন্যে কণাদ ও প্লাঙ্ক্-এর মধ্যে যে-ব্যবধান দেখি, শেক্স্পীয়র-এর সনেট আর প্রুস্ৎ-এর "সদম্ এ গমর" তদ্দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত নয়। কিন্তু শার্ল্যস্-এর জন্ম যেহেতু অণুবীক্ষণ-আবিষ্কারের পরে, তাই তার আর মিস্টর ডব্ল্যু. এইচ্-এর পার্থক্য গ্র্যাণ্ড্ ক্যানিয়ন্ ও ফিফ্থ্ অ্যাভিনিউ-এর বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা অধিক।

অর্থাৎ মানবচৈতন্যের ধারা না বদ্লাক, তার জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে ; এবং ফলে আজকালকার সমাজ শুধু শ্রমবিভাগে বাধ্য নয়, এমনকি এণ্ট্রাপি-র প্রক্রিয়ায় পুরাতন স্থৈর্যটুকুও এখন অচিন্ত্য। সুতরাং শেক্স্পীয়র-এর যুগ দূরের কথা, টেনিসন্-এর আমলেও দেশভক্তি, প্রেম, ঈর্ষ্যা, দম্ভ ইত্যাদি নির্বিশেষ বিষয়ে যত সহজে কবিতা লেখা যেত, সাম্প্রতিকদের কলম আর তত অনায়াসে চলে না ; এবং সাবেকী বিলাসবস্তু ইদানীং যেমন নিত্যব্যবহার্য আসবাবের কোঠায় নেমেছে, তেমনই প্রাচীন কাব্যের মুখ্য উপজীব্য আবেগ আর কারও মুখে রোচে না, পাঠকমাত্রেই খোঁজে অনুভূতিবৈচিত্র্য। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মতে আবেগ অথবা ইমোশন্ অবিনশ্বর, এবং অনুভূতি অথবা ফীলিং ক্ষণভঙ্গুর ; কারণ আবেগ দেহধর্মেরই নামান্তর, এবং দেহধর্মের পরিবর্তন এত মন্থর যে তাকে অমর না বললেও, দুর্মর বলতে আপত্তি নেই। কোনও কোনও মনস্তাত্ত্বিক

আবার এখানে থামতে অনিচ্ছুক ; এবং তাঁদের বিবেচনায় আবেগের শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার নেই, একই আবেগ বহিরাশ্রয়ের তারতম্যে কদাচিৎ প্রণয়-নামে আত্মপরিচয় দেয়, কখনও বা ভয়ের আকার ধরে।

উক্ত অনুমানে যাঁদের আস্থা আছে, শেক্‌স্‌পীয়র-এর প্রবহমাণ প্রতিপত্তি, তাঁদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে না : বরং তাঁরাই বুঝবেন যে মনুষ্যপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন পর্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়র-এর মর্যাদাক্ষয় অসম্ভব ; এবং তার পরেও হয়তো হৃদয়বীণার সব তার বদ্‌লাবে না, তিনি তখনও দু-একটাতে সনাতন ঝঙ্কার জাগাবেন। কিন্তু সব কটাতে নয় ; কারণ আমার প্রগতিক বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে তাঁরা নাকি ষড়্‌রিপুর মধ্যে অন্তত অসূয়া-জয় করেছেন। সুতরাং ওথেলো দেখে তাঁদের বোধহয় আর চিত্তশুদ্ধি ঘটে না ; তাঁরা হাসতে হাসতে ট্র্যাজেডিখানাকে প্রহসনের পঙ্‌ক্তিতে ফেলেন। দুঃখের বিষয় আমি এখনও সাধনার অত উর্ধ্বে উঠিনি ; এবং তাই আমার পক্ষে অমন দাবি অমার্জনীয়। তবে আমিও হেন্‌রি জেম্‌স্‌-এর অনবদ্য উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই ভেবেছি যে কথকের "স্নবারি", তাঁর আভিজাতিক অহংকার, একটু কমলে, আমার উপভোগ নিশ্চয়ই অনেকখানি বাড়ত। জেম্‌স্‌ নিজে টুর্গেনিভ্‌-এর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছিলেন ; এবং কলাকৈবল্যের অন্যান্য পুরোধারা এ-প্রসঙ্গে কখনও একমত নন বটে, তথাচ আমার একাধিক পরিচিত "স্মোক্‌"-এর পাতা পালটাতে পালটাতে মেনেছেন যে এখানে লেখকের তথাকথিত নিরপেক্ষতা একটা ছদ্মবেশ-মাত্র, আসলে উদারনীতির প্রকাশ্য অবমাননা নিন্দনীয় জেনেই তিনি এই চাতুরীর দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা ঢাকতে চেয়েছিলেন।

বিপরীত পথে চলেন ব'লেই, বর্নার্ড্‌ শ-এর নামে লোকে ইতিমধ্যে যেমন নাক সিঁটকায়, তেমনই সুপ্রকট হিতৈষণা সত্ত্বেও ইব্‌সেন্‌ এখনও নাট্যকারদের শীর্ষস্থানীয় ; এবং কিপ্লিং-এর নিঃসন্দেহ প্রতিভা যদিচ সাম্রাজ্যবাদীদেরই আবিষ্কার, তবু অলৌকিক গজদন্তমিনারে থেকেও ফ্লোবেয়র বুভার ও পেক্যুশে-র সংক্রাম এড়াতে পারেননি। অর্থাৎ লোকরঞ্জন ও লোকশিক্ষার সীমাসন্ধি অত্যন্ত অনিশ্চিত ; এবং সাম্প্রতিক

রুচিতে সংস্কারক যতই অনাচরণীয় ঠেকুক না কেন, স্বকীয়তা যেহেতু সকল রূপকারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাই অল্প-বিস্তর বিজ্ঞাপন-ব্যতিরেকে কোনও উদীয়মান শিল্পী অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠা পাননি। বুঝি বা এই জন্যে প্রথিতযশা কবিরা সমসাময়িকদের সমালোচনায় নেমে সাধারণত শোকাবহ অবিচারের প্রশ্রয় দেন। এক রকম সিদ্ধির সাধনায় জীবন কাটিয়ে তাঁরা সচরাচর ভুলে যান যে সৌন্দর্য যখন বহুরূপী, সত্য বহুভাষী ও কল্যাণ বহুব্যবসায়ী, সেকালে মহাজনের পদানুসরণ কীর্তিকামীর প্রকৃষ্ট পন্থা নয়, গতানুগতিক রসধারার প্রণালী-পরিবর্তনেই সে সফলমনোরথ। কেননা আজকের প্রচারসাহিত্য কালকের রসসামগ্রী ; এবং মানুষ অভ্যাসের দাস হলেও, অবিকার উত্তেজনা এমনই নিদ্রাজনক যে নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-এর মত রক্ষণশীলও জ্ঞানত পিতৃ-পিতামহের ছিদ্রান্বেষে বাধ্য। কিন্তু বাঁচার জন্যেও হাসিমুখে শয্যাত্যাগ আমাদের ধাতে নেই ; তাই ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-আদির আবশ্যিক বিদ্রোহ প্রথম প্রথম ভয়াবহ লাগে ; এবং তখন আর পোপ্‌-ড্রাইডেন্‌-কে ডেকেও কাব্যবিবেচকদের ঘুম আসে না, তাঁরা সারা রাত জেগে বজ্রকণ্ঠ প্রোপ্যাগ্যাণ্ডিস্ট্‌-দের যমালয় পাঠাবার মতলব আঁটেন। সে-সময় কেউ মনে রাখে না যে একদা ঠিক উল্‌টো অপরাধেই ড্রাইডেন্‌-এর ভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনা জুটেছিল ; এবং সে-দিনে যে-এলিজাবেথী নাট্যকারেরা উক্ত নিগ্রহের উপলক্ষ যুগিয়েছিলেন, তাঁরাও সাহিত্যসেবার প্রারম্ভে স্বাধিকারপ্রমত্তদের সাধুবাদ কুড়াননি, ধ্রুবপদী আদর্শের মানহানি-ব্যপদেশে রসিকদের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। অবশ্য আত্মপ্রচার আর প্রতিধ্বনিপরায়ণতা এক নয় ; এবং স্বপ্রাধান্যের গুণ-গান যদিও বৈদগ্ধ্যসম্মত, তবু শ্রুতিধরের শিল্পসৃষ্টি নাকি অনাসৃষ্টির নামান্তর ! তবে কলাবিদ্যার ইতিহাসে এ-ধারণার সমর্থন নেই ; এবং বড় চিত্রকর যেমন রাজন্যবর্গের ছবি এঁকেও স্বাধীনতা খোয়ান না, তেমনই বড় কবি অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গে আটকে প'ড়েই মুক্তিমন্ত্রের সাড়া পান। আসলে এখানেই কলাকৌশলের সার্থকতা ; এবং অনাত্মীয়কে অঙ্গীকার করার প্রকরণ কেবল ঈস্কিলাস্‌, সফোক্লিস্‌, মলিয়ের, রাসীন্‌-প্রমুখ ধ্রুপদী লেখকদের একচেটে নয়, ডান্‌-এর মতো উৎকেন্দ্রিক কবিও তন্ময় ব্যঞ্জনাপদ্ধতিকে

ততখানি আয়ত্তে এনেই কাব্য ও ধর্মযাজনার দোটানায় অবৈকল্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

কারণ পুরাতন প্রবচনের অনুসারে রচনারীতিই ব্যক্তিস্বরূপের অভিজ্ঞানপত্র; এবং মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে জন্মায় বটে, কিন্তু সে-বৈশিষ্ট্য এতই ভৌতিক, এ-রকম গা-সওয়া যে তার অনুভব নিজের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব, অন্যের তো কথাই নেই। আত্মবেদ জাগে অসম্পৃক্ত সংসারের সংঘর্ষে; এবং যখন ঘাত-প্রতিঘাত ফুরায়, তখন ব্যক্তিত্ব মজুদ থাকলেও, শুধুই আত্মবিস্মরণ ঘটে না, এমনকি অনুকূল আবেষ্টন অনুগতকে একেবারে ভুলে যায়। সুতরাং স্বনির্বাচিত বিষয় আত্মোপলব্ধির অন্তরায় বই সহায় নয়; এবং সেই জন্যে যে-কবি প্রতিনিয়ত অন্তঃপ্রেরণার মুখাপেক্ষী, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে তিনি চারিত্র্যকেই আঁকড়ে ধরেন, আর ফলে তৎপ্রণীত সাহিত্যের স্বয়ংসিদ্ধি তো ঘোচেই, মনুষ্যোচিত স্বায়ত্তশাসনের দাবিও টিঁকে কিনা সন্দেহ। প্রকৃত পক্ষে কর্মক্ষম মানুষ অব্যাহত বিচারবুদ্ধির ধার ধারে না; সে যেহেতু জানে যে নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রায়োপবেশনের প্রকারভেদ, তাই সে হয় প্রবৃত্তির পরামর্শ শোনে, নয় অভিজ্ঞতার উপদেশ মানে; এবং আশ্চর্য এই যে এতেই যেমন তার স্বকীয়তা ফুটে ওঠে, তেমনই সে যদি স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে, তবে প্রতিকূল প্রতিবেশ পদে পদে তার বাধ সাধে।

আমার বিশ্বাস প্রাগ্‌বিপ্লব রুষ সাহিত্যই এ-সত্যের একমাত্র সাক্ষ্য নয়, বিনিদ্র সরকারের অগণ্য বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও ভারতীয় লেখকসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক পক্ষপাত আজ দেশবাসীর সুবিদিত; এবং সেই সমস্ত আইন-কানুনের আগে কলম চালিয়েও বঙ্কিম রাজদ্রোহের উদ্‌গাতা হননি, রাজভক্তিরই পরিচয় দিয়েছিলেন। অগত্যা আমরা না মেনে পারি না যে নিপট নিরাসক্তি নিতান্ত নিরর্থক; যে-সকল প্রত্যয় আমাদের ভাববিলাসের ভরণ-পোষণ ছাড়া অপর কোনও কাজে লাগে না, বোধহয় সেগুলোর সম্বন্ধেই বিবেক-বিবেচনা খাটে; এবং অন্যত্র যদি রাবণে না মারে, তাহলে আমরা নিশ্চয় রামের হাতে মরি। তবে নিজেকে অতটা পরজীবী ভাবলে, শুধু মানুষের আত্মসম্মানেই ঘা লাগে না, হয়তো

লোকযাত্রাও থেমে যায় ; এবং সেই জন্যে প্রাকৃতিক বিবর্তনে মনের মৌল অখণ্ডতা হারিয়ে আমরা এখন চৈতন্যকে মোহমুগ্ধ মমত্ববোধের আধার বানিয়েছি।.কিন্তু তাতেও আপদ চোকেনি: অনিকাম প্রতিবন্ধকের বৃদ্ধি-বশত ব্যাপার সম্প্রতি এত দূর গড়িয়েছে যে আধুনিক জড়বিজ্ঞান আর কাকতালীয়-ন্যায় ঝেড়ে ফেলে সন্তুষ্ট নয়, পদার্থবিদেরা ইদানীং এই সত্যপ্রচারে শতমুখ যে নিউটনী আপেলও মাধ্যাকর্ষণের অবশ।

তথাচ সাধ আর সাধ্যের বিবাদ এ-যাবৎ ঘোচেনি: সভ্য সমাজে আমার মতো চিরবিফল ব্যক্তি এখনও সুলভ ; এবং আমরা যেহেতু কার্যোদ্ধারেই অক্ষম, আত্মধিকৃকৃত মমূর্যার উপাসক নই, তাই আমাদের পক্ষে কৃতী পুরুষের বিদূষণই অগতির একমাত্র গতি। অবশ্য প্রথম প্রথম যোগ্যের অবমাননায় আমার লজ্জা লাগত ; এবং বয়সে আমি তখনও চল্লিশের উপান্তে পৌঁছাইনি ব'লে, ভবিষ্যতের স্তোকবাক্যে আপনাকে সহজে ভোলাতে পারতুম, নিজেকে সে-দিন বোঝাতে পারতুম যে মনোবিকলনেই য়িহুদী অদৃষ্টবাদের ছায়া পড়েনি, এমনকি মার্ক্স্-ও জন্মের গুণে অন্ধ নিয়তির অঞ্চলধারী। কিন্তু আমার অপদার্থতা এখন আর নিজের কাছেও চাপা নেই ; এবং নষ্ট সুযোগের তেরিজ ক'ষে আজ আমি মানতে বাধ্য যে আমার সাহিত্যজীবন আমারই সঙ্কল্পপ্রসূত বটে, তবু সেই অনুপকারী সঙ্কল্পের পিছনে কোনও চিন্ময় প্রেরণা ছিল না—নৈমিত্তিক সংসারের নিষ্ঠুর প্রতিযোগে দুর্বলের উচ্ছেদ অনিবার্য জেনেই আমি শিল্পশুদ্ধির আওতায় আত্মরক্ষা করেছিলুম। অতএব আজ মার্ক্স্-ও আমার বিবেচনায় যথেষ্ট জড়বাদী নন ; আমি এখন এই সিদ্ধান্তে থেমে রয়েছি যে সংস্কারমুক্তি যদিচ বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমন্ত্র, তবু মনীষা আর অনুকম্পা অভিন্নহৃদয় এবং সর্বগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী।

সম্প্রতি আর আমার তিলার্ধ সন্দেহ নেই যে রূপকার সমাজভুক্ত জীব, তার ব্যবসায় সমাজসেবার অঙ্গীভূত, যে-শক্তি সামাজিক পরিস্থিতির নিয়ন্তা, তাই সাহিত্যের প্রাণবস্তু, এবং নিরালম্ব কল্পনা নির্গুণ ব্রহ্মের চেয়েও নঙর্থক। তাহলেও আমি প্রগতিক বা সাম্যবাদী নই, একেবারে বুর্জোয়া ; এবং সেই জন্যে শ্রেণীবিরোধে আমি সকল কর্মপ্রবর্তনার উৎস খুঁজে পাই

না, বুঝি যে মানুষী অভিজ্ঞতার উৎপত্তি আরও নিম্নে, স্থূলতার সর্বশেষ স্তরে। উপরন্তু গত পঞ্চ সহস্র বৎসরে এমন সিদ্ধান্তের অনুমোদন নেই যে মনুষ্যজাতির মৌলিক স্বার্থ-সমূহ যুগে যুগে বদলায় : বরঞ্চ তার পরে এই আশাই স্বাভাবিক যে যখন বর্তমান সমাজের ডায়ালেক্‌টিক্‌ পরিবর্তন ঘটবে, তখনও মানুষ মানুষই থাকবে ; আজ যা তার মর্মে অলোড়ন জাগায়, কালও তা তাকে মাতিয়ে তুলবে। তবে তার নির্বিকার চিত্তবৃত্তিতে সত্য, শিব, সুন্দরের নির্বিকল্প নির্দেশ নেই : বিশ্বমানবিকতার চিরন্তন আশ্রয় জাতিগত অচৈতন্যের অতলে ; এবং সেখানে ডুব দিলে, কৈবল্যের সন্ধান মেলে না, পাশবিক প্রতীক, প্রাক্তন উৎকণ্ঠা, নিমজ্জিত অভিজ্ঞতার কঙ্কাল ইত্যাদির বিভীষিকা দেখে অসমসাহসিক কৌতূহলীরা সুদ্ধ চোখ বুজে দূরে পলায়, অন্যে পরে কা কথা।

[ ১৯৩৭ ]

মানুষের চরিত্রে এমন কতকগুলো বিরোধ আছে যে তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর চেষ্টাও বিড়ম্বনা; এবং হয়তো উক্ত বিসংবাদের অনুগ্রহেই কোপার্নিকাস্ যে-যুগে পৃথিবীর অহংকার ঘুচিয়ে তাকে সূর্যের আজ্ঞাচক্রে আনলেন, ঠিক সেই সময়ে মনুষ্যধর্মের আকস্মিক স্ফূর্তি ছড়িয়ে পড়ল য়ুরোপের সর্বত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুপাতে মর্ত্যলোক অণোরণীয়ান্, এ-কথা শুনেও পশ্চিমের উজ্জীবিত মানুষ বেতসীবৃত্তির পরিচয় দিলে না, ধ্রুপদী সভ্যতার দৈবানুগত্যে ফিরে গেল না; মধ্য যুগের পারলৌকিক অভিনিবেশ ঝেড়ে ফেলে, সে টেরেন্স্-এর ভাষায় হঠাৎ ব'লে উঠল, "আমি মানুষ, মনুষ্যত্বের অপকর্ষও আমার অনাত্মীয় নয়।" এই বিশ্বাসের সার্থকতা কতখানি সাহস ও স্বার্থত্যাগের অপেক্ষা রাখে, তা যিনি বোঝেন, তাঁর কাছে পশ্চিমের পরবর্তী উন্নতি আর রহস্যময় ঠেকবে না। মনুষ্যসংসারে মানুষই নিত্য, মনুষ্যসমাজে মানুষই সেব্য, মানুষিক মঙ্গলই মনুষ্যধর্মের একমাত্র লক্ষ্য—এই মহাসত্যে যে-জাতির শিল্প ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন, জীবন ও মরণ অনুপ্রাণিত, তার অভ্যুত্থান স্বভাবতই অনিবার্য। কোনও লুপ্ত অমরার গুপ্ত আকর্ষণে সে-দিগ্বিজয় দিশা হারায়নি, সেই জন্যে সারা জগৎ জেগেছিল তার শঙ্খনাদে; আকাশকুসুমে সে-জয়মাল্য গাঁথা হয়নি, তাই কৃপণ প্রকৃতিও তাকে ভেট পাঠিয়েছিল মুক্ত হস্তে; তার রাখীবন্ধনে পরমার্থ আর পুরুষার্থের চির বিবাদ মিটেছিল, কাজেই অজানার অভিসারে বেরিয়ে, বুদ্ধি বিপ্রলাপেও ভয় পায়নি।

দুর্ভাগ্যক্রমে অবিমিশ্র সিদ্ধি অশেষ স্বর্গের মতোই শুধু কবিকল্পনা:

জীবনে জন্ম-মৃত্যুর সীমাসন্ধি অনিশ্চিত; এবং শীতের পশ্চাতে বসন্ত যেমন আসে, বসন্তের পরে গ্রীষ্মসমাগম হয়তো ততোধিক ধ্রুব। বুঝি বা তাই নবজাত মনুষ্যধর্ম বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই ব্যক্তিবাদে বদ্লোল। বিশ্বমানব যদিও অতিবাস্তব, তবু সে হাওয়ার মতো: তাকে বাদ দিয়ে বাঁচা শক্ত, অথচ তার চাক্ষুষ উপলব্ধি একেবারেই অসাধ্য। কিন্তু ব্যক্তি স্পর্শনীয়: তার ধাক্কায় পথে চলা বিপদ, তার সংসর্গ সঙ্কল্প সত্ত্বেও এড়ানো দুষ্কর। উপরন্তু সে-কালটা ছিল বিশেষের অনুকূল। শূদ্র সেই সবে অন্ধকূপ ভেঙে বাইরে বেরিয়েছে; সমাজপতিদের অনুরূপ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগে সে তখনও বঞ্চিত। সুতরাং সে সম্ভবত তখনও বোঝেনি যে আলোর আশীর্বাদ গিরিশৃঙ্গেই সর্বাগ্রে পৌছালেও, পর্বতচূড়া নিরবধি অনুর্বর; সে-আলো চরিতার্থ সমভূমির সাফল্যে। কারণ যাই হোক, মানুষ সে-দিন তার অন্তরের বিশুদ্ধ শূন্যতায় ব্যক্তির পাদপীঠ-স্থাপনে বিলম্ব করেনি; এবং বোধহয় সেই জন্যে ধর্মকে বিজ্ঞানের শিকল পরাতে চেয়ে ক্রুনো প্রাণই হারালেন, স্বায়ত্তশাসনে নৈতিক নৈরাজ্যের অভিশাপ খণ্ডাতে পারলেন না। অবশ্য রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর প্রথম প্রবক্তারা নিজেদের মধ্যে দ্বিপৃষ্ঠ পশুর যথেচ্ছাচার দেখে যৎপরোনাস্তি লজ্জা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবিত খেয়ালীরা বিনয়ের প্রয়োজন সুদ্ধ মনে রাখেননি; এবং তাঁদের চরম প্রতিনিধি নীট্‌শে নিত্যনৈমিত্তিক সংসারে অতিমানুষের আতিশয্য অচল জেনে অবশেষে আশ্রয় নিলেন পাগলাগারদে।

ইতিহাসের সর্বত্র কার্য-কারণের পরম্পরা থাক বা না থাক, তার সারল্য নিশ্চয়ই কাল্পনিক; এবং সেই জন্যে আমার বলতে বাধে যে ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ রিনেসেন্স্-প্রসূত ব্যক্তিবাদের অমোঘ পরিণাম। পক্ষান্তরে উক্ত কুরুক্ষেত্র সর্বনাশেরই উপক্রমণিকা; এবং ব্যক্তি ও তার সহোদর সাম্রাজ্য সমষ্টির সঙ্গে সসম্মান সন্ধি-স্থাপনের সুযোগ এ-বারেও হেলায় হারালে, আগামী প্রলয়ে উভয়ের বিলুপ্তি এক রকম অবশ্যম্ভাবী। তবে তার মানে এমন নয় যে জনসাধারণই কাণ্ডজ্ঞানের তথা শুভবুদ্ধির রক্ষণকর্তা; এবং মহতের মর্যাদাহানি তো

আমার অনভিপ্রেত বটেই, উপরন্তু এও আমি মুক্ত কণ্ঠে মানি যে সম্মিলিত, সমবেত মানুষ বারংবার যেমন আচার-ব্যবহারের পরিচয় দেয়, তা হয়তো বুদ্ধি-বিবেচনাহীন পশুর কাছেও অপ্রত্যাশিত। কারণ দলভুক্তি ভাবুকের পক্ষে যত শক্ত, ভাবালুর পক্ষে তেমনই সহজ; এবং যেহেতু একদেশদর্শীর ঝোঁক বিচারের দিকে নয়, ব্যভিচারের দিকে, তাই তার মধ্যে আবেগ স্বভাবতই আবেশে বিকৃত। তাহলেও আমি জানি যে মহৎ মানুষও মানুষ, অমানুষ বা অতিমানুষ নয়; এবং আমার পাশে তাকে যতই গগনস্পর্শী দেখাক না কেন, তার মনুষ্যত্ব সীমাবদ্ধ, যার জন্যে মানবসমষ্টির প্রতিযোগে তার পরাজয় অনিবার্য। আসলে মহামানব বিশ্বমানবের প্রতিভূ; এবং তার সঙ্গে আগ্নেয়গিরির তুলনা চলে। তাকে প্রণালী ক'রে যে-দীপ্তি, যে-তেজ, যে-দাহ অতিভূমিতে ওঠে, সে-সমস্তই মানুষের অন্তর্ভৌম গৌরবের কণা-মাত্র; এবং সেই প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্যের বাহক যদিও আমাদের নমস্য, তার প্রতিনিধিত্বে যে-অমেয় মুক্তির প্রেরণা আছে, সে-উন্মাদনায় মাত্রাবোধের উচ্ছেদ যদিও প্রায় অপ্রতিকার্য, তথাচ এতাদৃশ দর্প কোনও মতে পোষণীয় নয় যে একজন মহামানব, এমনকি জগতের মহামানবসমবায়, বিশ্বমানবের চাইতে গরীয়ান্।

উপরের কথাগুলোয় যে-অর্থবিরোধের আভাস রয়েছে, তা হয়তো একটা উপমার সাহায্যে কাটবে। সৌর মণ্ডলে যেমন সূর্যের প্রাধান্য অনস্বীকার্য, মনুষ্যসমাজে তেমনই মহামানব নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমগ্র সৌর মণ্ডলের অনুপাতে স্বতন্ত্র সূর্য যে-কারণে গৌণ, ঠিক সেই কারণে মানবগোষ্ঠীর তুলনায় মহামানব নিকৃষ্ট। সৌর মণ্ডলকে সূর্যের চেয়ে বৃহৎ বলা সম্ভব, কেননা তাতে সূর্যের স্বকীয় গুরুত্ব বাদ পড়ে না, বরং আরও অনেক গ্রহাদির গুণাবলী তার অধিকারে আসে; এবং মানবসমষ্টি মহামানবের অগ্রগণ্য এই জন্যে যে মানবসমষ্টি মহামানবের বিয়োগে সংগঠিত নয়, মহামানব ও ক্ষুদ্র মানবের সমন্বয়ে উৎপন্ন। পক্ষান্তরে সৌর মণ্ডলের অধিপতি সূর্য ও তার তুচ্ছতম প্রজা উল্কার উপাদানে যে-মূলগত ঐক্য বর্তমান, তারই শাসনে তারা উভয়ে একটা

বিশেষ আয়তনে, একটা বিশেষ আচরণে, একটা বিশেষ অয়নে চির কাল আবদ্ধ ; এবং মহামানুষ আর মামুলী মানুষ একই ধাতুতে নির্মিত, একই প্রবর্তনায় চালিত, দু জনেরই শুরু জন্মে আর শেষ মৃত্যুতে। অবশ্য এক আর দুই, এই সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যবর্তী অফুরন্ত ভগ্নাংশক্রমের মতো জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে তারতম্যের ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই পরিধির ভিতরে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা শুধু অগণ্য, অনন্ত নয় ; এবং বৃত্তবদ্ধ ব্যোমে, তথা সুপরিমিত সংসারে, বামন ও অসুরের পার্থক্য ততটা স্বভাবসিদ্ধ নয়, যতটা স্বভাবসিদ্ধ তাদের সাদৃশ্য। উপরন্তু জ্যোতিবিজ্ঞানের উক্ত আবিষ্কার কেবল অর্থালঙ্কার হিসাবেই গ্রাহ্য নয়, অনুরূপ সামান্যীকরণ ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানের প্রসার অভাবনীয় ; এবং মনস্তত্ত্বে মন-গড়া মীমাংসার বাগাড়ম্বর কমাতে চাইলে, তাকেও জড়বিজ্ঞানের অনুগামী হতে হবে।

বলাই বাহুল্য বিজ্ঞানে আমার অজ্ঞানতা মাপতে গেলে, সুমেরুকেও মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না ; এবং বোধহয় সেই জন্যে ফরাসী রাসায়নিক স্তেফান্ লত্যুক্-এর অস্‌মোসিস্-সংক্রান্ত গবেষণার কথা শুনে আমি এত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছি। কিন্তু বিভিন্ন দ্রাবণের ইচ্ছাকৃত সংমিশ্রণে যখন এ-রকম ছত্রক, তৃণ, বীজ, পুষ্প, পত্র, প্রবাল, শঙ্খ ইত্যাদির উৎপাদন সম্ভব, যা দেখে বিশেষজ্ঞেরও ভুল ঘটে, তখন প্রাণ-রহস্যের প্রস্তাবনায় প্রণবের প্রয়োজন নেই। জীববিজ্ঞানের সমস্তটা এখনও গণিতের সাঙ্কেতিকে প্রকাশ্য নয় বটে, কিন্তু তার নিয়ম-লঙ্ঘনে মৃত্যুই অনিবার্য ; এবং প্রমাণাভাবে জীব আর জড়ের সাজাত্য আজ যদিও পোষণীয় নয়, তবু জীবনের জাড্য ও পরবশতা পুনরুক্তির অপেক্ষা রাখে না। আসলে জীববিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের অপেক্ষা অধিক রোমহর্ষক নয় ; এবং প্রথমাণু থেকে নীহারিকা পর্যন্ত জড়ের সকল আকার-প্রকার যেমন জড়বিজ্ঞানের অন্তর্গত, তেমনই এককোষী শষ্প থেকে বহুলাঙ্গ মানুষ পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক পর্যায় জীববিজ্ঞানের আজ্ঞাবাহী। তবে প্রাধান্য জড়বিজ্ঞানেরই : কারণ জীবনের সূচনা জড়বিজ্ঞানের নিয়ম না মানুক, তার বৃদ্ধি ও স্থিতি সম্পূর্ণ ভাবে সেই নিয়মের অধীন ; এবং অন্তত রসায়নবেত্তাদের বিচারে শুধু জীবযাত্রাই অভিব্যক্তির সোপানমার্গে

উদ্গত নয়, জড়জগতেও স্তরভেদের স্বাতন্ত্র্য স্বসমুখ অবৈকল্যের পৃষ্ঠ-পোষক। অবশ্য আধুনিক কণাদেরা আর এখানে থামতে প্রস্তুত নন; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে শৃঙ্খলা আনার উদ্দেশ্যে বস্তুমাত্রকে যাঁরা দ্বিবিধ বৈদ্যুতিক শক্তির যোগ-বিয়োগে গড়তে চান, তাঁরাও জানেন যে বিকীরণব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের অবকাশ নেই।

ফলত জড়ের প্রসঙ্গে বৈশেষিক মতই প্রযোজ্য; এবং অতীন্দ্রিয় পরমাণুর উত্তরঙ্গ রহস্যে গুণ যদিচ সংখ্যারই স্বত্ব আর স্বাতন্ত্র্য সমষ্টিরই ধর্ম, তবু অন্ধ নিয়তির অনিশ্চয়-বিধি সেখানেও সর্বেসর্বা। সুতরাং ব্যক্তিত্বে জড় তো জীবের প্রতিদ্বন্দ্বী বটেই, এমনকি জড় যেকালে প্রজননের দায়িত্ব-মুক্ত, তখন স্বয়ংসম্পূর্ণতাতেও সে জীবের উর্ধ্ববর্তী। অর্থাৎ ঈসপ্-এর হিতোপদেশে জীবের ভক্তি অচলা: সে জানে ঐক্যই তার সামর্থ্যের উৎস এবং বিরোধ বিনষ্টির উপলক্ষ। কারণ শুধু বংশবৃদ্ধির জন্যে সে বিপরীত জাতির ঐকান্তিক সহযোগের মুখাপেক্ষী নয়, তার পৃথক সত্তাও অদ্বৈতসিদ্ধির ফল; এবং তার সাবয়ব দেহে যেমন ভেদ-বুদ্ধির নাম-গন্ধ নেই, তার মন তেমনই ভূত-ভবিষ্যতের তীর্থসঙ্গম। আমার বিশ্বাস এই নিগূঢ় সাযুজ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব'লেই, জীবজগৎ জড়জগৎকে হার মানিয়েছে। জড় সাধ্যপক্ষে তার স্বকীয়তা বাঁচিয়ে চলে। তৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে সংহতি ঘটে; কিন্তু সে-যোজনার প্রবর্তনা আন্তরিক নয়, তার হেতু দৈবদুর্বিপাক। তাই আবার বাহির থেকে যেই বিকলনের তাগিদ আসে, সে অমনই তার আপতিক সম্বন্ধবন্ধন ঘুচিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে প্রাণের মিলন সাধিত হয় আস্রবণের আদান-প্রদানে, অস্মোসিস্-জাতীয় কোনও এক প্রক্রিয়ার আত্মবিনিময়ে। কাজেই বিচ্ছেদের বাহ্য আদেশে দুটি সংশ্লিষ্ট প্রাণকোষ তাদের সৌহার্দ্য-সূত্র ছিঁড়তে পারে না, সহমরণবরণ করে; এবং আশ-পাশের সঙ্গে এই রকম নিবিড় কুটুম্বিতা পাতাতে না পারলে, প্রাণপ্রবাহ গত পঞ্চাশ কোটি বছরে নিশ্চয়ই একাধিক বার হারিয়ে যেত।

তাহলেও প্রাণের প্ররোহ অলৌকিক নয়; এবং জীব যে বিশ্বজয়ী, এমন প্রত্যয়ে আমার জীবোচিত আত্মপ্রসাদই প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ নিরপেক্ষ

বিবেচকের কাছে জীবের পরাধীনতা তর্কাতীত; এবং ইষ্টসিদ্ধির জন্যে সে অন্য জীবেরই সাহায্য-প্রার্থী নয়, নিসর্গের লালন-ব্যতিরেকেও তার দিনপাত অসম্ভব। সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে সৃজনের প্রাগূষায় সমস্ত আকাশ জড়ের যে-নির্ভার ও নিরন্তর ব্যাপ্তিতে আচ্ছন্ন ছিল, তারই স্বাভাবিক সঙ্কোচ আজ পুঞ্জ-রূপে প্রতিভাত। জীবনের বিকাশে এই প্রাথমিক জঙ্গমতাও ধরা পড়েনি; সে চির কালই আলালের ঘরের তুলাল, পরোপকারী প্রতিবেশীর সৌজন্যকে আপন প্রভুত্বের নিশ্চিন্ত নিদর্শন ব'লে ভেবেছে। তাই কোটি কোটি বৎসর ধ'রে, সার্বত্রিক সমুদ্র যত দিন নিঃস্রোত থেকেছে, তত দিন শুক্তির নিরাপদ সৌধে ট্রাইলোবাইট্-এর ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু নিশ্চেষ্টা শেষ পর্যন্ত জড়জগতের অসহ্য লেগেছে: আস্তে আস্তে এখানে ওখানে তুটো-একটা পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তুটো-একটা নদী মহাসাগরে আলোড়ন জাগিয়েছে; এবং যুগের পর যুগ ধাক্কার উপর ধাক্কা খেয়ে কম্বু-জাতি অল্পে অল্পে বুঝেছে যে বাঁচার জন্যে অভেদ্য দেহ যথেষ্ট নয়, এমন শরীরের দরকার যা স্রোতে নুইবে, অথচ মচকাবে না। এই ঠেকে শেখাই তার মেরুদণ্ড-আবিষ্কারের মূল কথা; এবং এর মধ্যে যিনি প্রাণীর স্বাধীনতা ও প্রাণের অতিমর্ত্যতার প্রমাণ দেখবেন, তাঁর দৃষ্টি সত্যই দিব্য। জীব অবশ্যই বংশপরম্পরার মধ্যে আপন অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়; কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির উৎপীড়ন ভিন্ন সে কবে কোন্ স্বতঃপ্রণোদিত পরিণামবাদ-স্বীকার করেছে, তা অন্তত আমার জানা নেই।

উল্লিখিত পুরাবৃত্তের অন্য ব্যাখ্যাও নিশ্চয় সম্ভব; এবং আমাদের পিতামহেরা ভেবেছিলেন যে জীববিদ্যা একাধারে উদ্বর্তন ও বিবর্তনের সাক্ষ্য। কিন্তু মেরুদণ্ডের জন্মবৃত্তান্তে প্রগতির সন্ধান মিলুক বা না মিলুক, কৃকলাস-জাতির উচ্ছেদে কেবল অবনতিই ফুটে ওঠে; এবং ভূগর্ভ খুঁজে যেহেতু অনাগতের আভাস পাওয়া যায় না, অতীতের ধ্বংসাবশেষই চোখে পড়ে, তাই অন্তত ভূতত্ত্বের আলোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে অতিবৃদ্ধি প্রকৃতির অনভিপ্রেত; এবং অবর, ইতর, অপাঙ্‌ক্তেয়, অবজ্ঞেয়রাই ধরিত্রীর মাতৃস্নেহে অধিকারী। কারণ প্রাক্‌পুরাণিক

অতিকায় জন্তুদের সম্বন্ধে যা স্মরণীয়, তা বোধহয় এই যে তারা প্রত্যেকে তাদের সময়ে উন্নতির চূড়ান্তে পৌঁছেছিল ; কিন্তু বৈশিষ্ট্যের মোহ তাদের সেখানে থাকতে দেয়নি, এবং সুনির্দিষ্ট গণ্ডি পেরোতে গিয়েই তারা আজ শূন্যে মিশেছে। তাদের অগ্রজ অভ্রভেদী বনস্পতিদের ললাটলিপিতেও পাঠান্তর নেই : তারা এখন কয়লাখনির বাসিন্দা ; অথচ যে-শৈবাল, যে-শিলাবল্ক ঝড়ে ভাঙে না, রোদ্রে শুকায় না, জলে ধোয় না, জীবনের আরম্ভ থেকে অদ্যাবধি তারাই রয়েছে নির্বিকার। জীবাণুদের বেলাও এ-নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি ; এবং টিরানোসরাস্-এর প্রস্তরিত কঙ্কালে ক্ষয়ের যে-বীজ মুদ্রাঙ্কিত, আধুনিক যক্ষ্মারোগীর অস্থিতেও সেই এখনও ঘুণ ধরায়। সুতরাং প্রগতিপূজা হয়তো মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর : প্রাগ্রসরনীতির প্ররোচনায় পূর্বগামীদের শোচনীয় পরিণাম ভুললে, মনুষ্য-জাতিরও নাম-গন্ধ থাকবে না ; এবং যেখানে জাতির আস্ফালন নিষিদ্ধ, সেখানে ব্যক্তির আতিশয্য টি*ঁ*কবে না : সে যদি ভালোয় ভালোয় না মানে, তবে প্রকৃতি তাকে মেরে মেরে শেখাবে 'যে আত্মম্ভরি জীবকোষের মতো অহংসর্বস্ব ব্যক্তিও নিজের অজ্ঞাতসারেই মুমূর্ষু'।

ভূতবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ থেকে খুশিমতো দৃষ্টান্ত কুড়িয়ে, আমি মানব-স্বভাবের যে-ছবি আঁকতে বসেছি, তা নিশ্চয়ই অনেকের মনে ধরবে না ; এবং তাঁরা প্রতিবাদে বলবেন যে 'প্রাচীনেরা যেমন জড়জগতের উপরে মানুষী ভাব চাপিয়ে করুণার অপব্যবহার করেছিলেন, আমিও তেমনই মানুষকে অচেতনের পর্যায়ে নামিয়ে বিপরীত ভ্রান্তির প্রশ্রয় দিচ্ছি। অবশ্য মানুষ যে বুদ্ধিমান ও নির্বাচনক্ষম, তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু শুধু সেই জন্যে সে পশুর কুটুম্বিতা-মুক্ত নয়। কারণ নাড়ীমণ্ডলের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে একাধিক মনোবিজ্ঞানীর মতে বুদ্ধি আর সংঘটিত স্নায়ুপ্রতিক্রিয়া তুল্যমূল্য ; এবং নির্বাচনক্ষমতা যেকালে সহজাত প্রবৃত্তিরই রূপান্তর, তখন সে-শক্তি মনুষ্যেতর জীবেরও আয়ত্তে। আসলে নাড়ী-মণ্ডলের আদিম উদ্ভাবকই মানুষকে বুদ্ধির পথ দেখিয়েছিল ; এবং যে-জন্তু সর্বাগ্রে নিজের অন্ত্রকে অজীর্ণ রেখে খাদ্যপরিপাকের কৌশল শিখেছিল, সেই আমাদের উদরপূর্তির উপায় যুগিয়েছে। নির্বাচনপদ্ধতির

ইতিবৃত্ত আরও পুরাতন। সৃষ্টির প্রথম প্রাণী, প্যারামিসিয়ম্-নামক এককোষী কীটও বিপৎপ্রাপ্ত তথা ইষ্টান্বেষী : সেও শত্রুর আক্রমণ থেকে পলায়, তথা আহার্যের দিকে এগোয়; এবং তার আণুবীক্ষণিক দেহ নাড়ী-মস্তিষ্কহীন হলেও, প্রবৃত্তির প্রসাদে বঞ্চিত নয়। অতএব যদি ভাবা যায় যে আত্মরক্ষার প্রাক্তন সংস্কারই বিষাক্ত অ্যাপেন্ডিক্স্-এর অস্ত্র-চিকিৎসায় চিরক্রিয়, তবে আমাদের অহমিকা তৃপ্তি না পাক, ন্যায়নিষ্ঠার অমর্যাদা ঘটে না; এবং সংস্কারে বিবেচনার মূলানুসন্ধান বিস্ময়বোধের অন্তরায় নয় বটে, কিন্তু জড়ের চেষ্টাসংক্ষেপ হয়তো আরও আশ্চর্যজনক।

প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধি বোধির অপভ্রংশ নয়; এবং প্রজ্ঞা উপজ্ঞা আর অভিজ্ঞার সংমিশ্রণ। অবশ্য এই অপূর্ব সমাবেশ সত্যই একটা অঘটন-সংঘটন; এবং এরই জোরে মানুষ আজ পশুপতি। কারণ তার অগ্রজেরা এমন কোনও প্রণালীর খোঁজ পায়নি, যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বাদেও জীবনযাত্রা সম্ভবপর। ফলে তাদের সংসার অপচয়ে ভরা; বংশকে বংশ, জাতিকে জাতি উজাড় হয়ে গেলে, তবেই এক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা আর এক গোষ্ঠীর আয়ত্তে এসে পৌঁছাত। যোগ্যতাসঞ্চয়ের এই সর্বনাশা প্রতিযোগে মানুষ ঢুকল তার ভঙ্গুরতা নিয়ে; এবং পুরাতন প্রথায় প্রাণপাত ক'রে প্রকৃতির বরণমালা কুড়াবার সাধ যদি বা তার থেকে থাকে, সাধ্য আদৌ ছিল না। সুতরাং সে অল্প দিনে বুঝলে যে যারা বাঁচাতে চায়, তাদের প্রয়োজন পরোক্ষ বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ সঙ্কট ত'রে যাওয়ার বিদ্যা; এবং ভাষা যেকালে সেই যৌথ প্রযত্নের পরম পুরস্কার, তখন উক্ত আবিষ্কারও কোনও অনির্বচনীয় রহস্যের ধার ধারে না। অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়মোচনের জন্যেই ভাষার উৎপত্তি; এবং তার কর্তব্য প্রতিকূল পরিবেষ্টনকে সামবায়িক সাধনায় বশ মানানো। কিন্তু বাগ্‌যন্ত্রের অপপ্রয়োগ মনুষ্যসমাজে সুলভ; এবং অনাচারে পশুকে হারিয়ে আমরা প্রায়ই ঐশী প্রেরণার দোহাই দিই। উদাহরণ হিসাবে স্মরণীয় মানুষের আষ্টপ্রহরিক রিরংসা; এবং জন্তুজগতে মানুষের নিকটাত্মীয় বানরই বোধহয় একমাত্র প্রাণী, যার মৈথুন ঋতুনিরপেক্ষ। তাহলেও আঞ্জনেয়রা সরস্বতীর বরপুত্র নয়; এবং তাই কামাখ্যার আনাচে-কানাচে অনঙ্গের

ক্লিন্ন আরাধনা সেরে তারা সদরে পাশব-শব্দকে যৌন ব্যভিচারের বিশেষণ-রূপে চালাতে পারে না।

সুখের বিষয় ভাষা যেমন মানুষী আত্মপ্রবঞ্চনার প্রকরণবিশেষ, তেমনই বিশ্বসাহিত্যও তার অন্যতম অবদান; এবং আমার মত-খণ্ডনে সভ্যতাভিমানীরা সে-দিকেই তর্জনীনির্দেশ করবেন। কিন্তু গত তিন-চার হাজার বছর ধ'রে সত্য, শিব, সুন্দরের মূর্তি-নির্মাণে সে অনেক করকৌশল দেখিয়েছে বটে, তবু মানুষ হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই আজ পর্যন্ত দেহাত্ম-প্রত্যয়ের দাস; এবং যদিচ মনোবিকলনের সিদ্ধান্ত এখনও তর্ক-সাপেক্ষ, তথাচ শিল্পরচনা চির কাল অতৃপ্ত ক্ষুধার অবাস্তব অন্নই যুগিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অন্যান্য উদ্যোগের মতো সাহিত্যের মূলও দৈন্যগ্রন্থি; এবং অনটন যখন আর বাণিজ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদে মেটে না, তখনই আমরা কাব্যলক্ষ্মীর সিংহদ্বারে ধরনা দিই। ফলত আড্‌লার-প্রমুখ মনোবেত্তাদের মতে অনবদ্য, তথা অবিকল, মানুষ কল্পলোকের জীব; এবং দৈনন্দিন পৃথিবীতে যারা জন্মায়, তাদের উপকরণে যেহেতু সকল গুণের সমন্বয় একেবারে অসম্ভব, তাই মানুষমাত্রেই তার প্রাক্তন স্বভাব উৎরিয়ে আদর্শ সম্পূর্ণতার আশ্রয় চায়। কিন্তু সে-আদর্শ পরিণামবাদীর কৈবল্য নয়, বাঁচার জন্যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে যে-সদ্ভাব জীবগোষ্ঠীর প্রয়োজন, উক্ত আদর্শ তারই নামান্তর; এবং নির্দোষ ব্যক্তি সেই, যার সঙ্গে প্রতিবেশের সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতি ঘটেছে। তাহলেও এমন লোক স্বভাবতই সর্ববিধ কর্মপ্রবর্তনায় বঞ্চিত; এবং সাহিত্যসৃষ্টিও একটা সজীব প্রক্রিয়া ব'লে, সে-সাধনায় সিদ্ধি কোনও না কোনও অসংস্থিতির মুখাপেক্ষী। অতএব একের সামঞ্জস্যপদ্ধতিকে দশের গোচরে এনেই সার্থক সাহিত্য সমাজের উপকার সাধে; এবং জৈবিক প্রতিষ্ঠার প্রকার-সন্ধানে বিমুখ হলে, এই বিষয়াসক্ত সংসার থেকে তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা যে বহু পূর্বেই উঠে যেত, তা নিঃসন্দেহ।

তবে আমরা মানতে বাধ্য যে ভাষা, তথা সাহিত্য, মানুষের অন্যান্য অঙ্গবিক্ষেপের মতো যদিও একটা স্থিতিস্থাপক ভঙ্গি-মাত্র, তবু তার বর্তমান পরিণতি অত্যন্ত জটিল; এবং উদাহরণ, শাসন ও অভ্যাস—এই

তিনি দীক্ষাগুরুর পরামর্শে নবজাত শিশুর ক্ষুধিত ক্রন্দন যেমন দু দিনেই অন্নপরিবেষণের আজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়, তেমনই কামনার তাড়নে আজ আর আমরা সঙ্গিনীহরণে বেরোই না, ঘরে ব'সে প্রেমের কবিতা লিখি। কারণ অসাধ্যসাধনেই সভ্যতার সার্থকতা; এবং আমাদের চিৎপ্রকর্ষ যতই বাড়ছে, আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়া ততই ক'মে আসছে। ব্যাপার সম্প্রতি এত দূর গড়িয়েছে যে ইদানীং এমন মানুষ খুবই সুলভ যার কার্যকলাপের কোনও নৈমিত্তিক ভিত্তি নেই, যে পুঁথিজাত ভাববিলাসে কাল কাটায়, যাকে জীবনের তাগিদ আর টলাতে পারে না, কথাই মাতিয়ে তোলে। কিন্তু মদনসখার সংস্পর্শে আমাদের আদিপুরুষের দেহে একদা যে-অবস্থা জাগত, এখনও সেই মদস্রাব প্রণয়-নামে অভিহিত; এবং উক্ত গণ্ডনিঃসার আপাতত আবহের কবল এড়িয়ে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির আয়ত্তে এসেছে বটে, তথাচ তার কারণই বদলেছে, ফল রয়েছে যথাপূর্ব—নূতন পটভূমিতে অভিনব অভিনেতারা নেমেছে, নাটক আছে নির্বিকার। এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা চলে যে আবেগের প্রকারভেদ নেই, পার্থক্য শুধু তার উৎসে ও উপলক্ষে; এবং সম্ভবত সেই জন্যে কবিরা প্রেমাস্পদের মধ্যে বাছেন না, প্রত্যেককে প্রতীক বিবেচনায় সনাতন প্রেমানুভূতির চিরাচরিত লক্ষণসঙ্গীতে বারংবার বাহ্য জ্ঞান হারান।

আসলে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, ভাবনা-বেদনা, আবেগ-উদ্বেগ—এ-সমস্তের সূত্রপাত দেহে; এবং সে-সত্য অনুব্যবসায়ীদেরও সুবিদিত। অন্ততঃপক্ষে উইলিয়ম্ জেম্স্-ই প্রথম দেখান যে প্রাণী যখন ভয়াবেগ অনুভব করে, তখন তার শরীরের অবস্থান্তর গৌণ নয়, মুখ্য; এবং আমাদের হাত-পা কুঁচকে যায়, নিঃশ্বাসের বেগ বাড়ে, হৃৎস্পন্দ দ্রুত তালে চলে ব'লেই, আমরা ভয় পাই, ভয়ানুভূতির ফলে ওই বিকারগুলো নজরে আসে না। অবশ্য এই রকম কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরে দাঁড়িয়ে সংবিৎকে উড়িয়ে দেওয়ার দুরাশা হাস্যকর; কিন্তু এ-বিষয়ে বোধহয় আর মতদ্বৈত নেই যে ক্ষুধার বশে মানুষের জিহ্বায় যেমন লালা ঝরে, তেমনই অন্য সকল উত্তেজনাতেও আমাদের বিভিন্ন গণ্ড রসায়িত হয়ে ওঠে। আলঙ্কারিক রস হয়তো ওই প্রাকৃত রসেরই প্রতিরূপ; এবং

নালীহীন গণ্ডের রসসঞ্চারে আমাদের বাতবহা নাড়ীর কেন্দ্রগুলো না ভিজলে, বীরত্ব, স্নেহ, সৌন্দর্য, অধ্যাত্ম ইত্যাদির উপলব্ধি বুঝি বা অসম্ভব। অর্থাৎ মানবচৈতন্যকে দেহাতিরিক্ত ভাবা অনাবশ্যক; এবং আমার মতো চার্বাকপন্থীর কাছে চৈতন্যের সার্বভৌমত্ব ও অবিনশ্বরতা অন্য কোনও সিদ্ধান্তের সাহায্যে বোধগম্য নয়। যে-শাশ্বত সত্য, যে-সনাতন শুভ মানুষকে গত পাঁচ হাজার বৎসর ধ'রে মাতিয়েছে, মজিয়েছে, তা সম্ভবত এমন রসস্রাব যা দেহীর পক্ষে মহত্তম মঙ্গলের কারণ; এবং সে অমর, কেননা অভ্যাসে মানুষের আঙ্গিক প্রতিক্রিয়ার নিরোধ যদিও সহজ, তবু পূর্বোক্ত গণ্ডনিঃসারের অবদমন অভাবনীয়। সুতরাং চৈতন্যের বেশ-ভূষাতেই পরিবর্তন ঘটে; তার স্বরূপে বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে না; এবং উল্লিখিত রস যেহেতু রসায়নের নিত্য নিয়মে বাঁধা, তাই তার ফলাফল সকল কালে ও সকল ক্ষেত্রে সমান, আর মানবচৈতন্যের তুলামূল্য অপেক্ষাকৃত অক্ষয়।

এ-দিক থেকে দেখলে, ভাবা শক্ত যে কবি স্বর্গের চক্রান্ত; এবং আমাদের মতো অসম্পূর্ণ মানুষ হয়েও সে আমাদের তুলনায় অনেক বেশী আশুচেতন ব'লে, প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের অবিরত চেষ্টায় তার প্রণালীহীন গণ্ডগুলি নিশ্চয়ই অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে যতটুকু বা যে-রকমের অভ্যাঘাতে তার দেহে সরসতা আসে, তদপেক্ষা অধিক ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত আমাদের শরীরে হয়তো আন্দোলন জাগে না; এবং মহাকবি তিনিই, যিনি দৃশ্যমান বস্তুমাত্রের প্রচ্ছন্ন উদ্দীপনাশক্তিকে নিজের শরীরে ধ'রে, সেই দুর্বল উত্তেজনাকে অনুকূল ঘটনাচক্রের অনুগ্রহে পাঠকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দেন। এ-ক্ষেত্রে ভাষাই ঘটনাবহ; এবং ভাষা যে শুধু ধ্বনি-রূপ উচ্চণ্ড উদ্দীপকের আধার, তাই নয়, সভ্য মানুষের পক্ষে শব্দ আর বস্তু প্রায় অভেদাত্মা। সুতরাং কাব্যরচনার উপলক্ষে কোনও অলৌকিক প্রেরণা কবিকে পেয়ে বসে না, তিনি অভিধানে এমন শব্দরূপ, এমন ধ্বনিতরঙ্গ খোঁজেন যা তাঁর মৌল উদ্বোধনের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার্য; এবং কবিতা তখনই সার্থকতার পর্যায়ে ওঠে, যখন অবশ্যম্ভাবী বাক্যবিন্যাসের সংঘাতে কবির শরীরে ঈপ্সিত আবেগের

পুনরভিনয় চলতে থাকে। কারণ আবেগের ঝোঁকে কথা কইবার সময়ে মানুষের বাগ্‌যন্ত্র কতকগুলো নির্দিষ্ট আদর্শ মানে; এবং ছন্দোবদ্ধ শব্দ-শৃঙ্খলার গুণে পাঠকের কণ্ঠ যেই সে-রূপকল্পের অনুকরণ করে, অমনই তার মানস পটে ফুটে ওঠে কবির ধ্যানতন্ময় চিত্রকল্প। এখানে মনে রাখা দরকার যে চেঁচিয়ে পড়ায় আর মনে মনে পড়ায় খুব বেশী তফাৎ নেই; এবং যাঁরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই শুনেছেন যে চিন্তাকালে আমরা শুধু মস্তিষ্ককে কাজে লাগাই না, সারা শরীরে আন্দোলন তুলি।

পূর্বেই জানিয়েছি যে উদ্দীপনায় যতই তারতম্য ঘটুক, তার দৈহিক প্রতিঘাত সার্বত্রিক ও সমান; এবং সেই জন্যে কবি ও পাঠক যদিও ভিন্নধর্মী, তবু তাদের আবেগ ও অনুভূত রস মোটামুটি এক। অন্যথায় কবিতা কেন চির পরিচয়ের বিস্ময় জাগায়, কাব্যপাঠের বেলা হর্ষ, বিষাদ, উৎসাহ ইত্যাদির উপলব্ধি কেন শারীরিক হয়ে ওঠে, রসাত্মক বাক্য কেন গদ্য ভাষ্যের তোয়াক্কা রাখে না—এ-সমস্ত সমস্যার সমাধান অসাধ্য; এবং শুনেছি বটে যে যোগীর সমাধি অদ্বৈতের অনির্বচনীয় লীলাভূমি, কিন্তু সাধনার সে-স্তরে, শুধু আমার নয়, মহাকবিদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ ভাষা প্রতিবেশজয়ের পরমাস্ত্র; এবং মানুষের প্রতিবেশ যেকালে মুখ্যত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তখন অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অচিন্ত্যের দৌত্য ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এমনকি বিজ্ঞানের পারিভাষিকেও নিরুপাধিকের স্থান নেই; এবং হয়তো মর্ত্যসীমায় আবদ্ধ থাকতে সম্মত নয় ব'লেই, অর্বাচীন পদার্থবিদ্যা প্রাচীন পরাবিদ্যার মতো স্বতোবিরোধী। যে-মানুষ নিজের অস্ত্র-সম্বন্ধে অচেতন, তার কাছে চতুর্থ আয়তন খুব জোর উৎপ্রেক্ষামাত্র; এবং সমষ্টির পরি-সংখ্যানে ব্যষ্টিগত গতিবিধির ব্যাখ্যা খুঁজলে, সান্তের অনন্ত ব্যাপ্তির মতো অসম্বদ্ধ প্রলাপ অনিবার্য। অন্ততঃপক্ষে বর্তমান যুগ শব্দভেদের মন্ত্র ভুলে গেছে; এবং নিষ্কর্ষের চূড়ান্তেও আমরা যেহেতু চক্ষু-কর্ণের দাস, তাই মরমী মৌনব্রতের উদ্‌যাপন আমাদের অবগতি বাড়ায় না, অনর্থের প্রশ্রয় দেয়। অতএব আবেগ ও বাগ্‌যন্ত্রের প্রাগুক্ত আত্মীয়তা অবশ্যস্বীকার্য; এবং এমন সিদ্ধান্ত থেকেও অব্যাহতি নেই যে মানুষের কান যে-নিয়মে

একটা সুপরিমিত শব্দপর্যায়ের উপরে-নীচে বধির, মানুষের চোখ যে-নিয়মে একটা নির্দিষ্ট বর্ণস্তরের অধে-উর্ধ্বে অন্ধ, ঠিক তেমনই কোনও নিয়মেই মানুষের কণ্ঠ একটা নাতিবৃহৎ আবেগগণ্ডির বাহিরে নিষ্ক্রিয়।

অর্থাৎ কবির প্রেরণা, সাধকের উপলব্ধি, দার্শনিকের অন্তদৃষ্টি মহৎ হোক বা না হোক, তাঁদের ভাষায় কেবল ততটুকু বর্ণনীয়, যতটুকুর ভার তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সয়, অথবা যতখানির তাড়া না খেলে, তাঁদের বাগ্‌যন্ত্রের জড়তা কাটে না ; এবং তর্কের খাতিরে যদি বা মানি যে এমন সিদ্ধপুরুষ এখনও বর্তমান, যাঁর দিব্যকর্ণ গ্রহ-নক্ষত্রের নূপুরনিকণে অহর্নিশি ঝঙ্কৃত, তবু সে-দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যরচনার উপাদান যোগাবে, এ-ধারণা হাস্যকর। অবশ্য তারার নৃত্য হয়তো মদিরেক্ষণেরই উপভোগ্য ; এবং যে-জাতিস্মর শ্রুতিবোধের গুণে পিথাগোরাস্ গোলকের স্বরগ্রাম-আবিষ্কার করেছিলেন, বিবাদী সুরের সাম্প্রতিক অসঙ্গতি স্বতই তার পরিপন্থী। কিন্তু তুলনীয় অতিকথা আধুনিক সাহিত্যে বিরল নয় ; এবং আজকালকার অধিকাংশ কবিই সাহিত্যের ব্যাবহারিক ধর্মে আস্থা খুইয়ে কাব্যের কাঁধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপুল বোঝা চাপিয়েছেন। ফলে আমরা ভুলতে বসেছি যে সাহিত্যের কর্তব্য নেপথ্য অনুপ্রাণনার প্রকাশ্য প্রযোজনায় লেখকের অনুভূতি-সম্বন্ধে পাঠকের চৈতন্যকে জাগিয়ে দেওয়া ; এবং অলসস্বভাব চৈতন্য যেমন বিনা ধাক্কায় কাজে লাগতে রাজী নয়, তেমনই যখন ধাক্কা অবিরত চলে, তখন তার সাড়া পাওয়া অসম্ভব। কারণ দীর্ঘসূত্র উদ্দীপনাই অভ্যাসগঠনের অনুকূল ; এবং কলকাতার কলকোলাহলে যাঁদের কাল কেটেছে, তাঁরাই জানেন যে রাজপথের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘরে তাঁদের ঘুম ভাঙে না বটে, কিন্তু পাশের ঘরে অনুচ্চ আলাপ শোনামাত্র তাঁরা চমকে ওঠেন। সুতরাং শিল্পসৃষ্টিতে আত্যন্তিক স্বকীয়তা পণ্ড শ্রম ; এবং বৈচিত্র্যের অভাবে দর্শকের মনোযোগ যতই ঝিমিয়ে পড়ুক না কেন, যা আগা-গোড়া নূতন, তাতে শেষ পর্যন্ত সে হকচকিয়ে যায়।

উক্ত সত্য অ্যারিস্টট্‌ল্-এরও সুবিদিত ছিল ; এবং প্লেটো-পরিকল্পিত বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্তির পরিচয় মেলে না ব'লে, তিনি যদিও গুরুর প্রতিবাদ করেছিলেন, তবু ব্যক্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ্যের সন্নিপাত তাঁর দৃষ্টি

এড়ায়নি। উপরন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে সম্বন্ধ সমানধর্মীর মধ্যেই সম্ভবপর ; এবং জ্ঞান যেকালে সম্বন্ধেরই প্রকারান্তর, তখন ব্যক্তির বিশিষ্টাদ্বৈত অবগতির অতীত, তার ভিতরে যেটুকু সামান্য, আমরা শুধু সেইটুকু জানি। এ-মতে বোধহয় অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক সায় দেবেন : অন্তত অনুষঙ্গবাদীরা মানবেন যে অভূতপূর্বের অভ্যাঘাতে দেহাচার দুর্ঘট ; সে-জন্যে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার অনুমোদন অপরিহার্য। কারণ বাতবহা নাড়ীর মারফৎ বাহ্য উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছালে, মস্তিষ্ক সে-উত্তেজনাকে ভেঙে-চুরে, প্রাক্তন প্রতিক্রিয়ার খোপে খোপে সাজিয়ে ফেলে ; এবং মানুষ কর্মপ্রবর্তনার ততটাই নেয়, যতটা সেই ছকে ধরে। বাকীটা হয় উৎসন্নে যায়, নয় অবচেতন দূরদৃষ্টির যত্নে সুড়ঙ্গজাত হয়ে ভবিষ্যৎ অনুষঙ্গের গভীরতা বাড়ায় ; এবং বুঝি বা তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পসামগ্রীর বিশ্লেষণে প্রাচীন-অর্বাচীনের নিপুণ সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা একটা একাত্ম পরিবারের নামমাত্র ; এবং সে-পরিবার এখনও সনাতন পদ্ধতি কাটিয়ে উঠতে না পেরে সাবেকী ভদ্রাসনকে সদর আর অন্দরে বেঁটে রেখেছে। এখানেও সদরে যা ঘটে, তা শাশ্বত, সহজ ও সার্বজনীন ; এবং অন্দর-বাসিনীরা যথারীতি পরান্নজীবী ও অসূর্যম্পশ্য। সুতরাং প্রথম দিকটা আমাদের কর্মকৌশল শেখায়, ভিন্ন ভিন্ন আচরণের নিমিত্ত যোগায়, প্রবর্তনাসমূহের প্রকারভেদ চেনায় ; এবং দ্বিতীয় দিকটা আমাদের ভাব জাগায়, ছবি আঁকায়, স্মৃতির আহার-বিহারের ব্যবস্থা করে।

ভাষা-রূপ পরিবর্তিত প্রবর্তনাতেও ওই দ্বৈধ বিদ্যমান ; এবং প্রবীণ আলঙ্কারিকেরা শব্দের স্বভাবে লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, অভিধা প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগ এনে সম্ভবত ওই পার্থক্যেরই খবর দিয়েছেন। উদাহরণত নীল-বিশেষণটি বিবেচ্য ; এবং তার যে-অর্থ সাধারণগোচর, তা এই যে নীল রঙের বস্তু লাল বা অন্য বর্ণের বস্তু নয়। কিন্তু নীলের অন্তরঙ্গ ভাবচ্ছবি বচনাতীত : চণ্ডীদাস তাতে হয়তো দেখতেন নীল সাড়ীর আড়ালে রজকিনীর তপ্ত-কাঞ্চনকান্তি ; স্বয়ং রামীর কাছে রংটা নিশ্চয় তার জাতিব্যবসায়ের মর্যাদা পেত ; এবং আমার প্রথম পাঠ্য পুস্তকের বাঁধাই যেহেতু নীল ছিল, তাই আমি ওই বর্ণে আমার স্বর্গীয় গুরু মহাশয়ের জবাকুসুমসঙ্কাশ ভ্রূকুটি

প্রত্যক্ষ করি। বলা বাহুল্য যে এক নীল-শব্দের দ্বারা অত রকম তাৎপর্য প্রকাশ্য নয়; এবং কোনও বৈষ্ণব কবি যদি ভাষার বহিরাশ্রয়িতা ঘুচিয়ে শুধু নীল-শব্দের পুনরুক্তিতে ইষ্টসন্দর্শনের মহানন্দ লোকসমক্ষে ফোটাতে চান, তবে তাঁর সাধ মিটবে না, মুদ্রাদোষেই লোক হাসবে। কারণ বিশ্রম্ভালাপ অন্দরেই সাজে; এবং প্রিয়সম্বোধন যখন সদরে শুনি, তখন চপল শ্রোতার বাচালতা থামানো যাক বা না যাক, রসিক জনের বিরক্তি রোখা যায় না। অবশ্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অবরোধপ্রথার উচ্ছেদ অনিবার্য; এবং এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প'ড়ে, এক বক্তৃতাসভায় জ'মে, এক বাজারের ভেজাল সওদায় স্বাস্থ্য হারিয়ে, আমরা সকলে হয়তো একই ভাবনা ভাবি। সম্ভবত সেই জন্যে ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাত্যেরাও সম্প্রতি গোঁড়া হিন্দুয়ানির ধ্বজা ওড়াচ্ছেন; এবং বাঙালী মুসলমানেরা আকাশ-কুসুম কুড়াতে বেরিয়েছেন আরবমরুর কণ্টকিত অভাবে।

কিন্তু যাঁদের কাছে ইতিহাসের সাক্ষ্য একেবারে মিথ্যা নয়, অন্তত তাঁরা মানতে বাধ্য যে সংসারের নটমঞ্চে তাজ্জবব্যাপার অচল; এবং অভিজ্ঞতা ও ভাষার প্রকৃতি যতই বদ্‌লাক না কেন, সদরের বাসিন্দারা বাটনা বাটতে বসবে না, অবগুণ্ঠিতারাই পুরুষালিতে হাত পাকাবে। পক্ষান্তরে নিরুক্তে যদিও এণ্ট্রোপি-র নিয়ম খাটে, এবং কালক্রমে যদিও অভিজ্ঞতার অভিজাত কুলপ্রথায় জনতার স্থূল হস্তাবলেপ লাগে, তবু উপলব্ধিমাত্রেই সাধারণ্যে আসে না, কেবল সেই অনুভূতি বিশ্ব-মানবের আদর পায়, যা সার্বজনীন স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী। কারণ পাভ্‌লোভ্‌ পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে খাদ্যপরিবেষণের সঙ্গে কুকুরকে প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সুর শোনালে, এক দিন খাদ্য বাদ দিয়েও সেই সুরের সাহায্যে তার জিভে লালা ঝরানো সম্ভব; এবং জৈব প্রয়োজনের বিচারে মানুষ যেহেতু কুকুরের সমকক্ষ, তাই তার বেলাতেও উদ্‌বোধকপরিবর্তনের প্রকারান্তর নেই। অর্থাৎ শিক্ষার সোপানমার্গ নিশ্চিত ও নির্বিকার দেহপ্রতিক্রিয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং অবিরাম অভ্যাসে প্রাণিবিশেষের পরিচিত উদ্দীপনা বদ্‌লিয়ে, তার জায়গায় প্রায় যে-কোনও নূতন উত্তেজনার উপস্থাপন সুসাধ্য বটে, কিন্তু

সে-ব্যাপারেও তার সহজ পরাবর্তকই কর্মকর্তা। সুতরাং সঙ্গীতের প্রতি কুকুর বা মানুষের অনুরাগ আসলে স্বভাবগত নয়; নানা আওয়াজের মধ্যে তারা রাগ-রাগিণীর ঠাট তখনই চিনতে শেখে, যখন তা ছাড়া তাদের জীবনযাপন দুষ্কর।

ধরা যাক আমি পাহাড় চড়তে চড়তে পা পিছলে চলেছি নাস্তির দিকে: হঠাৎ একটা খোঁচে অবলম্বন জুটে গেল; এবং সেটাকে আঁকড়ে যেখানে ঝুলে রয়েছি, তার নীচে খাত, আর খাতে মৃত্যু। এ-অবস্থায় মৃত্যুভয় সামঞ্জস্যসিদ্ধির মুখ্য প্রবর্তনা; এবং সেই জন্যে, এখন ধারালো পাথরে আঙুল কেটে দুখানা হবার জোগাড় জেনেও, আমার বাহুপেশী নড়বে না, দেহযন্ত্র স্বজ্ঞাগুণে বুঝবে যে বর্তমানে জ্বালার প্রতিকার খোঁজা ভারসাম্যরক্ষার অন্তরায়, উপস্থিত ক্ষেত্রে ঝুলে থাকাই বলস্থিতির অদ্বিতীয় উপায়। বাঁচার গরজে আহত পেশীর অনিকাম প্রসার-সঙ্কোচ যেমন নিরুদ্ধ, তেমনই নিষিদ্ধ স্বগত ভাষার অতিবাস্তব যথেচ্ছাচার; এবং কুমীর-রূপী জীবনের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে যে-কবি কালস্রোতে ভেলা ভাসাবেন, অপঘাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই। অবশ্য আমি অবগত আছি যে ইতিপূর্বে দু-চারজন লেখক সমসাময়িকদের অবজ্ঞা কুড়িয়েও পশ্চাদ্‌গামীদের অর্ঘ্য পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বেলাও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি; এবং জীবদ্দশায় ডান্, ব্লেক্, কীট্‌স্ প্রভৃতির অমর্যাদা তাঁদের অক্ষমতার পরিচয় দেয় না, প্রমাণ করে তৎকালীন সমাজের দুর্গতি। অর্থাৎ তাঁরা মহাকবি: মানুষের চিরন্তন অভীপ্সাই তাঁদের কাব্যে উৎসারিত; এবং যে-যুগে তাঁদের জন্ম, তার কৃত্রিম আবহে প্রত্যক্ষ প্রেরণার অবকাশ ছিল না ব'লেই, তদানীন্তন পাঠক-বর্গের অনুকম্পা তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি, সে-কালের শুচিবায়ুর মধ্যে তাঁদের কালাতীত সরলতা স্বভাবতই অনুপকারী লেগেছিল।

সম্ভবত সভ্যতাই প্রাকৃত কাব্যের পরিপন্থী; এবং এমন কবির অভ্যুদয় হয়তো এখনও অবারিত কাব্যে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বিজ্ঞাপন যাঁর বিবেকে বাধে, যিনি আত্মরতির মোহ কাটিয়ে, তথা ম্যাথ্যু-আর্নল্‌ড্-এর উপদেশ শুনে, সাহিত্যকে দেখেন যুগচৈতন্যের নিকষ

হিসাবে। তাহলেও তাঁরই সমূহ বিপদ; এবং নিরাসক্ত আত্মসমর্পণে এগিয়ে তিনিই বুঝি বা মর্মে মর্মে বোঝেন যে মানুষের অনুসন্ধিৎসা আজ যেকালে অরূপ রতনের লোভে রূপসাগরে ডুবুরি নামিয়েছে, তখন ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ ভাষা সুবিধা নয়, বরঞ্চ বাধা। কারণ দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, রঞ্জনরশ্মি, ছায়াচিত্র ইত্যাদির অনুগ্রহে চৈতন্য সম্প্রতি অলক্ষ্যে দিশাহারা; এবং সে-বিমূর্ত লোকে অলঙ্কারশাস্ত্র আচরণীয় বটে, কিন্তু যেখানে জ্যামিতির প্রবেশ সুদ্ধ নিষিদ্ধ, সেখানে এমনকি ব্যাকরণও যেন কার্ডিওগ্রাম্‌-এর দিনে সহস্রমারী কবিরাজের অতি-জীবিত নাড়ীজ্ঞান। ফলত অধুনাতন কবিদের আত্মশ্লাঘা জটিল রচনার মাত্রাভেদে বাড়ে, কমে; এবং উগ্র বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার ব্যতীত শুধু পাঠকের মনোহরণ অসাধ্য নয়, শিক্ষার ব্যাপ্তিতে ও কৃষ্টির বাহুল্যে সেও ইদানীং সাহিত্যিকের মতোই অসামান্য। আগে পরমার্থের বার্তাবহ ব'লে, সুখে-দুঃখে কবিদের ডাক পড়ত; কিন্তু কাব্যের সান্ত্বনা-বাণীতে বারংবার এত ছিদ্র বেরিয়েছে যে বিপদে-আপদে আজ আমরা বিজ্ঞানের মন্দিরেই পূজা মানি। একদা সভা-সমিতির অবসরবিনোদে কবিরাই দলপতি ছিলেন; কিন্তু এখন তেমন আসর হয় উঠে গেছে, নয় তার অধিকারী রাষ্ট্রনেতা আর ব্যায়ামবীর।

অগত্যা কাব্য আজ খামখেয়ালী; কবির স্বকীয়তা এখন শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারের ভেক পরেছে; ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে সে সম্প্রতি আঁকড়ে ধরেছে হিংস্র ব্যক্তিবাদকে। অতএব আবার মনে করার সময় এসেছে যে সকল পারদর্শিতার পিছনে যে-রকম প্রাক্তন সংস্কারই উহ্য থাক না কেন, সেই ঝোঁক, সেই অধিসংক্রান্তি, সেই "অ্যাটাভিজ্‌ম্‌" মোটেই অলৌকিক নয়: অথবা তাতে যদি দৈবের প্রসাদ দেখি, তবে নিপুণ ফুটবল্‌-খেলোয়াড়ও অধরার প্রিয়পাত্র-রূপে গণ্য; এবং লেখক-পাঠকের সংবাদে মরমী আদান-প্রদানের রহস্যারোপ সম্ভব হলে, সাহিত্য-পদবাচ্য আত্মপ্রকাশ নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন, যেই তৃতীয় নয়ন খুলে চাইবে, পাঠক অমনই বুঝবে লেখকের হৃদয় কোন্‌ উপলব্ধিতে উদ্বেল। আসলে সাহিত্যসৃষ্টি, তথা সাহিত্যসম্ভোগ, অনুকূল আবেষ্টনের গুণ; এবং ভিন্ন

ভিন্ন মানুষের প্রতিবেশ যেহেতু অল্প-বিস্তর ভিন্ন, তাই কেউ লেখে কাব্য, কেউ মাতে গণিতশাস্ত্রে, কারও জিহ্বা গো-নামে রসিয়ে ওঠে, কেউ ভাবে গাভী ভগবতী। উপরন্তু ব্যক্তির মতো, যুগের পরিমণ্ডলও পরিবর্তনশীল; এবং সেই জন্যে অষ্টাদশ শতকের কবিতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছড়ার মতো শোনায়, শেক্স্‌পীয়র্‌-এর প্রহসন প'ড়ে পরীক্ষার্থীর কান্না আসে, "সং অফ্‌ সলোমন্‌"-এর আধ্যাত্মিক রূপক আধুনিকদের কামানলে ঢালে ঘৃতাহুতি। অথচ এমন অনুমান বোধহয় একেবারে অমূলক নয় যে মানুষের অধিকাংশ ভাবনা-বেদনায় শিক্ষা, সমাজ ও সময়ের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট বটে, তবু তার দেহের কতকগুলো প্রতিক্রিয়া অনাত্মস্ত, কতকগুলো প্রবৃত্তি দুর্দমনীয়, কতকগুলো অভিজ্ঞতা মজ্জাগত; এবং যে-কবি সেই সনাতন ধর্মের প্রচারক, তাঁর স্থান হয়তো কালাবর্তের কেন্দ্রে, যেখানে সর্বব্যাপী অসংস্থিতির মধ্যেও তাঁর পদযুগল অটল।

আমার বিশ্বাস এই নৈরাত্মরীতিতেই বিশ্বসাহিত্যের ঐক্যসূত্র অনুসন্ধানীয়; এবং উক্ত সর্বসম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ব'লেই, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রসঙ্গ, পদ্ধতি ও আবেদনের এতটা সৌসাদৃশ্য সম্ভবপর। কিন্তু কাব্য তথা মহত্ত্বের বিশ্লেষণে যাঁরা হেতুবাদের শরণ নিতে অনিচ্ছুক, তাঁদের মতে বুদ্ধ বা কালিদাস প্রয়োগাগারে না জন্মানো পর্যন্ত মহাপুরুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কৌতূহল কেবল নিরর্থ নয়, উপহাস্যও; এবং যখন এ-মনোভাবের অলি-গলিতে প্রবেশ করার মতো পথজ্ঞান আমার নেই, তখন আমি মানতে বাধ্য যে ভূতবিদ্যার সাহায্যে হিমালয় গড়া না গেলেও, গিরিরাজের উদ্ভব-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই প্রমাণসহ। তবে এটা ঠিক যে জড়ের বিষয়ে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি যেমন ব্যাপক, পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসৌকর্য-বশত জীবন-প্রসঙ্গে আমরা তেমন নিশ্চিত নই; এবং তৎসত্ত্বেও গবেষণালব্ধ উপায়ে আজ যেহেতু প্রাণীর লিঙ্গ বদ্‌লানো যায়, প্রণয়াসক্তির মতো নিত্য প্রবৃত্তি প্রতিলোমের আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠে, দ্রাবণজাত লতা-পাতা আসল ডাল-পালাকে লজ্জা দেয়, তাই এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে

জীববিদ্যাতেও আমাদের ব্যুৎপত্তি প্রত্যহ বাড়ছে। অন্ততঃপক্ষে আমাদের প্রাণসংক্রান্ত অনুমান যতই অসম্পূর্ণ হোক, কোথাও অযৌক্তিক নয়; এবং এ-জাতীয় প্রকল্পের পিছনে যে-মনোভাব বিদ্যমান, পদার্থবিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য আপাতত তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অবশ্য জীববিদ্যার নিঃসংশয় বিভাগে জন্তু আর উদ্‌ভিদই অবগতির প্রধান অবলম্বন; এবং মানুষের মেধা বা মনীষা সম্ভবত অতিজান্তব। কিন্তু এও মর্ত্যেরই মহিমা; এবং এর সমস্ত অন্ধি-সন্ধি এখনও আমাদের নখদর্পণে আসেনি ব'লে, একে যদি লোকোত্তর লাগে, তবে না মেনে নিস্তার নেই যে বাণের চাল-চলনও অলৌকিক। আসলে চাকা গড়িয়ে যায় স্বভাবগুণে, আর মানুষ মনস্বী ঘটনাগতিকে; এবং ঘটনাগতিকের সংজ্ঞা বেশ একটু আবছা রকমের বটে, তবু তার প্রতিকারে লীলাবাদের অবতারণা জিজ্ঞাসার আত্মহত্যা। কারণ সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি আর অনির্বচনীয়ের অস্বীকার প্রায় সমার্থবাচক; এবং রূপহীন ভাবনা ভাবনা নয়, ভাবনার ভান-মাত্র। পক্ষান্তরে সংস্কৃতির বিকাশ মহাপুরুষেরই চেষ্টা-প্রসূত; এবং সেই জন্যে উপসংহারে এ-কথার পুনরাবৃত্তি অত্যাবশ্যক যে প্রাতঃস্মরণীয়দের মর্যাদা-লাঘব বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ আমার বক্তব্য এই যে তাঁদের সঙ্গে আমার অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য না থাকলে, মনুষ্যজন্মের ধিক্কারে আমি কবে নিজেকে হারিয়ে ফেলতুম; এবং হয়তো উক্ত সাদৃশ্যের দোষেই মহাত্মারাও আমার বিচারে পরমাত্মার সমকক্ষ নন, বিধানবিকল দেহী। অর্থাৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব সংসারসীমার বাইরে দুনিরীক্ষ্য; এবং শিলাময় তটের ধাক্কাতেই প্রচেতার পরাক্রম যেমন আমাদের চোখে পড়ে, তেমনই আমরা মহাপ্রাণ ওথেলো-কে তখনই চিনি, যখন বুঝি তাঁর অধঃপাতের হেতু কত অকিঞ্চিৎকর।

[ ১৯৩২ ]

# অদ্বৈতের অত্যাচার

অধ্যাপক অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা চক্রব্যূহের মতো : তার স্বাগতে হঠকারীর নিপাত প্রায় নিশ্চিত ; এবং আমি দার্শনিক নই, এমনকি মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার পরিচয় একেবারে মৌখিক। অথচ যাঁরা ওই দুটো শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ নন, তাঁদের পক্ষে মূল্যবিচার দূরের কথা, কেবল কলাচর্চাও পণ্ড শ্রম ; এবং যথোচিত শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে আমি যেমন অ্যালেক্‌জাণ্ডর সাহেবের বহু বক্তব্য ঠিক ঠিক বুঝিনি, তেমনই তাঁর রচনারীতিতে প্রসাদগুণের অপ্রতুল আছে। সহজ বিষয়কে শক্ত ক'রে তুলতেই তিনি সিদ্ধহস্ত, দুরূহ বিষয়ের সরল ব্যাখ্যায় সচরাচর কৃতকার্য নন ; এবং ক্রোচে-র নিরুক্তি মনে রেখেও আমি আপাতত মানতে প্রস্তুত বটে যে চিন্তা যতই স্পষ্ট ও পরিণত হোক, তার অভিব্যক্তিতে অনেক সময়ে অপরিচ্ছন্নতা ঘটে, তবু জটিলতা যে তত্ত্বকথার অপরিহার্য লক্ষণ, তা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ ব্র্যাড্‌লী, জেম্‌স্‌, বের্গ্‌সন্‌, রাসেল্‌ ইত্যাদির লিপিস্বাচ্ছন্দ্যে যদি নিয়মের ব্যতিক্রমই দেখি, তাহলেও আজকালকার দর্শনসাহিত্যের উপরে অপ্রাঞ্জল-উপাধির আরোপ অন্যায় ; এবং অতগুলো সাংঘাতিক মুদ্রাদোষ আর ও-রকমের উদ্‌ভট জীববাদ সত্ত্বেও হোয়াইট্‌হেড্‌ যখন তাঁর লেখায় অমন মাধুর্য আনতে পারেন, তখন কান্তিবিদ্যার মতো অপেক্ষাকৃত সাদা-সিধা প্রসঙ্গে এ-ধরণের দুর্বোধ্যতা অমার্জনীয়।

পক্ষান্তরে অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর ভাষা-সম্বন্ধে আমার আপত্তি বিদেশীর আপত্তি ; এবং এ-রকমের আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। ইংরাজীর সঙ্গে আমি আবাল্য পরিচিত হলেও, সে-ভাষা আমার অনাত্মীয় ; এবং পাশ্চাত্ত্য

ভাবলোকে অনাহূত প্রবেশের অধিকার আমি যদিও প্রভূত পরিশ্রমে অর্জন করেছি, তবু আমার ধমনীতে প্রবাহিত ভারতীয় চিন্তার ফল্গুধারা। অর্থাৎ আমি প্রাচ্যের অতিজীবিত আদর্শের উত্তরাধিকারী; এবং তাই আমার মতো সজ্ঞান আচারবাদীর পক্ষেও আধুনিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া দুষ্কর। কারণ আমি স্বেচ্ছায় বেদান্তের ত্রিসীমানা না মাড়াই, অন্যান্য হিন্দুর ন্যায় আমার অবচেতনাও অদ্বৈতবাদের লীলাভূমি; এবং স্বভাবদোষে আমি জড়ধর্মের পক্ষপাতী বটে, কিন্তু এমন সিদ্ধান্তে আমার সমর্থন নেই যে এই বহুধাবিভক্ত জগৎপ্রপঞ্চ আসলে নানাত্বেরই নৈরাজ্য। তবে এ-ক্ষেত্রে আমার অশ্রদ্ধা নিতান্ত অকারী; এবং উক্ত নব্য দর্শনের পিছনে কেবল মুর, রাসেল্, অ্যালেক্জাণ্ডর প্রমুখ স্বনামধন্য মনীষীদের পৃষ্ঠপোষণই নেই, ফলিত বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বোধহয় ওই মতে সায় দেয়। অন্ততঃপক্ষে এখনকার সুধীসমাজে ভাববাদ আর আমল পায় না, তার আসনে চ'ড়ে বসেছে সংশয়বাদের, এমনকি শূন্যবাদের, একাধিক রূপান্তর।

দুঃখের বিষয় বৃত্তি, আচার ইত্যাদি দেহমূলক অথবা বস্তুবাচক প্রত্যয়ের সাহায্যে আমাদের কার্যসিদ্ধি সম্ভব বটে, তবু তার মিতভাষণে মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল অতৃপ্ত থাকে; এবং ব্যক্তিমাত্রের ক্রিয়াকলাপ যদি ব্যক্তিগত ধর্মেরই বহিঃপ্রকাশ হয়, তবে তত্ত্বজিজ্ঞাসার কোনও সার্থকতা মেলে না। তথ্য-সম্বন্ধে প্রথম মানুষ নিশ্চয়ই সচেতন ছিল; সেও না মেনে পারত না যে বিশ্ব বিশ্লিষ্ট ও সংসার অনেকান্ত। কিন্তু কেবল এই অভিজ্ঞতায় তার জীবনযাত্রা চলেনি; সে অবিলম্বে স্বীকার করেছিল যে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত যখন ত্যর শারীরিক জড়তা কাটে না, তখন সে আর সূর্য একটা সহজ সম্পর্কে আবদ্ধ। সেই ঐক্যবোধেই দর্শন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি; এবং তাকে বাদ দিয়ে কোনও অনুসন্ধান সফল নয়। কারণ জ্ঞান আপাতত জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার আদান-প্রদান; এবং সেই জন্যে অন্তত ভূয়োদর্শীদের বিচারে অবগতি একটা অখণ্ড গোলক, যার উভয় মেরু অন্বয়ব্যতিরেকী। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের দাবি অত সহজে মেটে না; এবং বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ বিনিময়ের সম্বন্ধ কিনা, সে-প্রসঙ্গে চোখ-কানেরও সন্দেহ আছে। তবে নানা

মুনির নানা মত মনে রেখে, মোটের উপরে এটা হয়তো বলা যায় যে ভাববাদীর বিবেচনায় জ্ঞানের প্রভাব দ্বিমুখী, আর তাঁদের বিপক্ষীয়েরা ভাবেন যে জ্ঞাতার উপরে জ্ঞানের আধিপত্য এত প্রবল যে প্রথম লোপ পেলেও, দ্বিতীয়ের অস্তিত্বে তারতম্য ঘটে না।

এ-বিবাদে কোনও এক দলে নাম লেখানো আমার মতে দুঃসাহস ; এবং যখনই তলিয়ে দেখি, তখনই ধরা পড়ে যে উভয় পক্ষের মূল প্রতিপাদ্য এক। কারণ যত ক্ষণ বোঝা না যায় যে গবেষণা সার্থক, তত ক্ষণ কেউ তাতে কাল কাটায় না ; এবং সন্ধানিমাত্রেই অন্তত এটুকু মানে যে একটা অবিনশ্বর কিছুতে পৌঁছাতে না পারলে, জ্ঞান অনাবশ্যক। এমনকি প্রত্যয় ও পদার্থের অভাবে শুধু তত্ত্বদর্শন অচল নয়, ব্যাকরণে যে-শব্দ বিশেষ্য-পদবাচ্য, তার প্রয়োজন অস্থায়ী প্রত্যক্ষের প্রতিকার-কল্পে ; এবং কাছ থেকে যে-গাছকে গগনস্পর্শী লাগে, দূরে তা বিন্দুসদৃশ। অথচ যদি আসল গাছটা বিকারবহুল হয়, তাহলে তাকে চেনা যেমন অসম্ভব, তাকে কাজে লাগানো তেমনই অসাধ্য ; এবং সেই জন্যে আমরা মানতে বাধ্য যে গাছের আকার-প্রকার বদলায় বটে, তবু তার প্রকৃতি সনাতন। সেই সনাতনকে জানাই জ্ঞান ; এবং এ-প্রশ্নের উত্তরও উক্ত জ্ঞানের দেয় যে স্বভাবত যা চিরন্তন, তার পরিবর্তন ঘটে কেন। ভাববাদীদের ধারণায় ইন্দ্রিয়বৃত্তিই অনিত্য, আত্মবুদ্ধি অমর ও অখণ্ডনীয় ; এবং এ-সিদ্ধান্তের সমর্থনে স্মরণীয় যে আমার অস্তিত্ব আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পূর্ববর্তী। অর্থাৎ আগে আমার থাকা চাই, তার পরে আমার সংবেদনা নির্ভুল কিনা বিবেচ্য ; এবং আমি আছি, না নেই, তার প্রমাণ আমারই আত্মচেতনায়।

সুতরাং অভিজ্ঞতা যে-সাক্ষ্যই দিক না কেন, গাছ কথার কথা না হলে, সেও আমার মতো স্বতোবিরোধের অবকাশ না রেখেই বিদ্যমান ; এবং চৈতন্যের প্রধান লক্ষণ যেহেতু বিপ্রলাপের অভাব, তাই সত্তা যেমন সর্ব ক্ষেত্রে চিন্ময়, তেমনই সর্ববিধ জ্ঞানই জীবাত্মা আর পরমাত্মার সমীকরণ। বলাই বাহুল্য যে এ-সিদ্ধান্তে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের অনাস্থা অপরিসীম ; এবং সে-সম্প্রদায়ের যাঁরা আত্মবিদের নিন্দুক নন, তাঁরা সুদ্ধ ভাবেন যে স্বোপলব্ধি জ্ঞানমার্গের শুরু নয়, সারা। তাঁদের বিশ্বাস যে বার্ক্‌লি-র

নির্দেশে যদি অন্যের অস্তিত্বকে আমার জানার সঙ্গে জড়াই, তবে অপরের সন্ধান তো মিলবেই না, এমনকি নিজেকেও নিশ্চয় হারিয়ে ফেলব। কারণ আমাদের আত্মজ্ঞান অনুভূতিজাত নয়, অনুমানসাপেক্ষ; এবং আমি যেখানেই যাই, যেমন ক'রেই খুঁজি, অন্তর্দর্শনে যতই পারদর্শিতা দেখাই, তবু বহির্জগতের উপদ্রব আমি কোনও মতে এড়াতে পারব না, বুঝব না কোথায় তার শেষ আর আমার আরম্ভ। ফলত তাঁদের বিশ্ববীক্ষায় এমন দাবির স্থান নেই যে আমার সত্তা অস্তিত্বমাত্রের আদর্শ; বরঞ্চ তাঁদের উপদেশেই এ-কথা অবশ্যগ্রাহ্য যে বর্তমান বহির্জগৎ আমার সত্তার একমাত্র প্রমাণ।

বহির্জগৎ না থাক, আমি আছি—এ-রকম অহমিকা শুধু অশোভন নয়, অমূলকও বটে; এবং যে-গুণের জোরে আমি অতখানি আত্মশ্লাঘায় অগ্রসর, বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সেটা নিতান্ত কাল্পনিক। কারণ আমার চৈতন্য অতিমর্ত্যের রঙ্গমঞ্চ নয়, জড়ধর্মের কর্মক্ষেত্র; এবং ভূতবিদ্যার সম্প্রসারণ আমাদের বুঝিয়েছে যে জীব কেন, জড়ও বহিরাগত প্রবর্তনায় সাড়া দিতে সক্ষম। সুতরাং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ জীব আর জড়ের মধ্যে বাছে না; এবং স্থান-কাল-ভেদে ক্যামেরার চাহনিও যখন মানুষের দৃষ্টির মতোই বদ্‌লাতে থাকে, তখন মাইণ্ড্ আর ম্যাটর্-এর দ্বন্দ্ব বোধহয় অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আপেক্ষিক সংস্করণে স্থিতিনিরূপকের পরিবর্তন যেহেতু কালপরিমাণের তারতম্য ঘটায়, তাই অনিত্য নিশ্চয়ই বিষয়ের উপাধি নয়, বিষয়ীর পদবী; এবং রাসেল্-কল্পিত "ন্যুট্রল্ স্টাফ্"-নামক মাধ্যমিক পদার্থ অনুরূপ বাদ-বিসংবাদের অন্যতম নিষ্পত্তি। তাঁর মতে জীব আর জড় উভয়ে একটা প্রাগ্‌জাগতিক ধাতুতে নির্মিত; এবং প্রাক্তন সাদৃশ্য ছিল ব'লেই, তারা জ্ঞানবন্ধনে আবার একত্র হতে পারে। আসলে জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা, কেউই নশ্বর নয়; এবং অস্থায়ী কেবল তাদের জ্ঞানবাচক সম্বন্ধ, যা অচির ঘটনার অন্যতম নিদর্শন।

উল্লিখিত মীমাংসায় পদার্থবিজ্ঞানের সায় থাক বা না থাক, তার্কিকের মন পাওয়া ভার; এবং ভাববাদের সম্পর্কে আধুনিক মানুষ যে-সংশয় অনুভব করে, তার সংক্রামে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদও ক্লিষ্ট। অর্থাৎ এখনকার

মাধ্যমিক পদার্থ আর পুরাকালের মহাচৈতন্য—এ-দুইয়ের প্রভেদ অন্তত আমার মতে শুধু আভিধানিক ; এবং প্রারম্ভে যা এক, তা পরিণামে কেন বহু—এই সনাতন সমস্যার সমাধানে লয়েড্ মর্গান্-এর মতো অভিব্যক্তি-বাদের শরণ নেওয়া মরমী মায়াবাদের চেয়ে কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ নয়। অবশ্য অ্যালেক্জাণ্ডর যে-বিবর্তের ব্যাখ্যাতা, তাতে স্বসমুখ আইন্‌ষ্টাইনী দেশ-কালের অদ্বৈত ; এবং ইচ্ছাময়ের এ-ছদ্মবেশ বিশেষ রকমে সাম্প্রতিক। তথাচ তার বিরুদ্ধে ঠিক সেই তর্ক খাটে, যার সাহায্যে লাইব্‌নিৎস্-এর স্তরবিভক্ত মহামন পরবর্তীদের কাছে অগ্রাহ্য ঠেকেছিল ; এবং তাই গর্ডিয়ান্-গ্রন্থিচ্ছেদের অনন্য উপায় বিবেচনায় চরমপন্থীরা ভজাতে চেয়েছেন যে বিশ্বের স্বতঃসিদ্ধ নানাত্ব হেতু-প্রত্যয়ের প্রতিবাদী। এখানেও রাসেল্-ই অগ্রণী ; এবং "লজিক্যাল্ অ্যাটমিজ্‌ম্"-নামে তিনি যে অণুবাদী নব্য ন্যায়ের উপদেষ্টা, তাতে বিষয় বিষয়ীর গুণ হিসাবে গণ্য নয়, প্রতিজ্ঞা পদে পদে বিশ্লিষ্ট হয়ে জাতিরূপের আধারমাত্র। তার মানে এমন নয় যে আধুনিক কণাদদের মতে জ্ঞান নিরন্বয় ; কিন্তু তাঁরা বলেন যে জ্ঞান যেকালে মানসিক ব্যাপার, তখন তার স্বাধিকার-বিস্তারে বস্তুজগতের পারমাণবিক স্বাতন্ত্র্য সামঞ্জস্যস্বীকারে বাধ্য নয়।

কাণ্ট্-এর উত্তরাধিকারীরা রটিয়েছিলেন যে জ্ঞানের অতীত যে-বস্তু, তার অস্তিত্বই নেই ; এবং সে-কথার জবাবে হাল আমলের বৈশেষিকেরা ভজান যে জ্ঞানই সঙ্কীর্ণ, যে বস্তুজগতের অনেকখানি তো আমাদের অবগতির বাইরে বটেই, এমনকি যেটুকু তার আয়ত্তে, তাও আবার স্বভাবনিষ্ঠ—অর্থাৎ আমাদের জানায় তার প্রকৃতি বদ্‌লায় না ; বরং তার সংসর্গে এসে আমরাই স্বকীয়তা হারাই। অবশ্য মূর, রাসেল্, অ্যালেক্জাণ্ডর ইত্যাদির বুদ্ধি ক্ষুরধার ; এবং তাঁদের যুক্তির ছিদ্রান্বেষণ পণ্ড শ্রম। তাহলেও ভাবা শক্ত যে তাঁদের মীমাংসাই চরম ; এবং ন্যায়ের খাতিরে যদি জ্ঞান আর অস্তিত্বের পার্থক্য আমাদের মানতেই হয়, তবে কেবল এখানে থামলে চলবে না, হিউম্-এর প্রতিধ্বনি ক'রে আমরা আরও বলতে বাধ্য যে জ্ঞানমাত্রেই মায়া, যে অবচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে চিনতে চাওয়া ধৃষ্টতা। অগত্যা সান্টিয়ানা, স্ট্রং প্রভৃতি মনীষীরা সত্তা ও

স্বরূপের অনৈক্য দেখিয়ে বাৎলেছেন যে প্রথমটি যেহেতু চির দিনই অবগতির বহির্ভূত, তাই দ্বিতীয়টির পরিকল্পনাই জ্ঞান; এবং এই ব্যবচ্ছেদে আমাদের বুদ্ধি ক্ষেপে ওঠে না। কারণ প্রত্যক্ষের পৃষ্ঠপোষণেই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ আজ এতখানি শক্তিশালী; এবং এমন অনুমান অভিজ্ঞের অস্বীকার্য যে জ্ঞানে সাধারণ্য ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অন্ততঃপক্ষে এতে তর্কের অবকাশ নেই যে ভাববাদীর পরমৈক্যের মতো বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর জাতিরূপও মানুষী অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে; এবং দুটোই যেমন কষ্টকল্পনা, তেমনই উভয় ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ তথ্যের আবছাটুকুও অবর্তমান। পক্ষান্তরে স্বরূপের সুবিধা অনেক: সে সামান্য নয়, বিশেষ; তার পরিমাণ নেই, সে সনাতন; সে যদিও সত্তায় বঞ্চিত, তবু নেতিবাচক নয়; এবং তার অস্তিত্ব স্মৃতিসঞ্চিত অতীত কালের সঙ্গে তুলনীয়—তাকে যত ক্ষণ চাওয়া যায়, সে তত ক্ষণই আমাদের মনে উপস্থিত থাকে, দরকারে-অদরকারে, সময়ে-অসময়ে, বস্তুজগতের অনুকরণে, আমাদের জ্বালায় না। অর্থাৎ স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: তার সার নেই বটে, কিন্তু আকার আছে; এবং আমাদের জ্ঞান আপাতত নিঃসার ও নির্ভার ব'লে, মাকিনী ভাবুকেরা সম্প্রতি অ্যারিস্টট্‌ল্‌-প্রবর্তিত এসেন্স্‌-এর পঙ্কোদ্ধারে ব্যস্ত। তবে গ্রীক্ মনীষার প্রাঞ্জলতা সম্ভবত কিংবদন্তী। হয়তো বা সেই জন্যে স্বরূপসংক্রান্ত ব্যাপারে অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর শিষ্যেরা যে-দুরূহতার প্রশ্রয় দিয়েছেন, ফিনমিনা আর নাউমিনা—প্রমেয় আর প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কাণ্ট্‌-ও অনুরূপ উভয়সঙ্কটে পৌঁছেছিলেন; এবং তৎসত্ত্বেও তাঁর যেহেতু সন্দেহ ছিল না যে সেখানেই তাঁর ডগ্‌ম্যাটিক্ নিদ্রার শেষ তথা বিচারবুদ্ধির উন্মেষ, তাই এ-কথা অগ্রাহ্য যে কাণ্ট-এর প্রকৃত বস্তু অবেদ্য।

এমন ধারণা আরও অসঙ্গত যে কাণ্টীয় প্রকৃতির সঙ্গে ফিনমিনা বা জৈব ধর্মের পরোক্ষ সম্বন্ধও অস্বীকৃত; এবং আধুনিকদের স্বরূপ যখন সত্তারই প্রতিভাস, তখন তাকে চেনা যেমন সত্তাকে চেনা, তেমনই তার ও সত্তার মধ্যে ন্যায়ত কোনও ব্যবধান নেই। এ-দাবি যদি সত্য হত, তবে স্বরূপ আর সত্তার পার্থক্য দেখানোর দরকার থাকত না, তবে না

বললেও চলত যে স্বরূপ-সম্বন্ধে বার্ক্লি-র মন্তব্য খাটে : আমাদের অবগতিই তাকে অস্তিত্ব দেয় ; এবং নিরবচ্ছিন্ন সত্তা আমাদের জানা-না-জানার ধার ধারে না। এমনকি সত্তাকে "হ্বাট্" অথবা সংঘটন, আর স্বরূপকে "হোয়ট্" অথবা অভিজ্ঞান-নামে অভিহিত ক'রেও তাদের ঝগড়া মেটানো সম্ভব নয়। কেননা কার্য-কারণ-বিধির কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই ; এবং তর্কশাস্ত্রে বিশ্বাসের প্রবেশ নিষিদ্ধ বটে, তবু সেই জন্যে নাউমিনা বা প্রকৃতির মামলা যাঁদের বিচারে না-মঞ্জুর, তাঁরা নিশ্চয়ই বোঝেন যে সত্তার আবদারে কান পাতা অন্যায়। আসলে কাণ্ট্ যে-উদ্দেশ্যে নাউমিনা-র শরণ নিয়েছিলেন, আজকালকার সত্তাও সেই প্রয়োজনসিদ্ধির সহায় ; এবং বর্তমানের ক্ষণবাদী স্বাতন্ত্র্যবিলাস শুধু মৌখিক, মনে মনে এ-কালও সে-কালের মতোই সর্বব্যাপী সনাতনকে আঁকড়ে আছে। অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়বোধে নির্বিকার নিত্যের সাক্ষাৎ যেহেতু দুর্ঘট, তাই রাসেল্ জ্ঞানকে বিজ্ঞানের গণ্ডিতে বাঁধতে চান ; এবং মূলগত অদ্বৈতে মানুষের বিশ্বাস এত প্রবল যে বিংশ শতকের পদার্থবিদ্ তন্মাত্রের মায়া কাটিয়ে পুনরায় সুপ্রাচীন পরমাণুবাদে পৌঁছেছেন।

কিন্তু ব্রহ্মের শূন্য সিংহাসনে পরমাণুর পদোন্নতি গণিতের পক্ষেই উপকারী, তাতে দর্শনের লাভ নেই ; এবং যেই ভাবা যায়, অমনই ধরা পড়ে যে এখানেও সেই দুর্মর নাউমিনা-ই নব কলেবরে বিরাজমান। কারণ পরমাণুর চাক্ষুষ পরিচয় যে অসম্ভব, তা সর্ববাদিসম্মত ; এবং অনিশ্চয়-বিধির তাড়নায় আজ আমরা শিখেছি যে তার সম্বন্ধে নির্বিকল্প অনুমান আমাদের অসাধ্য : নাউমিনা-র মতো তাকে বুদ্ধির খাতিরে আমরা মানতে বাধ্য বটে, কিন্তু অনুসন্ধানের পরেও তার আভাসটুকুই আমাদের জ্ঞানগোচরে আসে। অবশ্য প্রাক্কালীন প্রকৃতির সঙ্গে সাম্প্রতিক সত্তার সমীকরণে নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি রয়েছে ; এবং কাণ্ট্-এর প্রকৃতি যদিও অন্যত্র অনধিগম্য, তবু অন্তত "ক্যাটিগরিক্যাল্ ইম্প্যারেটিভ্"-এর নিয়ত নিয়ম তারই দৈববাণী। পক্ষান্তরে আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে এক বের্গ্সন্ ছাড়া আর সকলে বোধহয় সত্তাকে জ্ঞানলোকে প্রবেশাধিকার দিতে অসম্মত—এমনকি বোধির ওকালতিতেও তাঁরা নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহারে

অক্ষম ; এবং এই নির্বাসনদণ্ডে বৈজ্ঞানিকের সমর্থন না থাক, এ-কথা প্রায় অবিসংবাদিত যে ইংরাজ গণিতজ্ঞদের অধিকাংশই কান্ট্-পন্থী নন, বার্ক্লি-র শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞান-সম্বন্ধে তাঁদের আস্থা অগাধ : তাঁরা বরং অস্তিত্বকে খর্ব ক'রে জ্ঞানের প্রসার বাড়াতে পারেন, তথাচ অজ্ঞেয়কে অস্তিবাচক বলতে প্রস্তুত নন ; এবং এ-অভিমতের প্রতিষ্ঠা-কল্পে এডিংটন্ ও জীন্স্-এর নামোল্লেখ যথেষ্ট।

তাঁরা ভারতীয় মরমীদের বিশেষ প্রিয়পাত্র শুধু এই কারণে যে উভয়ের বিচারে চৈতন্য জগতের প্রথম ও প্রধান উপকরণ ; এবং উক্ত সিদ্ধান্ত এ-দেশে প্রমাণের তোয়াক্কা না রাখুক, তাতে বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষণ আছে কিনা সন্দেহ। তর্কের খাতিরে যদি মানি যে অনিশ্চয়-বিধি একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা, যে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসুবিধা ঘুচলে, অথবা আমাদের বুদ্ধি খুললে, ইলেক্ট্রন্-এর স্থিতি ও গতি, দুইই সন্ধানীর আয়ত্তে আসবে, তবু আপেক্ষিক তত্ত্বের সাক্ষ্য অকাট্য ; এবং কুজানুস্-এর সময় থেকে যাঁরাই অনুরূপ কথা বলেছেন, তাঁদের কেউ শেষ পর্যন্ত না ভেবে পারেননি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রহস্যকেন্দ্রিক। অবশ্য আইন্ষ্টাইন্ প্রকাশ্যে এ-মতের বিরুদ্ধে ; এবং তাঁর পরিকল্পিত জগতে পর্যবেক্ষণমাত্রেই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট বটে, তবু টেন্সর ক্যাল্ক্যুলাস্-এর আশীর্বাদে এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ভুল-ভ্রান্তি অতিক্রমণীয়। কেননা আজ আমরা সকলে জানি যে ভূতবিদ্যার মূলে রয়েছে কতকগুলো মাপ-জোখ, যে-জন্যে একটা নির্বিকার ঠাটের দরকার ; এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিস্তারে বোঝা গেছে যে এত দিন যে-ঠাটকে অপরিবর্তনীয় লেগেছিল, তা নিতান্তই ক্ষিতিজ। সেই নিকষে ক'ষে যে-সকল বিধানকে আমরা সার্বভৌমের পদবী দিয়েছি, সে-সমস্তের মধ্যে কোনও রকমের যাথার্থ্য নেই, আছে কেবল আমাদের কপোলকল্পিত স্বতঃসিদ্ধির পুনরুক্তি।

বিশ্বব্যাপারে নৈসর্গিক নিয়ম খাটলে, তার সাক্ষাৎ বিশেষ কাঠামোর ভিতরে প্রাপ্তব্য নয়, সে-সন্ধানের শেষ নিখিলের সব কাঠামোর বাইরে, যেখানে টেন্সর ক্যাল্ক্যুলাস্-এর সাহায্যে নিরপেক্ষ গতিবিধির আবিষ্কার

সহজ, এবং যত প্রকারের কাঠামো সম্ভবপর, সেগুলোর যোগফলে অভিব্যাপ্তির উপস্থাপন অনিবার্য। কিন্তু আমার বিবেচনায় এ-সিদ্ধান্তও ব্রুনো-প্রস্তাবিত অজ্ঞানবাদের হের-ফের ; এবং তিনি ধর্মান্ধ হোন বা না হোন, উল্লিখিত যোগফল মনুষ্যসাধ্য কিনা, তা অনিশ্চিত। অবশ্য আমি অঙ্কশাস্ত্রে আকাট মূর্খ ; এবং হয়তো তাই আমার বিশ্বাস যে অমেয় রাশির যোগসাধন অসম্ভব। যত দিন পর্যন্ত জ্যোতির্বিদেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা গণ্ডির মধ্যে ধ'রে রাখতে পেরেছিলেন, তত দিন এই সংযোজন কার্যত কারও সাধ্যে না কুলাক, কল্পনায় অনেকের পক্ষে সুকর ছিল। কিন্তু আজ যখন আমরা আকাশকে সম্প্রসারণশীল ব'লেই ক্ষান্ত নই, তার অসীমতাকেও মেনে নিতে বাধ্য, তখন প্রকৃতি বেদনীয়, এমন ঘোষণা নিরর্থক। আসলে কর্তা-কর্মের বিরোধেই অজ্ঞানবাদের উৎপত্তি ; এবং সেই জন্যে কোনও কোনও দার্শনিক ক্রিয়ার সেতুবন্ধে এই দুই বিপরীতধর্মী সংজ্ঞার ঐক্যসাধন করতে চেয়েছেন। হোয়াইট্‌হেড্-এর অবয়ববাদে বিশ্ব শুধু তত্ত্বত অবিকল নয়, তাঁর মতে বিষয় ও বিষয়ীর পৃথক্করণ আর হাত-পায়ের দ্বন্দ্ব সমান হাস্যকর ; এবং প্রকৃত পক্ষে এ-দুটোর কোনওটা স্বতন্ত্র নয়, উভয়ে "প্রীহেন্‌শন্"-নামক পরিগ্রহণব্যাপারের দুটো অঙ্গ।

বিদ্যুন্ময়গুলের যেমন দুটো ধ্রুব থাকে, যার একটা সংযোগী আর অন্যটা বিয়োগী, তেমনই অখণ্ড অভিজ্ঞতা দ্বিরানন, একাধারে কর্তাসূচক ও কর্মবাচক ; এবং বর্তমানে সঙ্গত ভূত ও ভবিষ্যতের মতো এই মুখদ্বয় বা স্তরযুগল অন্যোন্যপ্রবিষ্ট। নচেৎ কর্তাসর্বস্ব জ্ঞানের সাহায্যেও আমরা পরমার্থ সত্যের সন্ধান পেতুম না ; এবং অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর "কম্‌প্রেজেন্‌স্" বা সমবর্তিতা অনুরূপ ব্যবস্থারই অন্তর্গত। তবে এ-কথার অর্থ এমন নয় যে অ্যালেক্‌জাণ্ডর বের্গ্‌সন্-এর মতো অতীন্দ্রিয়বাদী ; বরং তিনি যে-অনুস্মৃতির প্রচারক, তার নিকটাত্মীয় মনোবিজ্ঞানী পিয়েরঁ-র "প্যারালেল্ থিওরী," যাতে শরীর ও মন স্বাধীন, অথচ সহচর ও সমান্তরাল। কিন্তু সেখানেও কার্য-কারণের হাঙ্গামা এড়াবার চেষ্টা কাকতালীয়-ন্যায়ের প্রশ্রয়ী ; এবং ভূয়োদর্শীর অনুমোদন সত্ত্বেও পিয়েরঁ-র অনুমান যখন এ-যাবৎ অপ্রমেয়, তখন অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর সঙ্গে আমরা মানতে বাধ্য নই

যে ধ্যান বা "কণ্টেম্‌প্লেশন্‌" আর উপভোগ বা "এঞ্জয়্‌মেণ্ট্‌" সমকালীন। সত্য বলতে কী, যদি এক বার স্বীকার করা যায় যে বিষয় ধ্যেয় আর ধ্যান উপভোগ্য, এবং ওই ক্রিয়াদ্বয় একই কর্তার মধ্যে একত্রে সম্পাদ্য, তাহলে বৈদান্তিকের তত্ত্বমসি-মন্ত্রও যথার্থ তথা তাৎপর্যপূর্ণ ; এবং বিষয়ী যেহেতু স্বেচ্ছায় নিজের মধ্যে ব্যবধান এনে কর্তা ও কর্মের জন্ম দেয়, তাই জ্ঞানমাত্রেই আত্মজ্ঞান, অভিজ্ঞতামাত্রেই মদনুভূতি।

যুক্তির রাজ্যে বিষয় ও বিষয়ীর মর্যাদা সমান ; এবং সেখানে অঙ্গচ্ছেদের সাহায্যে আত্মহত্যার অধিকার কেবল বিষয়েরই থাকতে পারে না, বিষয়ীর অনুরূপ দাবিও অবশ্যমান্য। অর্থাৎ অন্বীক্ষা সাম্যবাদী ; এবং অপক্ষপাতীর কাছে বিষয়াশ্রিত বস্তুস্বাতন্ত্র্য আর বিষয়িনির্দিষ্ট সোহংবাদ তুল্যমূল্য। পক্ষান্তরে পরমার্থই দর্শনানুশীলনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, অনেক নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্যার সমাধানও দর্শনের মুখাপেক্ষী ; এবং ভক্তির অন্ধকারে যাকে দুষ্প্রবেশ্য লাগে, যুক্তির আলোকপাতে বোঝা যায় যে তা রহস্যই নয়। অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর "কম্‌প্রেজেন্‌স্‌" এই রকম একটা লৌকিক প্রত্যয় ; এবং ন্যায়বিচারে তার ব্যাপক দাবি অগ্রাহ্য বটে, তবু এই তাৎকাল্যের নিষ্পত্তি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। কারণ সমবর্তিতার মধ্যে কোনও নিগূঢ় অর্থ না খুঁজলে, ওই শব্দের অর্থ শুধু এই দাঁড়ায় যে দেহ আর মন অন্যোন্যনির্ভর ; এবং জীবলোকের এই দুটো স্তর যখন ক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত, তখন ক্রিয়ার সম্বিপূজাতেই আমাদের ইষ্টসিদ্ধি সম্ভব। বস্তুজগৎ আসলে আছে কিনা, এবং যদি থাকে, তবে তার উপাদান এক, না একাধিক, এ-সমস্ত কূট তর্কের দায় পেশাদার দার্শনিকদের কাঁধে চাপিয়ে, আমরা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়িয়ে অন্তত এ-কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে মানুষের চিৎশক্তিও শরীরধর্মী।

আমাদের দুঃখবোধ, ভয় ইত্যাদি মানসিক ব্যাপার যে মুখ্যত দেহঘটিত, তা উইলিয়ম্‌ জেম্‌স্‌ বহু দিন আগেই বিশদ ভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন ; এবং এখনকার মনস্তত্ত্ব বিবিধ পরীক্ষার ফলে প্রায় নিঃসংশয় যে তথাকথিত বিশুদ্ধ চিন্তা একটা যেমন-তেমন কায়িক ক্রিয়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে। উপরন্তু এ-সিদ্ধান্ত নব্য বিজ্ঞানেরই বুজরুকি নয় ; এবং পাভ্‌লোভ্‌ বা

ওয়াট্‌সন্ এ-সত্যের প্রবক্তামাত্র, এর আবিষ্কারক লক্, স্থূল বুদ্ধির আদি পুরোহিত লক্। বোধহয় তিনিই সর্বপ্রথমে বলেছিলেন, "একটু ভাবলেই, ধরা পড়বে প্রত্যেক সংবেদনা নিসর্গের যে-ছবি আমাদের উপহার দেয়, তাতে শারীরিক ও মানসিক, উভয় অংশই সমান অনুপাতে বর্তমান। যখন চোখ বা কানের সাহায্যে আমি বুঝি যে আমার বাইরে কোনও একজন দেহী উপস্থিত আছে, এবং সেই দেহীই আমার সংবেদনার বস্তু, তখন সঙ্গে সঙ্গে এটা আমি আরও নিঃসন্দেহে জানি যে আমার অভ্যন্তরীণ আত্মিক সত্তাই এই দৃষ্টি-শ্রুতির কর্তা।" লক্ দেহের পদমর্যাদা বাড়িয়েছিলেন দেকার্ত্-এর মনোবাদ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে; এবং আধুনিক কালের কোনও পাশ্চাত্ত্য ভাবুক আপাতত সে-সূক্ষ্মদর্শী ফরাসীর পদাঙ্কে চলতে প্রস্তুত নন। এখনকার প্রকাশ্য পক্ষপাত বস্তুর দিকে; এবং তাই আমি মনে করি যে আজ মনের মামলায় প্রধান সাক্ষ্য লক্-এর শুভবুদ্ধি।

শরীরের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু মনের বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে; এবং আমার বিবেচনায় সাম্প্রতিক দর্শনের বাগ্‌বিস্তারে একমাত্র অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর সমকাল-প্রত্যয় এ-জিজ্ঞাসার সদুত্তর। অন্ততঃপক্ষে গুণের ব্যাখ্যা আত্যন্তিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের অসাধ্য; এবং যদি মানি যে আমের রং আর আকার ভোক্তানিরপেক্ষ, তবু তার মিষ্টত্ব নিশ্চয়ই খাদকের মুখাপেক্ষী। উপরন্তু যখন মিষ্টত্বই এতখানি পরাশ্রিত, তখন সৌন্দর্য ইত্যাদি মনুষ্যপ্রভব গুণাবলীর স্বাধিকার নিশ্চয়ই অস্বীকার্য; এবং সেই জন্যে ভাববাদীরা নির্ভাবনায় এ-সমস্তকে পরমার্থের পর্যায়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ অধ্যাত্মদর্শনে সত্য, শ্রেয় ও সৌন্দর্যের কোনও সাংসারিক সংজ্ঞা নেই, প্রত্যেকটা সচ্চিদানন্দের বিভক্তি; এবং পরম পুরুষের অন্তঃপ্রবেশে প্রতি বস্তু শুধু নিরুপাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, পরমাত্মার অংশভাক্ ব'লেই, যা কিছু বিদ্যমান, তা একাধারে স্বয়ংসিদ্ধ ও সত্য, শিব, সুন্দর। কিন্তু এ-সিদ্ধান্তে মূল্যনির্ধারণ যুক্তি-তর্কের তোয়াক্কা রাখে না, সাধারণের সংক্রাম কাটিয়ে মূল ছড়ায় মরমী অনুভূতির অনির্বচনীয় অলোকে; এবং লোকায়তিকেরা অগত্যা সৌন্দর্য প্রভৃতির লোকোত্তর ব্যাখ্যায় অসম্মত। কারণ তাঁদের বিবেচনায় মূল্য মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়; এবং

আমাদের প্রয়োজন যেহেতু যুগে যুগে বদলাচ্ছে, তাই দায়ে প'ড়ে আজ যাকে সুন্দর লাগে, কাল, দায়মুক্তির পরে, তাকেই আবার কুৎসিত ঠেকবে।

ইষ্টানিষ্টও আগাগোড়া ব্যাবহারিক ; সনাতন সত্য কেবল কথার কথা ; এবং যা লৌকিক, তাকে জাগতিক ব্যাপারের মর্যাদা দিলে, অনেক সমস্যার সমাধান অনাবশ্যক বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসু মানুষের তৃপ্তিসাধনও অসম্ভব। পক্ষান্তরে উক্ত সুবিধাবাদের প্রতিবাদে এমন ঘোষণা কৌতূহলীর সমর্থন পাবে না যে মূল্যমাত্রেই পুরোপুরি ব্যক্তিগত ; এবং যদি ভাবি যে সুন্দর সর্বময়, তাহলে তার স্বভাবধর্ম যেমন অনির্ণেয় থাকতে বাধ্য, তেমনই তার আর কোনও দিক দৃক্‌পাতে না এনে যাঁরা কেবল তার ঐকান্তিক দিকটা খুঁজে বেড়ান, তাঁদের কাছে তার আবেদন কিংবদন্তী, তার ক্রমবিকাশ অচিন্তনীয়, তার উপকরণ অনাবিষ্কার্য। অতএব কান্তিবিদ্যায় মধ্যপন্থা ছাড়া গত্যন্তর নেই ; এবং বর্তমান আলোচনায় রূপজ্ঞদের অভ্যস্ত একদেশদর্শিতা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে অ্যালেক্‌জাণ্ডর আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। উপরন্তু তিনি যে-মাধ্যমিক মতের প্রচারক, তার সঙ্গে প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্‌ বা প্রয়োগবাদের কোনও সহজ সম্পর্ক নেই ; এবং অ্যালেক্‌জাণ্ডর সৌন্দর্যকে অস্তিত্বের অবিভাজ্য অংশ বলতে অনিচ্ছুক বটে, কিন্তু লোকায়তিকদের এ-বিশ্বাসেও তাঁর সম্মতি নেই যে বিশ্বসৃষ্টির সুষমা মানবমস্তিষ্কের নিঃসার কল্পনা। আচারশাস্ত্রের মার্ক্‌সীয় ব্যাখ্যায় তিনি অগত্যা আস্থাহারা ; এবং তাঁর বিচারে জগৎ নানাত্বের পরিচায়ক না হোক, আমাদের অবগতি যেহেতু কর্তা আর কর্ম, এই দুই সুনির্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত, তাই তিনি না ভেবে পারেন না যে সত্য, শ্রেয় ও সুন্দর বিষয় ও বিষয়ীর ঘাত-প্রতিঘাতের যোগফল।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর নিষ্পত্তি অর্ঘ্যনিরূপণে জনমতের পরাক্রমকে খর্ব করে না ; এবং এই ব্যাপারে রুচিবাগীশদের আত্মনিয়োগ, তথা তাঁদের পদাঙ্কে মামুলী মানুষের গড্ডলিকাযাত্রা, মনে রেখে তিনি মূল্য-শব্দের যে সার্বভৌম ও স্থিতিশীল অর্থে পৌঁছেছেন, তা যদিও বহু দর্শনের সংমিশ্রণে শবল, তবু বিবিধ প্রকারে প্রামাণিক। অন্ততঃপক্ষে

সৌন্দর্যের অভিব্যাপ্তি তাঁর নন্দনতত্ত্বে স্বতঃসিদ্ধের সমান, অথচ তাই ব'লে তা নিসর্গজাত নয়। কারণ তার উৎপত্তি দ্রষ্টার মানসে ; এবং তথাকথিত স্বভাবসুন্দর বস্তু বস্তুত সুন্দর নয়, শুধু প্রীতিকর। আসলে সে-রকম বস্তুর সাহায্যে জীবনযাত্রা যতই নির্বিঘ্নে চলুক না কেন, তার ধ্যানে আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা আনন্দ পায় না। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য যে সবুজ মাঠ একাধারে গাভীর ক্ষুধা মেটায় আর তার তাপক্লিষ্ট চোখকে আরাম দেয়। তৎসত্ত্বেও এমন মন্তব্য সঙ্গত নয় যে গো-জাতি শষ্পশ্যামলিমার সৌন্দর্য-সম্বন্ধে সচেতন ; এবং তৃণজনিত সন্তোষ যেহেতু শরীরধর্মী, তাই তার অনুগ্রহে আমাদের কায়ক্লেশই ঘোচে, তাতে সঙ্কল্পের সন্ধান মেলে না। অর্থাৎ নবদূর্বাদল কেবল সংবেদনীয় ; আনন্দদান তার অসাধ্য ; এবং যা নৈমিত্তিক, তাকে নিত্য ভাবা অমার্জনীয় রকমের অন্যায়।

আনন্দ একটা অভিপ্রেত অবস্থা ; এবং তাকে চাইলে, বস্তুমাত্রার প্রাকারে বন্দী থাকা সম্ভব নয়, বেদনীয় বস্তুর সার্থকতা-সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অনিবার্য। অতএব সবুজ মাঠ সুন্দর নয়, সে-আখ্যা নবদূর্বাদলপ্রসূত অনুভূতিরই প্রাপ্য ; এবং সে-অনুভূতির উৎপত্তি যেমন দেহাশ্রিত, তার পরিণতি তেমনই মানসিক। এখানে ব'লে রাখা ভালো যে উপরের ধ্যানলব্ধ আনন্দের সঙ্গে স্বদেশী সমাধির কোনও কুটুম্বিতা নেই ; এবং অ্যালেক্‌জাণ্ডর যদিও বিবর্তনে বিশ্বাসী, তাঁর মতে আজকের বৈচিত্র্যময় বিশ্ব যদিও একটা প্রাক্তন দেশ-কালের অবিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি, তবু তিনি মানতে প্রস্তুত নন যে সকল জীব একই ঈশ্বরের দ্বারা পরিশাসিত—তাঁর দর্শনে জীবপরম্পরার ঊর্ধ্বতন পুরুষ অধস্তনের নিকটে ভগবানস্থানীয়। তাহলেও তিনি জড়বাদী নন, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদিমাত্র ; এবং আমাদের ভাবনা-বেদনা যে মুখ্যত আচারমূলক, তা বুঝেও অ্যালেক্‌জাণ্ডর ওয়াট্‌সন্‌-এর দৃষ্টান্তে ভাবতে পারেন না যে মানুষ যন্ত্রবিশেষ। তাঁর বিচারে মানুষের মন আর শরীর, ইচ্ছা আর প্রবৃত্তি, সর্বত্র ও সর্বদা তাৎকালিক ; এবং এই "কম্‌প্রেজেন্‌স্‌" বা সমকাল-প্রত্যয়ের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ বাহ্য বস্তু-ব্যতিরেকে অসম্ভব বটে, কিন্তু নিছক বস্তুজ্ঞানে আমাদের অবগতি ফুরায় না, তার উপসংহার অনুভূতিতে।

অর্থাৎ তাঁর মতে বিষয় ধ্যেয় আর ধ্যান উপভোগ্য; এবং ধ্যান আর উপভোগ উভয়ে যে-গোষ্ঠীর তৃতীয় পর্যায়, সেই বংশের আদিপিতা বস্তু, দ্বিতীয় পুরুষ ধ্যান, আর অন্তিম কুলপ্রদীপ আনন্দ।

উপরন্তু সৌন্দর্যবিচারে ধ্যানই যেমন অগ্রগণ্য, তেমনই তার উপাদানে বস্তুর প্রাধান্য অবিসংবাদিত; এবং আনন্দ উদ্গত পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারও মূলে একটা প্রবৃত্তি আছে; সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি পর্যন্ত দেহের শান্তি নেই; এবং দেহ অশান্ত থাকলে, চিত্তের প্রসাদ অসম্ভব। অবশ্য প্রবৃত্তির জন্ম-সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব এখনও একমত নয়; কিন্তু তার সঙ্গে প্রতিবেশের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ, সে-প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানের প্রমাণ অকাট্য। কারণ প্রবৃত্তির উদ্‌ভব প্রাণলোকের যেখানে, যেমন ভাবে, ঘটে থাকুক, তার পরিসমাপ্তি সর্বত্রই বস্তুর অপেক্ষা রাখে: ভয়প্রবৃত্তি ভয়ের বিষয়কে আবেষ্টন থেকে তাড়িয়েই হাঁফ ছাড়ে; কামপ্রবৃত্তি কামনার বস্তুকে নাগালে না পাওয়া অবধি থামতে পারে না; এবং নির্মাণপ্রবৃত্তিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যদৃচ্ছ পরিমণ্ডলকে অভীষ্ট আকারে পরিবর্তিত ক'রে। আমাদের সৌন্দর্যবোধ নির্মাণপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত; এবং আমাদের সত্যবোধ আর শ্রেয়োবোধের শিকড় কৌতূহলের ও সমাজসংগঠনের প্রবৃত্তিদ্বয়ে। সুতরাং মূল্যজ্ঞানের ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মবাদ নিষ্প্রয়োজন; এবং ইষ্টসন্ধানের চরমোৎকর্ষও যেহেতু প্রবৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাই ওই ব্যাপার নিশ্চয়ই মানুষী সভ্যতার সীমায় আবদ্ধ নয়, ওর সঙ্গে প্রাণিমাত্রের সম্পর্কও অবশ্যস্বীকার্য।

এমনকি খুঁজলে, জড়জগতেও হয়তো ওই অন্বেষার প্রকারান্তর মিলবে; এবং তার পরে আমরাও হয়তো লেয়ার্ড্-এর মতো বলতে পারব যে লোহার প্রতি চুম্বকের একটা স্বাভাবিক টান যখন নিঃসন্দেহ, তখন লোহা নিশ্চয়ই চুম্বকের কাছে মূল্যবান। তবে এ-রকম ব্যাপক অর্থে মূল্য-শব্দের ব্যবহার শেষ পর্যন্ত বোধহয় ক্ষতিকর; এবং যদি ভাবি যে কল্যাণবোধ বস্তুমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম, তাহলে সত্য, শিব, সুন্দরের যথার্থ পরিচয় আমরা পাব না, আমাদের জিজ্ঞাসার অকাল মৃত্যু ঘটবে ভাববাদের প্রতিধ্বনিমুখর শূন্যতায়। তাই আমরা মানতে বাধ্য যে সৌন্দর্য আবিষ্করণীয়

নয়, সৃজনীয় ; তার উৎপাদনে জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসমূহের শরণ নেওয়া বৃথা ; এবং সে-জন্যে চিৎশক্তিই কাণ্ডারীর পদে বরণীয়। উপরন্তু চৈতন্যের উদ্বোধনে বস্তু অপেক্ষাকৃত অক্ষম ; এবং প্রবৃত্তির নিদ্রাভঙ্গে সেই আমাদের অনন্য সহায় বটে, কিন্তু সঙ্কল্পের তন্দ্রাবসানে উদ্যোগী বস্তুনির্ভর ধ্যান। সুতরাং সৌন্দর্যপিপাসুর কাছে বিষয় গৌণ, বিষয়ের ধ্যানই মুখ্য ; এবং শুধু তাই নয়, রীতিমতো উপভোগের আগে ধ্যানের স্বাতন্ত্র্য অবশ্যস্বীকার্য। অন্ততঃপক্ষে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সঙ্গে তার যোগসূত্র যত ক্ষণ না ঘোচে, তত ক্ষণ তন্ময় ধ্যানের চেষ্টা পণ্ড শ্রম ; এবং তার পর বিষয়-বিলাসীর কাছে বস্তু যেমন চিরন্তন, বস্তুর ধ্যানও তেমনই অবিনশ্বর।

আসলে বাস্তবের পদবীতে অবাস্তবের এই উন্নয়নই সৃষ্টি ; এবং শিল্পী, সাধু ও সত্যসন্ধানী, এঁরা সকলেই সত্তাকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে তার শূন্য সিংহাসনে স্বরূপকে বসানোর প্রয়াসে প্রাণপণ। কিন্তু শিল্পী, সাধু ও সত্যসন্ধানী যেহেতু বিধাতার সমকক্ষ নন, তাই এঁদের সৃষ্টি বিশ্বরচনার মতো নাস্তিকে অস্তিত্বে ভ'রে তোলে না ; দৈবাগত উপকরণকে নিকামত সাজাতে পারলেই, এঁরা ধন্য। অতএব এখানেও বস্তুজগৎ আবার এঁদের পেয়ে বসে—এমনকি যাঁরা বিশুদ্ধ গণিতের অথবা স্বাবলম্বী সঙ্গীতের সাধক, তাঁদেরও ; এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আলেখ্য প্রভৃতির মতো সুপরিচিত কলায় বস্তুর প্রতিপত্তি সর্ববাদিসম্মত। প্রত্যেকটার উপাদান বা নির্মাণকৌশল অন্যটার কাজে তো লাগেই না, উপরন্তু যে-ভাব একটার আশ্রয়ী, তা অন্যত্র প্রকাশ্য কিনা, সে-সম্বন্ধেও প্রশ্ন আছে ; এবং মাইকেল্ এঞ্জেলো-র ডেভিড্-মূর্তি নিছক মনঃপ্রসূত, এ-কথা আর যেই ভাবুক, ভাস্কর নিজে ভাবতেন না। কারণ তিনিই রটিয়ে গেছেন যে সে-প্রতিমার পরিকল্পনায় তাঁর প্রতিভা যত না প্রশংসনীয়, ততোধিক ধন্যবাদার্হ ফ্লরেন্স্-এর নগরসভাকর্তৃক প্রদত্ত মর্মরখণ্ডের আপতিক আকার ; এবং তৎসত্ত্বেও সে-পাথরখানার ধ্যান-কালে তিনি যখন তাঁর ধ্যানের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তখন ওই দৈবঘটিত প্রেরণাও মননের দৌত্যে অকৃতকার্য হয়নি।

অর্থাৎ স্বপ্নাদ্য সৌন্দর্যের চিরায়মাণ ধারণায় তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল

ব'লেই, আসল খোদাইয়ের বেলা তাঁর হাতুড়ি-ছেনি আর অদৃষ্টের অনুসারে চলেনি, চলেছিল সঙ্কল্পের নির্দেশে ; এবং তাই এমন অনুমান সঙ্গত যে বস্তুপ্রধান শিল্প থেকেও মনকে বাদ দেওয়া অসাধ্য। তবে ওই মননব্যাপার হয়তো সকল কলায় সমান নয় : সঙ্গীতে মানসীর একাধিপত্য প্রায় নিঃসংশয় ; এবং বহিরাগত উপদ্রবের নিরোধে সাহিত্য সঙ্গীতের সমকক্ষ নয় বটে, তবু তাও সম্ভবত চিদাত্মক। পক্ষান্তরে কাব্যসরস্বতী সুদ্ধ মৃন্ময়ী ; এবং যদি মানি যে স্বয়ম্ভু ওঙ্কারেই তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রশস্ত, তাহলেও সে-নির্বিদের বর্তমান বিকৃতি যে-গদ্য ও পদ্য, তার কোনওটা একেবারে বস্তুবিরহিত নয়। আলোচ্য প্রসঙ্গে অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর প্রামাণ্য পুস্তকখানি* হাতে আসার আগে আমি অন্য এক প্রবন্ধে লিখেছিলুম যে কাব্যজাত শব্দসমূহ বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বী : বস্তুর মতো কবিতার শব্দাবলীও স্বাবলম্বী ও সর্ববল্লভ ; এবং একই বস্তুর বিষয়ে এক জনের জ্ঞান যেমন অপরের থেকে স্বভাবতই আলাদা, কাব্যবিশেষের অর্থ-সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই মতান্তর সহজ ও সম্ভব। অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর পৃষ্ঠপোষণে আমার দুঃসাহস এখন আরও বেড়ে গেছে ; এবং আজ আমি কেবল কাব্যের ভাষা নয়, ভাষামাত্রেরই স্বাধিকারে বিশ্বাসী।

ইন্দ্রিয়বোধের অনুগ্রহে আমরা বস্তুর যে-মূর্তি দেখি, তার অস্থায়িত্ব বিদ্যুদ্‌-বিলাসের তুল্য ; এবং শুধু সেই পরিচয়ের ফলে মানুষে মানুষে সংস্কার-বিনিময় তো দুষ্কর বটেই, এমনকি বস্তুকে পাশব প্রয়োজনে লাগাতে গেলেও, সে-প্রসঙ্গে ধারণার স্থৈর্য আবশ্যক। এই ধ্রুবান্বেষণে ভাষাই আমাদের প্রধান সহায় ; এবং প্রত্যক্ষের পুনরাবর্তনে বস্তু যেমন ক্রমে ক্রমে গুণার্জন করে, যুগ-যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার আধার-রূপে ভাষাও তেমনই আস্তে আস্তে অর্থঘন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সভ্যতার অধুনাতনী অবস্থায় বাক্য বস্তুর প্রতিযোগী : সমাজজীবনে উভয়ে মৌরসী পাট্টা চায় ও পায় ; এবং উভয়ে ধ্যান তথা অপরাপর মানসিক প্রক্রিয়ার উপলক্ষ যোগায়। অন্ততঃপক্ষে এমন বিশ্বাসের ভিত্তি নেই যে শিলাময় মর্মরের ধ্যানে তন্ময় ভাস্কর যে-প্রতিমা গড়ে, তার প্রাণ বাঙ্ময় মর্মরে রচিত মানসসুন্দরীর চেয়ে

* Beauty and Other Forms of Value—by S. Alexander (Macmillan)

বেশী অবিনাশী। আয়ুর বিচারে বরং শেষোক্তই অগ্রগণ্য; এবং স্যায়ত বস্তু আর শব্দ যদিও সমান, তবু ধ্যানের উপভোগ যে-নিরাসক্তির অপেক্ষা রাখে, তার জন্যে শব্দ যত উপকারী, বস্তু তত কার্যকর নয়। কারণ বস্তুর ব্যাবহারিক দিকটা ভোলা শক্ত; কিন্তু যে-কবিতায় শব্দ সাঙ্কেতিক হিসাবে প্রযুক্ত, তাতে রূপকেরই প্রাচুর্য ধরা পড়ে, প্রতীকের প্রসাদ মেলে না; এবং সৎকবি দূরের কথা, নিরুক্তের নীরস ভক্তেরাও ভাষা-সম্বন্ধে অহৈতুকী প্রেমের সাধক।

শব্দের অভিধাকে উড়িয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু আমার মতে সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জন্যে গৃহীত হয় না, গৃহীত হয় রূপের তাগিদে; এবং সেখানে যেমন প্রত্যেক শব্দ এক-একটি ধ্যান, তেমনই ধ্যান ব'লে, প্রত্যেক শব্দ স্বাধিকারগুণে আনন্দদায়ক। অবশ্য তথাকথিত সাহিত্যে এ-নিয়মের বহু ব্যতিক্রম সুলভ; এবং আমাদের অনেক লেখাই রূপসৃষ্টি নয়, রূপবর্ণনা। অর্থাৎ সে-ধরণের রচনা নিজের জোরে আমাদের চিত্ত-বিক্ষেপ ক্ষান্ত করে না, তাতে আমরা পাই শুধু এমন কোনও আত্মনিষ্ঠ বস্তুর ঠিকানা, যার সংস্পর্শে জাগে আমাদের চিকীর্ষা; এবং সে-রকম সাহিত্যকে, তথা অন্যান্য শিল্পকে, ললিত কলার পর্যায়ে ফেলা যায় না, সে-সমস্ত কারুকর্মের অন্তর্গত। কারণ কারুকর্মের উপকারিতা যদিও নিঃসন্দেহ, তবু তাতে সৌন্দর্যের নিজস্ব নেই; এবং তার প্রেরণা সেই জাতীয়, যার তাড়নায় মৌমাছি অমন চমৎকার চাক বানায়। অগত্যা তার সঙ্গে তুলনীয় আরসি, যার কোনও স্বকীয় মূল্য নেই, প্রতিফলিতের মূল্যেই যা মূল্যবান; এবং অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর বিবেচনায় এই প্রতিবিম্বপরায়ণতা গদ্যের সনাতন লক্ষণ। কাব্যের ধর্ম শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্বোধন; এবং তাই শিল্পমাত্রেই যখন উৎকর্ষে পৌঁছায়, তখন তাতে দেখা দেয় কাব্যের অনুকরণ: তখনও হয়তো তার অর্থ থাকে; কিন্তু সে-অর্থ সার্থকতার নামান্তর।

রূপের রহস্যে মনের নেতৃত্ব সুনিশ্চিত; এবং সেই জন্যে যদি সেখানেও বস্তুর উপেক্ষা আমাদের সাধ্যে না কুলায়, তবে সত্যের রাজ্যে বস্তু নিঃসন্দেহে ছত্রপতি। কারণ ব্র্যাড্‌লী প্রকৃতি ও প্রপঞ্চের সম্পর্কটাকেই

সত্য-নামে অভিহিত করেছিলেন ; এবং সত্য-শব্দের এই ব্যঞ্জনা আজ বোধহয় অনেকেই মানেন। সত্যের ভিত্তি কৌতূহলপ্রবৃত্তিতে ; এবং সে-প্রবৃত্তির প্রভাব কেবল মনুষ্যসংসারে আবদ্ধ নয়। তারই চালনায় কুকুর মাটি শুঁকে অপরাধীকে ধরিয়ে দেয় ; এবং তারই প্রেরণায় ন্যুটন্ মাধ্যাকর্ষণের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম খুঁজে পেয়েছিলেন। তবু এ-দুটো ব্যাপার একেবারে এক নয়, কুকুরের চোর ধরা গরুর সবুজপ্রীতির মতো নিছক দেহাশ্রিত ; এবং ন্যুটন্-এর মহাকর্ষ-আবিষ্কারে মহামনের ইশারা আছে। কারণ তত্ত্বের খাতিরে আমরা যে-দিকেই ঝুঁকি না কেন, তথ্যের শাসনে আমরা সকলে নামবাদী। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের কোনও সম্বন্ধ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়, কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড প্রতাপ অনস্বীকার্য। প্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনের এই যে দারুণ বিরোধ, এর সমাধান-কল্পেই মানুষ সত্যসন্ধানে এগোয় ; এবং সত্যকে সে চেনে প্রত্যয় আর পদার্থের মধ্যস্থতায়। সে ভাবে আসল জগতের ব্যাপ্তি তার ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে গেছে ; এবং সেই অদৃশ্যকে সে জানতে চায় বুদ্ধি বা আস্থা-প্রসূত অনুমানের সাহায্যে। এই অনুমানের উদয়ে বস্তুবিশ্ব অস্তে যায় ; এবং তখন আর প্রকৃতির সাক্ষাৎকারে তার আগ্রহ থাকে না, সে কোমর বাঁধে অনুমানকে প্রকৃতির প্রতিবাদ থেকে বাঁচাতে।

অতএব এ-ক্ষেত্রেও বস্তু কেবল ধ্যেয় ; এবং অভিনিবেশের পরিচ্ছেদে সে-ধ্যান যত ক্ষণ উপভোগ্য নয়, তত ক্ষণ তার সত্যাসত্যের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাহলেও সত্যের ক্ষিতিনির্ভরতা সৌন্দর্যের বস্তুনিষ্ঠার চেয়ে বেশী ; এবং আবহমান কাল মর্ত্যের উপাদানে অমরাবতীরচনা ক'রেও শিল্পী কখনও দুর্নাম কেনেনি, বরং বিশ্ববিধাতার উপমেয় ব'লে সম্মান পেয়েছে। কারণ সে আবিষ্কারক নয়, উদ্‌ভাবক ; বিশ্লিষ্ট উপকরণে অভূতপূর্ব অবৈকল্য গ'ড়েই সে সার্থক ; তার অভিযান জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাতের অভিমুখে। সুতরাং তার ব্রহ্মাস্ত্র সত্য নয়, শুধু সম্ভাব্যতা ; এবং তার সৃষ্টিতেও সঙ্গতি আবশ্যক বটে, কিন্তু সে-সামঞ্জস্য বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সামঞ্জস্য নয়, সে কেবল বস্তুর সঙ্গে মনের লয়। সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিকের আদর্শ এর বিপরীত ; এবং অন্যোন্যবিরোধী তথ্যসমূহের মধ্যে ঐক্যস্থাপনেই

সে চরিতার্থ। এই ঐক্য কল্পনার কল্যাণেই ঘটলেও, এ-কার্যে মনই বস্তুর বশ্যতা মানে; কোনও জ্ঞাত তথ্য যখন বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতের বাধ সাধে, তখন তথ্যেরই জয় অবশ্যম্ভাবী; এবং সেই জন্যে একদেশদর্শী শিল্পী মার্জনীয় হোক বা না হোক, একচক্ষু বিজ্ঞানী সর্বতোবর্জনীয়। অবশ্য বিশুদ্ধ গণিতের মতো অকারী বিদ্যাকে আপাতদৃষ্টিতে বস্তুব্যতিরিক্ত লাগে; কিন্তু বিচারে সে-বিশ্বাস টিঁকে না; এবং গণিতের সমাপ্তি যদিও খেয়ালের খুশিতে, তবু তার সূত্রপাত বেদীনির্মাণের ধ্রুপদী উপলক্ষে।

তাছাড়া মনোরোগীর কষ্টকল্পনার ন্যায় অঙ্কশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাস-কূটও বহিরাশ্রয়কে লুকিয়ে রাখে মাত্র, তার ধার না ধেরে পারে না; এবং রীমান্-এর জ্যামিতিতে উদ্‌ভাবকের বুদ্ধিমত্তাই বিজ্ঞাপিত বটে, কিন্তু আইন্‌ষ্টাইন্ যেমন সেই জিওমেট্রিকে নিযুক্ত করেছেন আসল আকাশের পরিমাপে, তেমনই তথাকথিত অব্যবহার্য অঙ্কের এতাদৃশ নৈমিত্তিক পরিণতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমনই সুলভ যে ব্যাপার-গুলোকে দৈবাৎ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া দুষ্কর। স্পিনোজা ভেবেছিলেন যে গণিতের উপক্রমণিকা বোধিজাত; এবং যদি মানা যায় যে সে-অনুমান সত্য, তথাচ বিজ্ঞানের প্রকৃতিপরায়ণতা ঘুচবে না। অন্ততঃপক্ষে অধ্যাত্মবাদী জীন্‌স্-এর তাই বিশ্বাস; এবং তাঁর মতে স্বয়ং ভগবান যখন গণিতবিলাসী, তখন অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মাবলী কখনও মানসিক নয়, সর্বত্র নৈসর্গিক। এডিংটন্-এর আত্মদর্শন অগত্যা অগ্রাহ্য; এবং প্রকৃতি যে আমাদের বিশ্বস্ত গোমস্তা, তার কাছে আমরা যা গচ্ছিত রাখি, সে তাই সুদে-আসলে, কড়ায়-গণ্ডায় আমাদের ফিরিয়ে দেয়, এ-রকম সিদ্ধান্তের কোনও প্রমাণসহ ভিত্তি নেই। বরং উল্‌টো নিষ্পত্তিই সমধিক পোষণীয়: সে হয়তো কাফ্‌কা-র ঈশ্বরের মতো, আমাদের প্রতি তার ঔৎসুক্যের একমাত্র অভিব্যক্তি অত্যাচার বা প্রতারণা; এবং বহির্জগৎ তো শূন্যগর্ভ নয়ই, এমনকি সহজাত জ্ঞানের মায়ামুকুরেও আমরা যে-মানসী-মূর্তি দেখি, তা সেই বহুরূপীর প্রতিচ্ছবি। সত্য প্রকৃতিরই পদসেবী; এবং তাই শিল্পের পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক-উপাধি যথেষ্ট, কিন্তু বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অমানুষিক।

সৌন্দর্যবিচারে মনের মর্যাদা যতই উত্তুঙ্গ হোক না কেন, বস্তুর প্রতিযোগিতা সেখানে এত উগ্র যে উভয় পক্ষকে সমবল ভাবায় দোষ নেই ; এবং সত্যের আসরে মনের আবশ্যিক উপস্থিতি সত্ত্বেও বস্তুই সে-ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা। কিন্তু সদাচারের আলোচনায় বস্তু অবান্তর ; এবং মানবসংসারে বোধহয় এই একটিমাত্র প্রদেশ আছে, যেখানে মনই রাজচক্রবর্তী। তথাচ আমাদের সদসদ্‌জ্ঞান ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন নয়, তারও মূলে একটা প্রবৃত্তি বর্তমান ; এবং এই প্রবৃত্তিকে বিনয়ব্যবহারের মতো কোনও গুরু গম্ভীর নাম দেওয়া যায় বটে, কিন্তু এটা আমাদের স্বোপার্জিত সম্পত্তি নয়, এখানে আমরা বহুচর পশু-পক্ষীর উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ প্রতিবেশের তাগিদেই জীব সংঘপ্রীতির বশবর্তী ; এবং সেই জন্যে শৈবেরা কেবল মঙ্গলময় মহেশ্বরের পূজারী নয়, পশুপতিও তাদের উপাস্য। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রবৃত্তির মতো সামাজিক আচার-ব্যবহারও যদিচ বিষয়ের কুটুম্বিতা কাটাতে পারে না, তবু তার উপরে বস্তুর প্রভাব অতিশয় পরোক্ষ ; এবং বস্তুর তাড়া খেয়েই মানুষ যেমন কাজে নামে, তেমনই সদাচারী তার কামনা-বাসনার মর্মানুসন্ধানে যে-পরিমাণে উৎসুক, অভীষ্ট সামগ্রীর জন্যে সে-অনুপাতে উন্মুখ নয়। সুতরাং অপরাপর প্রসঙ্গে কাণ্ট্‌-এর সুভাষিতাবলীতে আমরা কান না পাতি, নীতিপরায়ণের সামনে তিনি যে-আদর্শ রেখে গেছেন, তা এখনও আমাদের অপরিহার্য : আজও সাধুতার একমাত্র মানদণ্ড এমন আচরণ যার মূল সূত্রে সাধারণ বিধানের নির্মাণ সম্ভব ; এবং এ-কথা সুবিদিত যে সামান্য বিষয়বিবিক্ত।

কাজেই সদাচারের প্রেরণা বস্তুপ্রসূত নয় ; এমনকি তার প্রবর্তনা বস্তুর ধ্যান থেকে আসে কিনা, তাও জিজ্ঞাস্য। কারণ একই দ্রব্যের লোভে যখন একাধিক লোক লালায়িত, সে-সময়ে সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে সাধু যেকালে চিত্তবৃত্তিনিরোধে বদ্ধপরিকর, তখন এ-সন্দেহ নিশ্চয়ই অহেতুক যে তিনিও বস্তুবিচলিত ; এবং সে-অবস্থায় তিনি যে-সমস্যার সমাধানে অগ্রসর, সে-সমস্যা অভিলাষের সঙ্গে অভিলষিতের মিলনে তিরোধান করে না, তার মীমাংসা বিসংবাদী অভিলাষীদের তুলাসাম্যে। অবশ্য এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেও সাধু ধ্যানে বসেন ; কিন্তু তখন আর তিনি বস্তুর

ধ্যানে প্রত্যাদেশ খুঁজে পান না, তখন তাঁর ধ্যেয় নিষ্কাম বিনয়ব্যবহারের বিভিন্ন রূপকল্প। সুতরাং সাধুও শিল্পী, যদিও তাঁর শিল্পের উপকরণ বস্তু নয়, ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিস্বরূপ; এবং বহু ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিস্বরূপ মিশিয়ে তিনি যে-সক্রিয় সদাচারের প্রতিমান জগৎসমক্ষে তুলে ধরেন, তারই অনুকরণে সামাজিক জীবের ইষ্টসাক্ষাৎ সম্ভবপর। তৎসত্ত্বেও ইষ্টানিষ্ট নির্বিকল্প বা নির্বিকার নয়; এবং অন্যত্র লোকায়তের উপদেশ যতই অগ্রাহ্য হোক, তার মন্ত্রণাই আচারবিজ্ঞানের ভিত্তি। কেননা এ-পর্যন্ত সকল নৈয়ায়িক শূন্যবাদে এসে পথ হারিয়েছেন, আমাদের বিচার-তৎপর প্রজ্ঞার অতিমর্ত্যতা ভজাতে পারেননি; এবং "সুপর-ঈগো"-নামক নিপট অহংকারের কুলপঞ্জিকায় ফ্রয়েড্ এমন বর্ণসঙ্করতা আবিষ্কার করেছেন যে বিবেকের আভিজাতিক দাবি আজ নিতান্ত উপহাস্য।

অগত্যা জীববিদ্যার পরামর্শে ভাবা ভালো যে আমাদের পারত্রিক কল্যাণ-বোধ শত সহস্র বৎসরের পাশব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিপুষ্ট। অসদের সংসর্গে সাধুর মনে যে-বিতৃষ্ণা জাগে, তার সূচনা হয়তো দুর্বল স্বজাতির প্রতি যূথের বিদ্বেষে; এবং সজ্জন-সম্বন্ধে আমাদের সাধুবাদ আরব্ধ হস্তিপালের দলপতিনির্বাচনে। সদাচারী জ্ঞানত কৈবল্যকামী বটে, কিন্তু কার্যত সে চায় প্রকৃতির প্রশ্রয়; এবং সে যেহেতু সচেতন পুরুষ, তাই এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার নিস্তার নেই যে নিসর্গনিপীড়িত মানুষের উৎকাঙ্ক্ষায় কী ধরণের অমরাবতীর প্রয়োজন কতখানি। ফলে হিতৈষণার কোনও আদর্শ চিরাচরিত নয়; এবং সদনুষ্ঠানের অভিপ্রায় দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে বদ্‌লাতে থাকে। উপরন্তু একই দেশে ও কালে, এমনকি একই সংঘে বা পরিবারে, স্বভাবত তার প্রকারভেদ মেলে; এবং উদাহরণত উল্লেখযোগ্য যে সত্যভাষণ মহাত্মাদের পক্ষেই নিত্যকর্তব্য, কবিরাজদের বেলা রোগীর কাছে অপ্রিয় সত্যের প্রকাশ মহাপাপ। ঐতিহাসিক মহারথীদের বিষয়ে এর চেয়ে বেশী ব্যতিক্রম দ্রষ্টব্য; এবং নেপোলিয়ন্ বা বিস্‌মার্ক্-এর মতো ব্যক্তি সচ্চরিত্রে বুদ্ধ বা যীশুর সমপাঙ্‌ক্তেয় না হোন, সুনীতির দিক থেকে সম্ভবত এই জন্যে মার্জনীয় যে স্বেচ্ছায় সকল ধর্মবিধান ভেঙেও তাঁরা অজ্ঞাতসারে ফ্রান্সের বন্ধনমোচন

অথবা জার্মানির ঐক্যসাধন ক'রে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলই ঘটিয়ে গেছেন।

ভাবিকথকেরাও আপাতত হিতবাদের ধার ধারেন না বটে, কিন্তু আসলে তাঁরা প্রয়োজনের তাগিদেই উৎকেন্দ্রিক ; এবং প্রকৃতির অন্তরঙ্গ ব'লে, তাঁদের উদ্যোগ যদিও বর্তমানের সংক্ষিপ্ত সীমায় আবদ্ধ নয়, তবু সাময়িক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের অস্ত্রধারণ বা বাক্যব্যয় নিরবধি কালের আবেদনে। তাহলেও এ-সব ব্যত্যয়ে নিয়মের সমূহ ক্ষতি ; এবং লোকাচারের পরিবর্তনে ধর্মের পার্থিব প্রকৃতি যেমন প্রকট, তেমনই বিস্তারে তা বস্তুবিবাগী। অর্থাৎ সৌন্দর্য বা সত্যের আলোচনায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে-জাতিভেদ দেখি, আচারশাস্ত্রের সাম্যবাদে তার লেশমাত্র নেই, সেখানে বিষয় আর বিষয়ীর অধিকার সমান ; এবং তাদের পার্থক্য কেবল স্থানের, মানের নয়। কারণ ধর্মবিচারে এক জনের মন অন্য মনের পরিচয় খোঁজে : এমনকি অনেক আচারনিষ্ঠের কাছে তাঁদের আপন মনই বিদ্যাভ্যাসের সামগ্রী ; এবং হয়তো সেই জন্যে এত দিন ধর্মচর্চায় পুরোধার আসন পেয়েছেন ভাববাদী, যাঁর আত্মজ্ঞান আচারশাস্ত্রীয় আত্মব্যবচ্ছেদের নামান্তর। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অধ্যাত্মদর্শনের নির্দেশ মানলে, অন্যত্রও অব্যাহত প্রবেশের অনুমতি তার প্রাপ্য ; এবং শঙ্করাচার্যের ব্রহ্ম কেবল মায়াচ্ছলে দ্বৈতস্বীকার করেন বটে, তবু আসলে সে-নির্গুণ ও নির্দ্বন্দ্ব চৈতন্যের মধ্যে চোখ, কান, মুখ ইত্যাদি সকল ইন্দ্রিয়ই বর্তমান, শুধু সন্নিকটে বেদনীয় বস্তুর অভাব-বশত তাঁর জ্ঞানার্জনী বৃত্তি অকারী।

তথাচ সাধুর সংবিৎ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তার উপমা ভালেরি-র স্বাবলম্বী ভুজঙ্গ, যে নিজের পুচ্ছকে উপজীব্য ক'রে অনাদ্যন্ত কাল জ্ঞানতরুর মূলে পাহারা জাগে ; এবং তৎসত্ত্বেও সত্য আর সৌন্দর্যের সন্ধানে বেরিয়ে, আমরা যখন সেই শেষনাগকে পেরিয়েই বাস্তবিক অবগতির সামনে আসি, তখন সদাচারের মতো লৌকিক ব্যাপারে আমরা তার বিষদংশন সইব কোন্ লোভে? বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদে এ-প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া না গেলে, বার্ক্‌লি-র প্রজ্ঞাবাদকে আর দোষ দেওয়া চলে না ; এবং তার পরে আমাদের মানতেই হয় যে সত্য কেন, যে-বস্তু সত্যের আধার, তার অস্তিত্ব

স্বদ্ধ আমাদেরই জ্ঞানসাপেক্ষ। তবে এ-তর্ক পরাবিদ্যার অন্তর্গত; এবং অ্যালেক্‌জাণ্ডর যেহেতু বারংবার বলেছেন যে বর্তমান গ্রন্থে তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নন, তথ্যের সাক্ষ্যে মূল্যবিচারই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই এ-প্রসঙ্গে আমার পারমার্থিক কৌতূহল হয়তো অশোভন। কিন্তু তথ্য সম্ভবত তত্ত্বেরই অপভ্রংশ; অন্ততঃপক্ষে এটা নিঃসন্দেহ যে পদার্থবিজ্ঞানের মতো তথ্যভূয়িষ্ঠ বিদ্যা প্রতিনিয়ত স্থূল বুদ্ধির পদলাঘবে ব্যস্ত। যা প্রত্যক্ষ, যদি তাকেই তথ্য-নামে ডাকি, তবে সত্য আর অপলাপের মধ্যে তফাৎ থাকে না; এবং তখন তত্ত্ব যে-উপায়ে মরে, তথ্যও সেই ভাবে করে আত্মহত্যা। সুতরাং তথ্য কেবল তথ্য হিসাবে গ্রহণীয় নয়; প্রত্যক্ষ দৃষ্টির পিছনে যে-অনুমান আছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য না ঘটা পর্যন্ত তথ্যজ্ঞান নিরর্থক; এবং নিরর্থক ব'লেই, সমষ্টিবিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ আজ এত বাদ-বিতণ্ডার প্রশ্রয় দিচ্ছে।

অবশ্য সে-কথা অ্যালেক্‌জাণ্ডর-ও জানেন; এবং মানপ্রতিষ্ঠার গণ্ডগোলে তিনি আপাতত তত্ত্ববিমুখ বটে, কিন্তু তাঁর সমকাল-প্রত্যয়ের আড়ালে একটা সর্বব্যাপী মতবাদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। উক্ত প্রত্যয় আমার কাছে হোয়াইট্‌হেড্-এর 'পরিগ্রহণের মতোই রহস্যাবৃত; এবং এ-জন্যে কে বা কী দায়ী—অ্যালেক্‌জাণ্ডর আর হোয়াইট্‌হেড্ বের্গ্‌সন্‌পন্থী, না আমি দর্শনান্ধ—তা অনিশ্চিত। হয়তো ভারতবর্ষে জন্মানোর দরুন কিংবা তত্ত্বজ্ঞানে অনভ্যাস-বশত, আমার মন দ্বিত্বসমর্থনে অনিচ্ছুক; অথচ চক্ষু-কর্ণের প্রতিকূলতায় আমার দেহ বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদে পৌঁছাতে পারে না; এবং আমার জীবনে শরীর যেকালে মনের অভিভাবক, তখন আমি মানতে বাধ্য যে সংসারের দ্বৈধ অনস্বীকার্য। তাহলেও আবশ্যিক সম্মতি সর্বদা অস্থায়ী; এবং ব্যবহারের টানে যেই ঢিলে পড়ে, আমার বুদ্ধি অমনই বিদ্রোহে মেতে ওঠে। সে-সময়ে অবিকল ও অবিভাজ্য অভিজ্ঞতাকে বুঝতে গিয়ে বিভিন্নধর্মী কর্তায় আর কর্মে তার বিচ্ছেদ কোনও মতে আমার সাধ্যে কুলায় না; এবং দর্শনশাস্ত্রে এ-উভয়সঙ্কটের খণ্ডন নেই জেনে, উপলব্ধির অখণ্ডতা-প্রমাণে আমি অগত্যা "গেষ্টাল্‌ট্‌ সাইকলজি"-র শরণ নিই। কিন্তু একটু পরেই দেখি যে সে-মনস্তত্ত্বের

অখিল আত্মম্ভরিতায় বিশ্বম্ভর ভূমাই অনুস্যূত ; এবং তখন ধরনা দিতে ছুটি পাভ্‌লোভ্‌-এর পায়ে।

বলাই বাহুল্য যে সেখানেও নিশ্চয়ের পাত্তা পাই না ; এবং পাভ্‌লোভ্‌-এর সমানাধিকারী শাসনতন্ত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা যদি বা মনের বালাই ঘুচিয়ে শ্রেণীবিরোধের ঊর্ধ্বে পৌঁছে থাকে, তবু সে-রাষ্ট্রের সীমান্তরে যাদের বাস ফ্রয়েড্‌-এর নৈরাজ্যে, তারা শুধু নামে দেহী, আসলে মনই তাদের সর্বস্ব। সুতরাং আবার পলানো ছাড়া জীবনরক্ষার অন্য কোনও উপায় দেখি না ; এবং পা বাড়াতে না বাড়াতে উচট খাই সমকাল-প্রত্যয়ের জোড়া নৌকায়। কিন্তু এইখানে অগত্যা আপনাকে সঁপেও বুকে বল আসে না, সর্বদা ভয় হয় যে তত্ত্বের সমুদ্রে হঠাৎ কোনও বিপরীতগামী স্রোতের মুখে পড়লে, যুগ্মতরীর সমবর্তী সূত্র ছিঁড়ে ভরাডুবি ঘটবেই ঘটবে ; এবং গোড়ার দিকে ভেবেছিলুম বটে যে অ্যালেক্‌জাণ্ডর সাহেবের প্রমাণসই বইখানায় মুশ্‌কিল-আসানের একটা যেমন-তেমন মতলব হয়তো মিলবে, কিন্তু এ-বারেও গাঁটছড়া যেহেতু শেষ পর্যন্ত টিঁকল না, তাই না মেনে পারছি না যে তাঁর বর্তমান গবেষণা ব্যাবহারিক মূল্যেই মহার্ঘ্য, পারমার্থিক মূল্যে অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য আমার সত্তার বিবাদী অঙ্গদ্বয়ে জোড়া লাগবে একা আমারই চেষ্টায় ; এবং নিজের চিন্তায় বা পরের পক্ষপাতে এ-সমস্যার কোনও সমাধান আমি আজ অবধি আবিষ্কার করিনি। কিন্তু মানুষের আশা দুর্মর ; এবং সেই জন্যে আমার অন্ধ বিশ্বাস যে এর মীমাংসা দ্বৈতবাদে নয়, মনোবাদে নয়, অবিমিশ্র দেহাত্মবাদে।

[১৯৩৪]

# বিজ্ঞানের আদর্শ

কবিদের অনুপকারিতা বহু দিন আগেই ধরা পড়েছে; এবং অন্তত হেগেল্-এর পর থেকে দর্শন শূন্য কুম্ভ ব'লে পরিচিত। এটা বিজ্ঞানের যুগ: আধুনিক অতিপ্রাকৃত এঞ্জিনীয়রদের হাতে; আজকালকার কথামৃত গণিতব্যবসায়ীদের মুখে; এবং সত্যের যূপে স্বার্থবলিদান দেখতে সাম্প্রতিক মানুষ আর সাধকের আশ্রমে জোটে না, পদার্থবিদের প্রয়োগাগারেই ভিড় জমায়। তাহলেও বর্তমান জগৎ পূর্ববৎ কুসংস্কার-প্রবণ; এবং প্রাচীন মিসর যেমন পুরোহিতদের অপ্রমাদ ভেবে জাতীয় বিনষ্টির পথ প্রশস্ত করেছিল, আমরাও তেমনই বৈজ্ঞানিকদের অতি-মানুষ বিবেচনায় মহাপ্রলয়ের অভিমুখে এগোচ্ছি। আসলে বিজ্ঞান মানুষী জ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র বিভাগ-মাত্র; এবং সেই সাবয়ব জ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতিই যেহেতু সত্য-পদবাচ্য, তাই গণ্ডিবদ্ধ বিশেষজ্ঞেরা অনেক সময়ে মরীচিকার মায়াজালে জড়িয়ে যান, নিরক্ষরদের ভূয়োদর্শী প্রবচনেই যাথার্থ্যের সন্ধান মেলে। অবশ্য এ-অভিযোগ ওয়েল্‌স্-প্রমুখ বিজ্ঞানস্তাবক-দের বিরুদ্ধেই পোষণীয়; কিন্তু হাক্স্‌লি ও তাঁর সমসাময়িক প্রবক্তারাই এই একদেশদর্শিতার উদ্যোক্তা; এবং নিজেদের উপজীবিকা-সম্বন্ধে প্লাঙ্ক্, জীন্‌স্, শ্র্যোডিঙ্গার ইত্যাদির অত্যধিক বিনয় যত অন্ধেরই চোখ ফুটিয়ে থাক না কেন, তবু হিট্‌লারী আর্যাবর্তের জটিল চক্রান্তেও, বৈজ্ঞানিক স্বেচ্ছাসেবকের অভাব নেই। তবে এতে আশ্চর্য হওয়া বৃথা। কারণ ইদানীন্তন রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদবী চাইলেও, অণু-পরমাণুর সাম্য এ-যাবৎ মনুষ্যসমাজে অপ্রতিষ্ঠিত; এবং রাসেল্-এর মতো বিজ্ঞানসচেতন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভৌতিক অনিশ্চয়-বিধির মধ্যে নৈরাজ্যের

অনুমোদন খুঁজেছেন বটে, তথাচ সে-প্রযত্নে যুক্তির চেয়ে পক্ষপাতই হয়তো বেশী।

কিন্তু সে-জন্যে বিজ্ঞান দোষাবহ নয়, বৈজ্ঞানিকেরাই অপরাধী; এবং তাঁরা যেকালে মানুষ, তখন সন্তর্পণ শুচিবায়ুর আড়ালেও মানুষী অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ তাঁদের অর্শাতে বাধ্য। উপরন্তু সমাজে আত্মশ্লাঘা বংশমর্যাদার তুলনায় গৌণ; এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও অবৈজ্ঞানিকেরা ভুলতে পারে না যে বিজ্ঞান ভানুমতীর শেষ সন্তান। অগত্যা অতিভাষী এডিংটন্-কে আমরা অলৌকিকের কর্ণধার বানাই; ভোরোনফ্-এর অস্ত্রচিকিৎসায় মৃতসঞ্জীবনীর আশ্বাস দেখি; এবং ফ্রয়েড্-এর নাম জ'পে ঘোচাই ইচ্ছাশক্তির শোচনীয় দৈন্য। পক্ষান্তরে সাধারণের ক্ষেত্রে ভাবালুতা যদিও ভাবুকতার চেয়ে সহজ, তবু কারও প্রতিপত্তি কেবল ফাঁকির উপরে গ'ড়ে ওঠে না; এবং বিজ্ঞানের সকল বিভাগে যেমন প্রবঞ্চনার অন্ত নেই, তেমনই আজ সে স্বভাবগতিকেই অন্যান্য বিদ্যার অগ্রগণ্য। বস্তুত বিজ্ঞান এত দিন তার ব্যাবহারিক আদর্শ ভোলেনি; হয়তো বয়সে সে সর্বকনিষ্ঠ ব'লে, অগ্রজদের দুর্দশা তাকে অতিমাত্রিক কল্পনাবিলাস থেকে বাঁচিয়েছে; এবং তাই সে প্রারম্ভেই বুঝেছে যে যারা জগতে টিঁকতে ইচ্ছুক, তাদের বেলা তত্ত্ব অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু যে-তত্ত্ব তথ্যের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয়, তার ভাগ্যে লোকাপবাদ অনিবার্য। অতএব বিজ্ঞান আবহমান কাল শুধু খবর নিয়েছে, আর ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজেছে; এবং অধ্যবসায়ের এমনই গুণ যে এই নিরুদ্দিষ্ট পরিশ্রমও অপুরস্কৃত থাকেনি, এ-পর্যন্ত কোনও নির্বিকল্প কৈবল্যে পৌঁছাতে না পারুক, বর্গনির্দেশের তাগিদে সে ইতিমধ্যে যে-সমস্ত আপেক্ষিক নিয়মের সন্ধান পেয়েছে, তা থেকে অন্তত আনীহারিকা বস্তুপুঞ্জের অব্যাহতি নেই।

সুতরাং বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে আধুনিকদের কৌতূহল কেবল বিদ্রূপযোগ্য নয়, সে-সম্বন্ধে আমাদের রোমান্টিক্ মনোভাবও হয়তো মার্জনীয়; এবং বিজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞানাতীত সমস্যার সমাধান না চাইলে, তার অভয়ে বুক বাঁধা সমীচীন। এ-কথা পরলোকগত রুষ জীববিদ্যাবিশারদ ইভান্

পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লোভ্-সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সত্য; এবং তাঁর দেহাচার-বিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণাদি যদিও মনস্তত্ত্বকে ঔপন্যাসিকের কবল-মুক্ত ক'রে প্রামাণিক সাধারণ্যে আসন দিয়েছে, তথাচ পাভ্‌লোভ্ স্বয়ং কোনও ব্যাপক সিদ্ধান্তে আপনার লক্ষ্য হারাননি, আমরণ নিজেকে স্নায়ুপ্রতিক্রিয়ার বিবেচক হিসাবেই জানতেন। সম্ভবত সেই জন্যে চির দিন আত্মবিজ্ঞাপন বাঁচিয়ে চ'লেও তিনি আজ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের প্রতীক-স্বরূপ; সম্ভবত সেই জন্যে এই অশীতিপর বৃদ্ধের অবশ্যম্ভাবী তিরোধানকেও অনাগতেরা অকাল মৃত্যু ব'লে মানবে। কিন্তু অনধিকার চর্চায় নিরুৎসাহ, পাভ্‌লোভ্ অমানুষিক বা অতিমানুষিক নিষ্কর্ষণের প্রচারক ছিলেন না; এবং রুষ বিপ্লবের সাংঘাতিক বিক্ষোভেও তিনি সহকর্মীদের মধ্যে কালনিষ্ঠার অভাব সইতে পারতেন না বটে, তবু ব্যবচ্ছেদের পূর্বে ও পরে জন্তু-জানোয়ারের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় যে-পরিমাণ সেবাব্রত তাঁকে পেয়ে বসত, তা হয়ত জৈনদের মধ্যে বিরল। তবে এই সহৃদয়তার সঙ্গে ইংরাজদের অনাত্ম পশুপ্রীতি তুলনীয় নয়; এবং মানুষী অনুকম্পাও পাভ্‌লোভ্-এর বক্ষে এমনই আলোড়ন তুলত যে সমানাধিকারের নামে রুষ বিদ্যাপীঠ থেকে পুরোহিতসন্তানদের বিতাড়িত দেখে, তিনি তাঁর যাজক পিতার দোহাইয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন।

তিনি কখনও ভুলতে পারেননি যে বিজ্ঞান বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলের অভিভাবক ব'লেই, সাধারণের সহানুভূতি তার প্রাপ্য। ফলত জীবব্যবচ্ছেদ-সম্বন্ধে বর্নার্ড্ শ-এর ভাববিলাস তাঁর নিকটে হাস্যকর ঠেকত; এবং তিনি বুঝতেন যে অনাবশ্যক প্রাণিহত্যা যতই গর্হিত হোক না কেন, বিনা মূল্যে জ্ঞানসঞ্চয় অসম্ভব। কিন্তু যে-জ্ঞান লোকহিতার্থে অব্যবহার্য, তার আকর্ষণ তাঁকে কোনও দিন টানেনি; এবং সম্ভবত সেই জন্যে যন্ত্রশিল্পের অসম্পৃক্ত উন্নতি-কল্পে বোল্‌শেভিক্-দের নরবলি তাঁর মুখে ফোটাত দুরুক্তি, তাঁর কাজে আনত বিদ্রোহ। তাহলেও এ-প্রতিবাদ দেশদ্রোহী নয়; এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজের তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাও অনুপস্থিত; এবং মাতৃভূমি-সম্বন্ধে তাঁর ও আইন্‌ষ্টাইন্-এর মনোভাব মেলালেই, পাভ্‌লোভ্-এর প্রগাঢ় দেশভক্তি

চোখে পড়বে। কেননা নিরীহনিগ্রহে নাৎসী রাষ্ট্র যদিচ সোভিয়েট্ তন্ত্রেরই পদাঙ্কচারী, তবু বৈভীষিক নীতির উত্তরে বিভীষণ-ভূমিকার পুনরভিনয় দূরে থাকুক, আইন্‌ষ্টাইন্-এর মতো স্বেচ্ছানির্বাসনে যাওয়াও পাভ্‌লোভ্-এর সাধ্যে কুলায়নি ; এবং প্রায় আশী বছর বয়সে যখন তাঁর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, তখন কর্তৃপক্ষের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তিনি বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরিচর্যা নেননি, অনভিজ্ঞ স্বজাতির হাতে আপনাকে নিশ্চিন্তে সঁপেছিলেন। সুতরাং এ-কথা যেমন অবশ্যস্বীকার্য যে পাভ্‌লোভ্-এর মন যুগিয়ে চ'লে বোল্‌শেভিক্ দলপতিরা অসামান্য বিজ্ঞানভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তেমনই এটাও হয়তো নিঃসন্দেহ যে পাভ্‌লোভ্ য়িহুদী বুদ্ধিজীবীদের ন্যায় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অন্তর্বিরোধের বীজ বুনে শাসকসম্প্রদায়ের ধৈর্য-পরীক্ষায় কখনও এগোননি।

বস্তুত পাভ্‌লোভ্-এর মতো নির্বিরোধ মানুষ সকল যুগেই দুর্লভ ; এবং তিনি কেবল শ্রেণীবিভাগকেই অন্যায় বিবেচনা করেননি, শ্রম-বিভাগও তাঁর কাছে সমান অনুচিত ঠেকেছে। তাই তিনি নির্জলা বিজ্ঞানে কদাচ তুষ্ট থাকেননি, চিৎপ্রকর্ষের সকল শাখা-প্রশাখাকে তুল্যমূল্য ভেবেছেন ; এবং এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি যে-আদর্শ থেকে আজীবন প্রেরণা কুড়িয়েছেন, তা মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞদের আত্ম-প্রসাদ যুগিয়ে সার্থক নয়, এক সূত্রের সাহায্যে সর্ববিধ তথ্যের ব্যাখ্যাই তার আশা ও অভীপ্সা। সেই জন্যে রক্তচলাচল ও হৃৎপিণ্ড-সম্পর্কে অগণ্য আবিষ্কারেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা মেটেনি, তিনি আবার নবীন উৎসাহে পাকস্থলীর পর্যালোচনায় নেমেছেন ; এবং তাতে সাফল্যের জন্যে ১৯০৪ সালে নোবেল্ পুরস্কার পেয়েও তিনি অবসর নিতে পারেননি, আরও পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে চৈতন্যকে নাড়ি-গুলের ভিতরে এনে দুর্মুখদেরই বোকা বানিয়েছেন। ইতিমধ্যে বিদ্বজ্জনের শত্রুতা তাঁকে পদে পদে বাধা দিয়েছে ; মহাসমর তাঁর পুত্রদ্বয়ের প্রাণ নিয়েছে ; এবং উপনিপাত তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনেও এ-রকম টান ধরিয়েছে যে মাঝে মাঝে তিনি চলৎশক্তি সুদ্ধ হারিয়ে ফেলেছেন। তবু বিঘ্নের সামনে তিনি মাথা নোয়াননি, বার্ধক্যের

কাছে হার মানেননি, এবং মৃত্যুর অনতিপূর্বে পরলোক-সম্বন্ধে নূতন গবেষণায় ডুবে ইতিহাসের কীর্তিস্তম্ভে পুনর্বার এই কথা লিখে গেছেন যে মানুষ প্রকৃতিপরায়ণ হলেও, পুরুষকারে বঞ্চিত নয়।

আমার বিবেচনায় পাভ্‌লোভ্-এর সাধনা এই মহাসত্যের সাক্ষ্য যে আত্মসমাহিত সঙ্কল্প প্রতিকূল প্রতিবেশকে তো পেরিয়ে যায়ই, উপরন্তু মহাকালের দিগ্বিজয়কেও প্রয়োজনমতো থামিয়ে রাখে। পক্ষান্তরে আত্মসমাহিতি আত্মরতির নামান্তর নয়; এবং তিনি যদিও সাধ্যপক্ষে নিন্দুকদের কথায় কান পাততেন না, তবু সাত্ত্বিক সমালোচনার দিকে তাঁর দৃষ্টি সদা-সর্বদা নিবদ্ধ থাকত। অর্থাৎ সত্যানুরক্তিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা ভার; এবং বিরুদ্ধ প্রমাণের সম্মুখে স্বকৃত সিদ্ধান্তের পরিহারে তিনি বারংবার যে-রকম ক্ষিপ্রতা দেখাতেন, তা বিস্ময়কর। উদাহরণত ১৯২৩ সালের একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর ধ'রে ইঁদুর নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে পাভ্‌লোভ্ ওই সময়ে এই সাধারণ বিশ্বাসে সায় দেন যে এক জনের অর্জিত বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিগত দক্ষতা বিষয়-সম্পত্তির মতোই তার উত্তরাধিকারীদের বর্তায়। এর ফলে দার্শনিক মহলেও সাড়া পড়ে; এবং মনস্তাত্ত্বিকেরা যে সে-বাদ-বিতণ্ডাকে আরও পাকিয়ে তোলেননি, এমন কথা বলতে পারব না। কিন্তু পাভ্‌লোভ্-এর এই অপূর্ব আবিষ্কার অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে, কি বিপক্ষে, সে-তর্কনিষ্পত্তির আগেই স্বয়ং আবিষ্কর্তা নিজের ভ্রান্তি-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন, এবং দিগ্বিদিকে নিঃসঙ্কোচে রটান যে তথ্য-সংগ্রহে অসতর্কতা-বশতই তিনি এত গোলোযোগ বাধিয়ে বসেছেন। আসলে এই জাতীয় নিরাসক্তির নমুনা তাঁর জীবনে অসংখ্য; এবং নিষ্কাম অনুসন্ধিৎসার চালনেই হৃৎপিণ্ড থেকে পাকস্থলী ও পাকস্থলী থেকে সমগ্র নাড়ীমণ্ডলে তিনি প্রাণরহস্যের অনুধাবন করেছিলেন।

প্রমাণে আস্থা রাখলেও, পাভ্‌লোভ্ বাল্যকালেই প্রামাণ্যে নির্ভর খুইয়েছিলেন; এবং পাকযন্ত্রের গণ্ডনিঃসারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি যখন বুঝলেন যে খাদ্যসম্পর্কিত সামগ্রী-দর্শনে, এমনকি খাদ্যের নামেই, জীবের জিহ্বায় লালা ঝরে, তখন ব্যাপারটাকে মনোরাজ্যের অজ্ঞাতবাসে পাঠাতে

তাঁর বিবেক শুধু আপত্তি জানালে না, প্রমাণাভাবে তিনি অগত্যা মন-রূপ লোকপ্রসিদ্ধির মোহও কাটালেন। কিন্তু অতখানি সংস্কারমুক্তি সকলের সয় না। কাজেই সহকর্মী স্নার্স্কি-র সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটল; বন্ধুরা তাঁর চিত্তস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন; এবং প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় বিশ বৎসর-ব্যাপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষাবলীর কল্যাণে মনসংক্রান্ত পরোক্ষ মতামত ঝেড়ে ফেলে পাভ্লোভ্ দেখালেন যে মাইণ্ড্ আর ম্যাটার-এর চিরাচরিত দ্বৈত অন্তত মনুষ্যেতর জীবজগতে অবর্তমান —সেখানকার সকল আচরণই শুধু স্নায়ুপ্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বোধগম্য, এবং তথাকথিত মনোব্যাপারেও বিজ্ঞানসম্মত বহিরাশ্রয়িতা সম্ভব ও সার্থক। তবে জীবের জন্মগত অধিকারে সকল প্রকার আচরণের প্রাক্তন প্রতিমান নেই; উন্মুখীন ও বিমুখীন প্রবৃত্তির মতো গোটাকয়েক সহজ দেহাচার ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্মপদ্ধতিই সে ঠেকে শেখে; এবং এই শিক্ষা-দীক্ষা যেহেতু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিশেষ ঘটনাচক্রের ফল, তাই তার দেহবাচক নিত্য প্রতিক্রিয়াসমূহ যত শীঘ্র বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসে, তার বুদ্ধি-বিচার, আসক্তি-বিরক্তি প্রভৃতি নৈমিত্তিক প্রতিক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তত অনায়াসসাধ্য নয়। তাহলেও মন হেতুপ্রভব; এবং সাবধান দ্রষ্টা আর উপযুক্ত উপায় যেই একত্রে জুটবে, অমনই মনস্তত্ত্বেও বিজ্ঞানের অনির্বাণ আলোক জ্ব'লে উঠবে।

এই অমূল্য আবিষ্কারের সম্মান পাভ্লোভ্ নিজে নেননি, রুষ শরীর-বিদ্যার আদিগুরু সেচেনভ্-কেই দিয়েছেন। কেননা সেই মেধাবী সাহসিকের "সেরিব্র্যাল্ রিফ্লেক্স্"-নামক দেহাত্মবাদী পুস্তক তাঁর হাতে আসার ফলেই তিনি নাকি প্রৌঢ় বয়সে কায়িক ও মানসিককে দ্বন্দ্বসমাসে বাঁধতে পেরেছিলেন। কিন্তু পৌর্বাপর্যবিচারে অ্যামেরিকান্ মনোবিজ্ঞানী থর্ন্ডাইক্-ও তাঁর অগ্রগামী; এবং ওয়ট্সন্, পার্কার, য়েকিস্ প্রভৃতি মার্কিনী বিহেভিয়ারিস্ট্-রা তাঁর অনন্যাধীন সমসাময়িক। তবে এতে ক'রে পাভ্লোভ্-এর স্বকীয়তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি; এবং এঁদের কাছে তাঁর ঋণ মানলে, হিউম্, হার্ট্লি, কঁদিয়াক্ ইত্যাদিকেও এই বংশকারিকা থেকে বাদ দেওয়া দুষ্কর। আসলে মানবমনের অনুষঙ্গপ্রবণতা অ্যারিস্টট্ল্-

এর যুগেও অবিদিত ছিল না; কিন্তু জড় আর জীবের বিরোধ-সম্পর্কে সেই মহাপুরুষের দুর্মর অভিমত গত আড়াই হাজার বছরে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছে ব'লেই, আমরা এখন উচ্চ কণ্ঠে নিঃসম্পর্ক চিত্তবৃত্তির গুণ গাই। তথাচ এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্যে জনসাধারণ দায়ী নয়, অপরাধ শুধু মনোবিদ্‌দের; এবং তাঁরাই অপবিজ্ঞানের বন্যা বইয়ে মনস্তত্ত্ব-বিষয়ে আমাদের সরল আস্থাকে ডুবিয়ে মেরেছেন। কারণ তাঁদের মধ্যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিতান্ত বিরল; তাঁদের অধিকাংশই ছদ্মবেশী নীতিকার; এবং ধর্মনীতি যেহেতু ন্যায়ের ধার ধারে না, নিষ্ঠাকেই আঁকড়ে ধরে, তাই মনোবিদেরা সঙ্গতিরক্ষায় ততটা সিদ্ধহস্ত নন, যতটা উন্মুখর উপদেশে।

অবশ্য সে-জন্যে তাঁদের চেয়েও তাঁদের অধীত বিদ্যাই বেশী দোষী; সেখানে পরীক্ষার ক্ষেত্র যেমন বিরাট্, পাত্র তেমনই দুর্লভ; এবং সে-সম্বন্ধে ব্যবচ্ছেদাদি প্রকরণ কেবল বিধিনিষিদ্ধ নয়, জিজ্ঞাসুর স্বভাব-বিরুদ্ধও বটে। কিন্তু এ-কথা যদিও মানুষের বেলাতেই বিশেষ ভাবে সত্য, তবু জীববিজ্ঞান মৃত্যুর নিদান নয়, জীবনের মর্মানুসন্ধান; এবং ব্যবচ্ছেদের অবাধ সুযোগ থাকাতেই আমরা সে-বিশ্লেষণে এত দূর এগোইনি, পরাবর্তনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যেই তথ্যের পর তথ্য কুড়িয়েছি। প্রকৃত পক্ষে পর্যবেক্ষণের প্রকৃষ্টতর পদ্ধতিই মনোবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন; এবং ব্যবচ্ছিন্ন জীবকে বাঁচিয়ে রেখে, তার কষ্টের মাত্রা যথাসম্ভব গুটিয়ে, নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে তার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ ক'রে, পাভ্‌লোভ্‌-ই সর্বপ্রথম এই অভাব ঘুচিয়েছিলেন। সেই জন্যে তাঁর স্বতন্ত্র আবিষ্কারসমূহ আপাতত ওয়ট্‌সনী সিদ্ধান্তের দিকেই ঝুঁকলেও, চিন্তাশীলের কৃতজ্ঞতা পাভ্‌লোভ্‌-এরই প্রাপ্য, ওই শেষোক্ত পণ্ডিতের নয়; এবং তাঁর আর ওয়ট্‌সন্‌-এর মধ্যে যে-ব্যবধান বর্তমান, তা হয়তো আর্যভট্ট ও গ্যালিলিও-র পার্থক্যের চেয়েও সুদুস্তর। বলাই বাহুল্য যে এ-প্রসঙ্গে মার্ক্‌স্‌-বাদীদের অনুকরণে যুগধর্মের অবতারণাও বৃথা; এবং রাষ্ট্রের ইতিবৃত্তে ডায়ালেক্‌টিক্ খাটুক বা না খাটুক, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার সূচ্যগ্র স্থান নেই। কারণ কোনও বিশেষ ধারণা একটা নির্দিষ্ট দেশ-কালে উড়ে বেড়ায় না, ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রয়োগনৈপুণ্যই পরিকল্পনাবিশেষকে আবালবৃদ্ধবনিতার ভোগে আনে;

এবং রূপহীন ভাবনা যেকালে ভাবনাই নয়, ভাবনার ভানমাত্র, তখন অলস মনে আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে বেকার মানুষ ভাবুক-আখ্যা পায় না, লোকোত্তর চিন্তাকে লোকায়তে নামিয়েই মনীষা তার ভাণ্ডার ভরে।

উপরন্তু সংঘটিত প্রতিক্রিয়াকে আচারবাদে পরিণত করা নিরাপদ নয়; তার সঙ্গে অনুষঙ্গমূলক মনস্তত্ত্বের যোগও আংশিক; এবং জীবনকে অবিভাজ্য ভেবে পাভ্‌লোভ্‌ যদিও দেহ-মনের যুক্ত রাজ্যে একই শাসনতন্ত্রের নিরন্তর প্রসার দেখেছেন, তবু তার ফলে চৈতন্যের মর্যাদা বেড়েছে, বই কমেনি। কেননা তাঁর মতে একাধিক উত্তেজনার তাৎকাল্যই যথেষ্ট নয়, সেগুলোর তাৎপর্যও অবশ্যগণ্য; এবং যেকালে প্রত্যাশায় বারংবার প্রবঞ্চিত হলে, সকল নৈমিত্তিক প্রতিক্রিয়াই থেমে যায়, তখন জন্তুরাও কেবল ইন্দ্রিয়ের তাড়নে চলে না, তারা নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয় তুলামূল্যের সাহায্যে বোঝে যে অবস্থাবিশেষে তাদের চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বার সমন্বয় অবস্থান্তরে অব্যবহার্য। সুতরাং ওয়াট্‌সন্‌-এর বিপক্ষে রাসেল্‌-এর অখণ্ডনীয় আপত্তি পাভ্‌লোভ্‌-এর সম্বন্ধে খাটে না; এবং কোনও নিত্য প্রবৃত্তির প্রশ্রয় ব্যতীত পরাবর্তকের অদল-বদল তো অসাধ্যই, এমনকি শিক্ষা যেহেতু শিক্ষকের আজ্ঞাধীন নয়, শিক্ষার্থীরই বিচার-সাপেক্ষ, তাই গোল মরিচের গুঁড়ো শুঁকেই আমাদের হাঁচি আসে, তার নাম শুনে কেউ হাঁচতে শেখে না। আসলে জড়বাদের প্রতি পাভ্‌লোভ্‌-এর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই; বোধহয় হোল্‌ট্‌-এর মতো তিনিও জীব আর জড়ের উপাদানে এক উভয়সামান্য মূল ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন; এবং তাঁর পারিভাষিক শুদ্ধি কথামালার মনুষ্যভাবাপন্ন পশু-পক্ষীদের অন্তত জীববিজ্ঞান থেকে তাড়িয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর গবেষণাদি সম্ভবত লাইব্‌নিৎস্‌-এরই সহযাত্রী।

অর্থাৎ তিনিও নিশ্চয় বিশ্বচরাচরে শুধুই মনের সোপানমার্গ প্রত্যক্ষ করেছেন; এবং বোধহয় সেই জন্যে রুষের চার্বাকপন্থীরা সাম্যবাদের সমর্থনে তাঁর প্রক্ষিপ্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিই আউড়ে বেড়িয়েছেন, কখনও ভুলে তাঁকে প্রকাশ্যে সাক্ষী ডাকেননি। পক্ষান্তরে সৌজাত্যবিদ্যার বংশানুক্রমিক অধিকারভেদ বিহেভিয়ারিজ্‌ম্‌-কেই বিপদে ফেলেছে, পাভ্‌লোভ্‌-এর অদ্বৈতবাদকে ছুঁতে পারেনি; এবং সম্ভবত সাধারণ স্বত্বের যথেচ্ছাচারেও

তাঁর সমজ্ঞান হারায়নি ব'লেই, মানুষ দূরের কথা, তিনি কুকুরের মধ্যেও হিপোক্রেটিস্-আদিষ্ট চতুর্বর্ণ চারিত্র্যের প্রস্তাবনা খুঁজেছেন। কিন্তু পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপরে প্রমিতির ভিত্তিস্থাপনা মূর্খের কাজ; এবং পাভ্‌লোভ্‌ পঠদ্দশায় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখালেও, ওই নামে যে-প্রাপ্তবয়স্ক বৈজ্ঞানিক আজ জগদ্বরেণ্য, তিনি কখনও ব্যাপকতার খাতিরে কোনও নিষ্প্রমাণ মতবাদের কুহকে মজেননি। বরং হঠকারী সামান্যীকরণ তাঁর এতটা অপ্রীতিকর লাগত যে সমপর্যায়ের সকল জীবকে একই জাতিব্যবসায়ে জোড়া যায় কিনা, তিনি সে-সম্বন্ধে প্রতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রেখেছেন। তথাচ মনোবিকলনের দাবি-দাওয়া একেবারে অমূলক নয়; এবং মৃত লোকনায়কের মমির বদলে ক্রুসারূঢ় দেবতার মৃত্যুঞ্জয় মূর্তিকে ভ'জেই তিনি তাঁর যাজকোচিত কুলপ্রথার পরিচয় দেননি, হয়তো উল্লিখিত অধিকারভেদে লাইব্‌নিৎস্ অপেক্ষা সেণ্ট্‌ অগাস্টিন্-এর প্রভাবই অধিক। কারণ প্রাণিমাত্রেই অল্প-বিস্তর ব্যক্তিস্বরূপে অধিকারী হোক বা না হোক, জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিত্য ও নৈমিত্তিকের অবস্থা-বিনিময় যেমন প্রগতির পরিপন্থী, চিরনির্বিকার তেমনই প্রাণধর্মের পক্ষপাতী; এবং যথারীতি অভ্যাসের পরে সকল কুকুরই বর্ণবিশেষকে খাদ্যের বার্তাবহ মনে করে বটে, কিন্তু এই শিক্ষণীয়তা নিশ্চয়ই সম্প্রসারিত চৈতন্যের নিদর্শন নয়, অপরিবর্তনীয় চিত্তবৃত্তিরই চিহ্ন। জীবনে বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে, সহজাত প্রতিক্রিয়ার অসহযোগেও সংঘটিত প্রতিক্রিয়া জন্মাত; এবং উপরন্তু সে-রকম নির্বাচনক্ষমতায় ফাঁকি প'ড়েও প্রাণপ্রবাহ যেকালে অদ্যাবধি থামেনি, কেবলই ঘুরে মরেছে, তখন জীব আপাতত স্বয়ংসম্পূর্ণ, এমনকি জড়প্রকৃতিও একই ধারায় অনাদ্যন্ত কাল বাঁধা। সম্ভবত সেই জন্যে খাবার পেয়েও কুকুরের লালা ঝরে, আবার লাল আলো জ্বলতে দেখেও তার জিভে জল আসে; এবং এই বিপরীত উত্তেজনার উত্তরে একই প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে কুকুর তার আলোকপ্রাপ্তির সংবাদ রটায় না, সে এই কথা বলে যে বস্তুজগতে বৈচিত্র্যের সুযোগ এতই পরিমিত যে আলোকে আহার্যের কোঠায় ফেলাই স্বাভাবিক। নচেৎ জন্ স্টুয়ার্ট্‌ মিল্-এর মতো সংশয়বাদীও অন্বীক্ষার আরোহণপদ্ধতির দোষক্ষালনে

প্রকৃতির সমভাব খুঁজতেন না; নতুবা সহস্র কোটি বৎসর আগেকার নক্ষত্ররশ্মিকে অত্যাধুনিক দৃক্‌শাস্ত্রের বিধান মানাতে গিয়ে ডি সিটার বিশ্ব-বিস্তারের অনর্থ বাধাতেন না; নয়তো পাভ্‌লোভ্‌-এর মতো ব্যক্তিবাদীর জীবন কাটত না সার্বজনীন নাড়ীমণ্ডলের চাপ ছ'কে।

সৌভাগ্যক্রমে সে-কথা পাভ্‌লোভ্‌ জানতেন; এবং তাই বিজ্ঞানের মতোই ব্রহ্মবিদ্যার চূড়ান্ত মীমাংসাও তাঁর সন্দেহ জাগাত। কিন্তু তিনি বুঝতেন যে অতীত ও বর্তমান লোকাচারে স্বাধীনতার সুদূর সম্ভাবনাও যদিচ দুর্ঘট, তবু অন্তত অনধিগম্য আদর্শ হিসাবে সেই অভীপ্সাই মানবত্বের একমাত্র লক্ষণ; এবং সাম্রাজ্য, গণতন্ত্র ও তথাকথিত সমানাধিকার, এই তিন শাসনপদ্ধতির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষে এসে তিনি স্বভাবত ভেবে-ছিলেন বটে যে স্বার্থচালিত মানুষ যন্ত্রপুত্তলী না হোক, অভ্যাসের দাস, তাহলেও মানতে তাঁর বাধেনি যে আত্মবেদের সম্মুখে অনিষ্টের শক্তি দাঁড়াতে পারবে না। কারণ বহিঃপ্রকৃতিকে না বেঁধেও, তার আংশিক পরিচয় পেয়েই মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য যখন এতখানি বেড়েছে, তখন তার অন্তঃপ্রকৃতি না বদ্‌লালেও, শুধু আত্মজ্ঞানের সাহায্যে সে হয়তো সকল হিংসা-দ্বেষকে ছাড়িয়ে যাবে; এবং এই আত্মজ্ঞান একা বিজ্ঞানের দাতব্য কিনা, সে-সম্বন্ধে পাভ্‌লোভ্‌-এর কোনও স্পষ্টোক্তি নেই। তবে তাঁর নিত্যকর্ম-তালিকায় শিল্প প্রভৃতির অনুশীলন এতখানি জায়গা জুড়েছিল যে ভজানো শক্ত সে-সমস্ত তাঁর অনাবশ্যক ব্যসন; এবং তাঁর বক্তৃতাবলীর আভাস-ইঙ্গিত সম্ভবত এই অনুমানের অনুকূল যে বিজ্ঞানকে তিনি জ্ঞানার্জনের উপায়মাত্র বিবেচনা করতেন। অর্থাৎ বিভিন্ন জীবনযাত্রার বিরোধী উপকরণের সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বিজ্ঞান একটা নির্দ্বন্দ্ব বিশ্ববীক্ষার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানচিত্র আঁকবে, বোধহয় এই ছিল তাঁর আন্তরিক আশা ও ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা; এবং সেই জন্যে আসন্ন বর্বরতার অবশ্যম্ভাবী অবসানে পুনরুজ্জীবিত মানবসভ্যতা ইভান্‌ পেত্রোভিচ্‌ পাভ্‌লোভ্‌-কে মনুষ্যধর্মের অন্যতম পুরোধা ব'লে চিনবে।

[১৯৩৭]

পরাধীন দেশ উদারনীতির শ্রীক্ষেত্র ; এবং তীর্থের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ যেহেতু সনাতন, তাই মনস্তত্ত্ব স্থানমাহাত্ম্য না মেনে বলে যে নির্জিত মানুষের মুক্তিমন্ত্র অবদমিত আত্মম্ভরিতার নামান্তর— অন্তত তার মূলে নিষ্কাম আদর্শের প্রেরণা নেই। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ, সাধারণ্যে আস্থাবান। কাজেই আমার কাছে মনোবিকলনের সিদ্ধান্ত প্রায়ই অবিশ্বাস্য ঠেকে, সন্দেহ হয় বৈজ্ঞানিক আভিজাত্যের অভাবেই হয়তো ওই অকুলীন বিদ্যা কালাপাহাড়ের পদাঙ্কে চলেছে। কিন্তু অহংকারকে সব সময়ে প্রতর্কের আড়ালে আগলে রাখা যায় না ; এবং সংশয়ের বেড়া এক বার ডিঙালে, আত্মধিক্কার একেবারে অসীমে পৌছায়। ফলত কয়েক বছর আগে আমাদের প্রগতিবিলাসী বুদ্ধিজীবীদের মুখে অস্‌ভাল্ড্‌ স্পেংলার-এর গুণ-কীর্তন শুনে য়ুং-কথিত সামবায়িক অচৈতন্যে আমার শ্রদ্ধা বাড়েনি বটে, কিন্তু দুধের অনটন যখন ঘোলেও মেটে না, তখন জাতিরা যে ব্যক্তির মতোই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙে, সে-সম্বন্ধে দ্বিধা ঘুচেছিল। অবশ্য সে-দিন আজ অতীত ; এবং সাম্প্রতিক জনসেবকেরা আর উদাসীন রাজপুরুষদের সামনে অস্তদেশের অমোঘ অধঃপতনের বিভীষিকা আঁকতে ব্যস্ত নন, মার্ক্‌স্‌-সংহিতার পাঠোদ্ধারে শাসকসম্প্রদায়ের কাণ্ড-জ্ঞান-হরণেই এখন তাঁরা বদ্ধপরিকর। তাহলেও এই রুচিপরিবর্তনে আমি সান্ত্বনা পাই না, বরঞ্চ প্রমাদ গণি। কেননা ভারতভূমিতে জ'ন্মেও আমি স্বভাবত স্বতোবিরোধী ব্রহ্মসাযুজ্যে বঞ্চিত ; এবং আর পাঁচ জনের মতোই আমার পক্ষে অসঙ্গতির অস্বীকার যদিও অসাধ্য, তবু হাওয়া-বদল যে হেতুবাদের সপত্নী নয়, তা আমি জানি।

সেই জন্যে আজ আমি প্রায় নিঃসন্দেহ যে মার্ক্‌স্ বা স্পেংলার-এর মর্মোদ্‌ঘাটনে ভারতবাসী নিরাগ্রহ, তাঁদের কথামৃতে আমরা কেবল এই আশ্বাস খুঁজি যে আমরা তো গেছিই, আমাদের হর্তা-কর্তারাও আর বেশী দিন নেই। অর্থাৎ পশ্চিমের উপক্ষয় আর প্রোলেটেরিয়েট্-এর অভ্যুদয়, উভয় উপনিপাতের সাহায্যে আমাদের উপস্থিত অক্ষমতার জ্বালা জুড়ায় ব'লেই, ভারতীয় চরম পন্থায় মার্ক্‌স্-স্পেংলার-এর একত্র সমাবেশ শোভন ও সম্ভব। তবে বর্তমান মন্তব্যে স্পেংলারী বিসংবাদের সাক্ষ্য খোঁজা ভুল; এবং প্রাচ্য জাতিসমূহের দৈন্যগ্রস্থিই উক্ত মনীষিদ্বয়ের একমাত্র যোগসূত্র নয়, এখানকার রাজনৈতিক দুর্গতির অন্য প্রতিকার থাকলেও, আপাতত তাঁদের সমপাঙ্‌ক্তেয় লাগত। কারণ অদৃষ্টবাদ আর আত্মবিশ্বাসের আতিশয্যেই তাঁরা হরিহরাত্মা নন, আশু ভবিষ্যতের সমাজ-সম্বন্ধেও দু জনের পরিকল্পনা ভয়াবহ রকমের এক। সে-সমাজ পিপীলিকা-ধর্মী: তাতে ব্যক্তিবৈচিত্র্যের অবকাশ নেই; স্তরভেদের সুযোগ নেই; ভৌগোলিক পরিস্থিতি তার ভাগ্যবিধাতা; এবং পরিণামী যন্ত্রশিল্পের নিষ্ঠুর নিয়মে তার গতিবিধি চির কালের মতো নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে সে-দুর্দশা শুধু জনসাধারণের ভোগ্য নয়, যে-স্বেচ্ছাচারী লোকনায়কেরা সেই ক্রীতদাসী সাম্যের অধিষ্ঠাতা, তারা সুদ্ধ যদৃচ্ছার বাহন তথা ঘটনাচক্রের ফল। অতএব সেই স্বৈরী যুগাবতারেরা জগৎ জুড়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবে, লুট-তরাজে নাগরিক সভ্যতাকে উৎসন্নে পাঠাবে, মানুষকে অনিকাম পশু-পক্ষীর সমান মাটির অধিকারে ফিরিয়ে আনবে; কিন্তু কারও চেষ্টাতে বিধ্বস্ত সমাজে প্রাগৈতিহাসিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

কেননা মানুষী সংকল্প মায়া-মরীচিকার চেয়েও অসার; কারুকলা দূরের কথা, অন্বীক্ষার মতো নিরপেক্ষ শাস্ত্রও কালধর্মেরই অভিব্যক্তি; এবং তথাকথিত নির্বাচনশক্তির ব্যবহারে আমরা আমাদের অবস্থান্তর ঠেকাতে পারি না, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ববিধানের পথই পরিষ্কার করি। সংক্ষেপে, মার্ক্‌স্ আর স্পেংলার, দু জনেই, জড়বাদী ও প্রজ্ঞাবিমুখ; এবং জন্ম-সময়ের পার্থক্য-বশত প্রথম প্রবক্তার হেতু-প্রত্যয় যদিও শেষোক্তের জ্যোতিষে এন্ট্রাপি-র আকার ধরেছে, তবু স্থানে-অস্থানে বিজ্ঞান-শব্দের

অপপ্রয়োগে উভয়ের মহামূল্য রচনাবলী দুষ্পাচ্য ও দুষ্পাঠ্য। কিন্তু তাঁদের সৌসাদৃশ্য এই পর্যন্ত; এবং য়িহুদী বংশে জ'ন্মেও মার্ক্‌স্‌ শুভবাদী, আর নিজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্পেংলারী দূরদৃষ্টিতে হিব্রুসুলভ নৈরাশ্য সুপ্রকট। তবে সে-জন্যে বিস্ময়প্রকাশ অনুচিত; অনেকের মতে সংঘর্ষমাত্রেই ঐক্যসূচক; এবং নর্ডিক্‌ জার্মানি যেহেতু সেমিটিক্‌ পরশ্রীকাতরতারই উত্তরাধিকারী, তাই সে-বৃত জাতি জার্মান্‌-দের অসহ্য। উপরন্তু স্বকীয়তা আর স্বতঃসঙ্গতি কখনও একাধারে ধরা দেয়নি; এবং আর্য দার্শনিক স্পেংলার আজীবন আপন তালে চললেও, গন্তব্যে পৌঁছে আর একজন য়িহুদী ভাবুকের কুসঙ্গে পড়েছেন। সে-ব্যক্তি ফ্রয়েড্‌; এবং তাঁর অতি-জটিল মনস্তত্ত্ব যে-মৌল মুমূর্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রাথমিক জাড্য, সেই আদিম ইনর্শিয়া-ই বোধহয় স্পেংলারী তত্ত্বজিজ্ঞাসারও ভিত্তি। অগত্যা অচির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁর ও মার্ক্‌স্‌-এর মধ্যে খুব বেশী মতদ্বৈত না থাক, শেষ অবধি তাঁরা একেবারে বিপরীত; এবং আগামী খণ্ডপ্রলয়ের উপসংহারে মার্ক্‌স্‌ যেখানে খুঁজে পেয়েছেন মৈত্রীময় স্বর্গরাজ্য, স্পেংলার সেখানে দেখাতে চেয়েছেন ভূতবিদ্যাবর্ণিত "তাপমৃত্যু।"

ইতিমধ্যে মার্ক্‌স্‌ সমন্বয়সাধক ডায়ালেক্‌টিক্‌-এর ভক্ত, পরিণামী কৈবল্যে নিষ্ঠাবান; এবং স্পেংলার অবিকল মনাড্‌-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, কালাবর্তজাত বুদ্বুদ্‌পরম্পরার বিচ্ছেদ-প্রমাণে যত্নপরায়ণ। অতএব ন্যায়শাস্ত্রের উপরে কোনও পক্ষের বিশেষ আস্থা নেই; এবং ভাষ্যকারের জীবনেতিহাস যেকালে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার তোয়াক্কা রাখে না, তখন জাতিসমূহের ঐকান্তিক কর্মঠবৃত্তি স্পেংলারী সর্বজ্ঞতার অন্তরায় নয়। কিন্তু সত্য যে এক ও অদ্বিতীয়, এ-মত-পোষণের সময় এখনও আসেনি; এবং ব্যতিক্রমই নিয়মের প্রাণ না হোক, অন্তত অপরিহার্য লক্ষণ বটে। সুতরাং এ-উভয়সঙ্কটে পক্ষপাত-প্রদর্শন মারাত্মক: তার চেয়ে বরঞ্চ এই মীমাংসা স্বীকার্য যে যাথার্থ্য মধ্যপন্থার পথিক; এবং পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের একটা অন্যের সর্বনাশ সাধে না, সম্পূর্ণতা আনে। তাছাড়া অকাল মৃত্যুর অত্যাচারে স্পেংলারী চিন্তাধারার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় আজ শুধুই অনুমেয়; এবং এতে

যদিচ সন্দেহ নেই যে তাঁর শেষ পুস্তক "দি আওয়ার অফ্ ডিসিশন্" নাৎসী নিগ্রহনীতির পরিপোষক, তবু রাজনৈতিক সংক্রামে তত্ত্ববিচার একেবারে মরে না ব'লেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। অবশ্য স্পেংলার নিজে এ-ধারণার প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু হেগেল্-এর সাক্ষ্য তাঁর বিরুদ্ধে; এবং সেই রক্ষণশীলের তর্কবিদ্যা যেমন বামাচারী বিপ্লবীদের বীজমন্ত্র, তেমনই তাঁর সমসাময়িক ও সহমর্মী, স্বাধীনতাসেবী ফিশ্তে-ই নাকি ফাশিস্ট্-দের দীক্ষাগুরু। সম্ভবত সেই জন্যে দর্শনের নামে কৃতকর্মাদের মুখে হাসি ফোটে; এবং অজ্ঞাতসারে হিউম্-প্রভৃতি দার্শনিকদের প্রতিধ্বনি ক'রেই তারা চড়া গলায় রটায় যে পরাবিদ্যা বুড়ো বয়সের ছেলেখেলা।

তাহলেও দর্শন আছে, কেবল এই অভিমতে পৌঁছানোর জন্যে দর্শনালোচনা আবশ্যক নয়, দর্শন নেই, এ-অনুমানও দর্শনসাপেক্ষ; এবং তথ্য-বিমুখ তত্ত্ব যদিও উপহাস্য, তবু তত্ত্ববিরহিত তথ্য নিরুপাখ্য। অতএব স্পেংলার-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তির কোনও মানে নেই যে তাঁর স্বাভাবিক মতিগতি তাঁকে যে-বিশ্ববীক্ষার অন্তর্বর্তী করেছে, তাতে তথ্যমাত্রেই বিকারগ্রস্ত। কারণ অনুরূপ অভিযোগ তো সকল ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে খাটেই, এমনকি অতগুলো তথ্যের অমন সামঞ্জস্যসিদ্ধি যেহেতু অন্যত্র বিরল, তাই গ্রন্থখানির শত দোষ সত্ত্বেও "দি ডিক্লাইন্ অফ্ দি ওয়েস্ট্"-এর অনাদর হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা। এ-প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আর্নল্ড্ টয়েন্‌বি-র তুলনা অবান্তর নয়; এবং স্পেংলারী অবচ্ছেদবাদের খণ্ডনে টয়েন্‌বি দ গোবিনো, এডুয়ার্ড্ মেইয়ার, গিল্‌বর্ট্ মারে ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষণে যে-সেতুবন্ধনির্মাণে অগ্রসর, তাতে ইংরাজদের ভাবালু উদারনীতির হস্তাক্ষর যতই স্পষ্ট দেখাক না কেন, তথ্য ও তত্ত্বের নির্দ্বন্দ্ব হয়তো আরও দুর্ঘট। অবশ্য বিভিন্ন দেশ-কালের পৃথক পৃথক সংস্কৃতির মধ্যে এক ও অবিভাজ্য মানবজাতির ক্রমবিকাশ খুঁজলে, বিশেষ কোনও পক্ষপাত ধরা পড়ে না, বরং জাত্যভিমানের প্রত্যাহারই প্রকাশ পায়; এবং এ-দিক থেকে টয়েন্‌বি যেমন প্রশংসনীয়, পাশ্চাত্ত্য স্বাতন্ত্র্যের প্রচারক ফিশার-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তেমনই নিন্দাভাজন। তথাচ দার্শনিকের কাছে এ-নিরাসক্তির বিশুদ্ধি তর্কাতীত নয়; এবং এর সাহায্যে মনুষ্যজাতির

প্রতিপত্তি সুপরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিজস্ব নিপাতে যায়, বিবর্তন আর লীলার সীমাসন্ধি মোছে, সম্পর্কের বালাই ঘুচিয়ে ব্যক্তি অ্যারিস্টটেলীয় ভগবানের পাশে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তিবাদের কোনও সার্থকতা থাকে না।

কারণ এ-কথা যতই নিশ্চিত হোক না কেন যে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যেহেতু একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ আছে, তাই পারিপার্শ্বিক বদ্‌লালে, মানুষও অগত্যা বদ্‌লায়, তবু সমাজের পরিবর্তনে যদি প্রতিবেশের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে, তবে শুধু ভাবী স্থিতিস্থাপনের প্রবর্তনা চোকে না, সেই সঙ্গে বস্তুজগতের অস্তিত্বও শূন্যে মেশে। আমার বিবেচনায় মার্ক্‌স্‌-এর মতো সূক্ষ্মদর্শী প্রগতিসাধক এই প্রাথমিক ভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন-নি, এবং তৎসত্ত্বেও তাঁর সাবধান জড়বাদ শেষ পর্যন্ত বার্ক্লি-প্রস্তাবিত অবরোধপ্রথার অন্তরালে আত্মগোপন না করুক, অন্তত কাণ্ট্‌-কীর্তিত অনির্বচনীয়তায় তলিয়ে গেছে। অর্থাৎ এখানেও বিষয়ী বিষয়কে নিরুপাধিক জেনে নিজেই বিশ্বম্ভর-পদবী নিয়েছে; এবং এর ফলে প্রমিতি তো মনস্কাম-সিদ্ধির শাসনে এসেছেই, এমনকি লোকায়ত সুদ্ধ লোকোত্তরে দিশা হারিয়েছে। কেননা যে-জীব বাইরের খেয়ে বাঁচে, পরিপাকের পূর্বেই সে নিশ্চয় খাদ্যসচেতন; নচেৎ সে যেমন অনাহারে মরতে বাধ্য, তেমনই মৃত্যুর সন্নিকর্ষও কোনও দিন বোঝে না। আসলে প্রগতির প্রথম পুরোধা হেগেল্‌ এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন; এবং বাস্তব ও বোধ্যতাকে তুল্যমূল্য ভাবার দরুন তাঁর মতে ভূমাই সত্য আর সংসার সত্যাভাস বটে, কিন্তু তাঁর কাছে নির্গুণ সত্তা যেকালে অসদেরই সমান এবং ডায়ালেক্‌টিক্‌ প্রসর্পণ জ্ঞানার্জনের অনন্য উপায়, তখন জগৎপ্রপঞ্চকে তিনি আবশ্যিক ব'লেই মানতেন, তিনি জানতেন যে অমৃত বিরাজমান মর্ত্যের সোপানশিখরে।

খুব সম্ভব এই রকম একটা অমরাবতীর সন্ধানেই টয়েন্‌বি-র অভীপ্সাও সঞ্চরণশীল। তথাচ তাঁর বিচারে প্রাকৃতিক প্রভাবের ন্যায় প্রত্যয়ের উন্নয়নও অনির্দিষ্ট, এবং মানুষ আপন ভাগ্যনির্বাচনের ক্ষমতা ধরে। ফলত তিনি শুধুই সভ্যতার আনুপূর্বিকতা দেখিয়েছেন, একাধিক সংস্কৃতির সমকালীন প্রতিযোগও হয়তো প্রমাণ করেছেন, কিন্তু পর্যায়বিশেষের

জরা বা মৃত্যুর কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অথচ জীবযাত্রার অনন্ত পথ যে পতন ও অভ্যুদয়ে বন্ধুর, তা সর্ববাদিসম্মত ; এবং সমুদয় জাতির স্বতন্ত্র পুরাবৃত্তে সাদৃশ্য ও বৈষম্য যে অন্তত সমানুপাতিক, এ-সম্বন্ধেও বোধহয় কারও সন্দেহ নেই। অবশ্য পদার্থবিজ্ঞান আজ কার্য-কারণের শৃঙ্খল-মুক্ত ; এবং কোনও অবস্থার যথাযথ পুনরাবৃত্তি যেহেতু অঘটনীয়ই নয়, অভাবনীয়ও বটে, তাই নির্বিকল্প-ন্যায়ের মতো নিত্য প্রকৃতিও হয়তো একটা আদর্শ, অসাধ্য আদর্শ। পক্ষান্তরে ইতিহাসে গণগণিতের প্রচলন হাস্যকর ; এবং কার্যত আমরা হেতুবাদের সমর্থন পাই বা না পাই, নিমিত্তে ভক্তি হারালে, ইতিহাসও রূপকথার ভেক পরবে। আমার বিশ্বাস স্পেংলার-ই এ-রকম মায়াবাদের একমাত্র প্রতিবন্ধক। কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে সভ্যতা হেগেলীয় উল্লম্ফনে অন্বয়ের সোপান পেরিয়ে অখণ্ড ভূমার দিকে অনবরত ছোটে না, তার ঘূর্ণমান আয়ুর কম্বুরেখা তাকে অবশেষে নাস্তির আয়ত্তে আনে। অর্থাৎ তাঁর বিচারে সভ্যতা ব্যক্তিস্বভাব, তার স্বাস্থ্যও সুপরিমিত, জরা-যৌবন, ক্ষয়-বৃদ্ধি, জন্ম-মৃত্যু, এ-সমস্তই তাকে অর্শায় ; এবং এ-কথা কেবল উপমা নয়, তাঁর মতে এক-একটি সভ্যতাব্যষ্টি আসলে এক-একজন মানুষের মতোই নশ্বর ও সাবকাশ।

তবে সেই অসম্পৃক্ত চক্রগুলো যদিও স্বাবলম্বী, তবু তাদের প্রাণধর্ম বৈশিষ্ট্যবর্জিত ; এবং কোনও সাধিতপূর্ব সাম্যে তাদের অধিকার না থাকলেও, তারা সকলে একটা নির্বিকার প্রতিমানের অনুবাদক। সেই জন্যে প্রত্যেক সভ্যতার মৌলিক উপকরণ মোটামুটি এক রকম ; প্রত্যেকের বিভিন্ন দশা সকলের মধ্যে অনুক্রমিত ; এবং প্রত্যেকের প্রধান প্রধান সংস্কার অঙ্কশাস্ত্রের মতো, যার তথ্যসমূহ প্রামাণ্য বটে, কিন্তু প্রমাণনিরপেক্ষ নয়। উপরন্তু সকল সভ্যতার মুখ্য অবস্থাগুলো শুধু তুল্যমূল্য নয়, অনুরূপ ঘটনাগতিকে যত সব মহাপুরুষ গ'ড়ে ওঠে, তারাও আচারে-ব্যবহারে, এমনকি আকারে-প্রকারে, অভিন্ন ; এবং গ্রীসের অ্যালেক্‌জাণ্ডর রোমের সীজার-রূপে পূজা পেয়ে আবার ফরাসী নেপোলিয়ন্-এর দেহে অম্লান বদনে আশ্রয় নেয়। সুতরাং স্পেংলার-এর বিবেচনায় এ-রকম সিদ্ধান্ত সমীচীন যে সভ্যতাও মানুষের মতো পুনরাবৃত্তিপ্রিয় ; এবং

মরণই যেহেতু পুনরাবৃত্তির চূড়ান্ত, তাই মানুষ বা সভ্যতা কেউ আজ পর্যন্ত অমৃতনিকেতনের উদাত্ত আহ্বানে কান পাতেনি। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যাবর্তনস্পৃহা প্রবৃত্তিঘটিত, ফ্রয়েডী অচৈতন্যের ব্যাপার; এবং সভ্যতা মানবসমষ্টির সম্মিলিত চিৎপ্রকর্ষের নাম। সুতরাং ব্যক্তির বেলায় যে-চালনা প্রবৃত্তি থেকে আসে, সভ্যতার পক্ষে সে-প্রেরণা জন্মায় প্রত্যয়ে; এবং ব্যক্তি যেমন ক্রমান্বয়ে প্রাক্তন অবস্থা খুঁজতে খুঁজতে শেষ কালে আদিম জাড্যে ফিরে যায়, সভ্যতাও তেমনই কতকগুলো সার্বভৌম প্রত্যয়ের নিষ্কর্ষণ করতে করতে অবশেষে বিষয়বিবিক্ত অনর্থে পৌঁছায়।

তখন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ঘৃতলোভীকে ঋণপরিগ্রহের পরামর্শ যোগায়, প্লেটো-প্রোক্ত ক্ষমা খৃষ্টানসংহারে বাধা দেয় না, স্বাধীন বাণিজ্যের সংরক্ষণে বৃটিশ্ সাম্রাজ্য দিগ্বিজয়ে বেরোয়। কারণ সভ্যতাও ব্যক্তির মতোই অহংসর্বস্ব; তার ঐতিহাসিক দৃষ্টি নেই; সে ভাবে না অন্যদের উপরে তার প্রভাব ছড়াতে পারে; এবং পূর্ববর্তী ভ্রান্তির পুনরভিনয়ে সেও যে সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছে, এমন সংশয়ের স্থান তার দুঃস্বপ্নেও নেই। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি আর প্রত্যয়ের সতরঞ্চ-খেলার অন্ধ ঘুঁটি-মাত্র; এবং নির্বিকার প্রকৃতি ও আত্মরত প্রত্যয় এত সমবল যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যেক ক্ষেপেই চালমাৎ অনিবার্য। অবশ্য এটা একটা প্রতীক; এবং এই চিত্রকল্পের পিছনে কোনও পরমার্থ লুকিয়ে আছে কিনা, সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত সহজ ও সম্ভবপর। তাছাড়া এ-প্রসঙ্গে স্পেংলার নিজেই হয়তো নিজের মন বোঝেননি: কখনও বা সকল সভ্যতার মধ্যে একই আদর্শের স্বায়ত্তশাসন দেখিয়ে বলেছেন যে এই আদর্শ প্রারম্ভে মানস লোকে জন্মালেও, ক্রমশ সমস্ত বস্তুজগৎ গিলে, অন্তিমে অজীর্ণ-রোগে মরে; আবার সময়ে সময়ে তাঁকে টেনেছে এর বিপরীত সিদ্ধান্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জড়বাদ বা জীববাদ, যে-দিকেই ঝুঁকুন না কেন, তার ফলে তাঁর গভীর গবেষণা, বিরাট দৃক্‌শক্তি ও নিষ্প্রমাদ কালজ্ঞানের মূল্য এক তিল কমবে না; এবং এই তিন দুর্লভ গুণের সংমিশ্রণেও তাঁর যুক্তি-জালের নাতিবহুল ফাঁকগুলো ভরবে না বটে, তবু এ-কথা বলার দুঃসাহস অন্তত আমার নেই যে অবিচল ন্যায়নিষ্ঠাই সত্য-মিথ্যার একমাত্র ব্যাবর্তক।

উপরন্তু পুনরাবৃত্তিই ভারতীয় বিশ্ববীক্ষার প্রাণ; এবং একদা এ-দেশের সন্দেহ ছিল না যে শুধু যুগচতুষ্টয় কেন, যুগাবতারেরা সুদ্ধ কেবলই ঘুরে ঘুরে আসতে বাধ্য। অনেকে আবার এতেও সন্তুষ্ট হতেন না; এবং ইন্দ্রাদি দেবতা কোন্ ছার, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত তাঁদের মতে যখন অনিত্য, তখন স্পেংলার হয়তো তাঁদের কাছেই শিখেছিলেন যে পুরাণ পুরুষ উদ্‌ভাবনার শক্তিতে শোচনীয় রকমের দরিদ্র। অন্ততঃপক্ষে এ-কথা ইতিহাসসম্মত যে হিন্দু ভাবনার সঙ্গে জার্মানির প্রথম পরিচয় আঠারো শতকের মধ্যভাগে; এবং শোপেন্‌হাউয়ার-এর সময় থেকে সেখানকার একাধিক ভাবুক জ্ঞাতসারেই সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবিত। সুতরাং স্পেংলার-এর চিন্তাধারায় আমাকে এতখানি আকৃষ্ট দেখে উভয়ের ধমনীতে আর্য রক্তের উপস্থিতি স্মরণীয় নয়; এবং শোণিতশুদ্ধির কিংবদন্তী যত না অবিশ্বাস্য, ততোধিক কষ্টকল্পনা সেই মনোভাব, যার প্ররোচনায় আমরা আজও না হেসে বলতে পারি যে বর্তমানের বিমান রামায়ণী পুষ্পকরথের নিকৃষ্ট সংস্করণ। আসলে উক্ত আত্ম-শ্লাঘার মূল জন্মান্তররহস্যের আশাবাদী ভাষ্যে; এবং শুধু মহাভারত নয়, রঘুবংশও প্রমাণ করে বটে যে হিন্দুস্থানে ট্র্যাজেডির নিষেধ আর একটা কবিপ্রসিদ্ধি, তবু বোধহয় বৈনাশিক ছাড়া অন্য কোনও সম্প্রদায় কর্মফল ও অধঃপাতের সহযোগ ঘুচিয়ে, বৃত্তিকে শূন্যে তাড়িয়ে বেড়াননি। সেই জন্যে আমি প্রায় নিশ্চিত যে স্পেংলার-এর যথার্থ বক্তব্য এক বার বুঝলে, আমরা কখনও ভুলে তাঁর নাম নেব না; এবং ইতিমধ্যে আমরা যদি ভাবি যে তাঁর লেখায় কালের যে-চক্রান্ত ব্যক্ত, তার প্রশ্রয়ে কালনেমির লঙ্কাভাগ সম্ভব, তাহলে, জানব আমাদের কপালে আরও দুর্দশা আছে। কেননা স্পেংলার-এর তত্ত্বে যা যায়, তা একেবারে যায়; এবং যা থাকে, তার মৃত্যু যেমন অমোঘ, তার অবচ্ছেদ তেমনই দুস্তর।

অর্থাৎ বনগাঁয়ের শিয়ালরাজারাই স্পেংলার-এর মূল প্রতিপাদ্যে আরাম পাবেন; এবং পশ্চিমের অস্ত আর প্রাচ্যের উদয় যে এক নয়, তার প্রমাণ খুঁজতে ভারতীয় ভাবলোকের অন্তরঙ্গ পরিচয় অনাবশ্যক। কারণ কিছু কাল আগে কলিকাতা দর্শন পরিষদের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে এক

নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যে জুটেছিল; এবং যেহেতু শুনেছিলুম যে সে-অনুষ্ঠানে সনাতন সমস্যা-সমূহের চর্বিতচর্বণ বন্ধ রেখে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহকর্মী ও সহধর্মীরা তাঁর সত্তর বৎসর-ব্যাপী জ্ঞানসাধনায় ঐক্যসূত্র ধরিয়ে দেবেন, তাই দার্শনিক না হয়েও সে-সম্মেলনে ভিড় বাড়াবার লোভ আমি সামলাতে পারিনি। দুঃখের সঙ্গে মানছি যে সে-দিন আশাকে আবার কুহকিনী ব'লে চিনেছি; এবং ওজস্বিনী বক্তৃতার অনন্ত বন্যায় বারংবার তলিয়ে গিয়ে যদিও নিঃসন্দেহে জেনেছি যে আচার্যদেবের সকল শিষ্যই বিদ্যা-বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, তবু সেই ধুরন্ধরদের আলোচ্য বস্তু, ব্রজেন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, আলোচনার পূর্বে যে-তিমিরে ছিল, এখনও সেই তিমিরে সমাচ্ছন্ন। অবশ্য আমার মূঢ়তার দায় সেই কৃতকর্মাদের উপরে চাপানো অনুচিত: ক্ষুদ্র বুদ্ধি-বশত আমি প্রায়ই বাগ্‌বিস্তারের মর্ম হারিয়ে ফেলি; এবং পরে যখন ভাববার অবসর মেলে, তখন দেখি যে প্রথমে যে-কথাকে নিরর্থক লাগে, ক্রমশ ধরা পড়ে তারই অর্থগৌরব। উক্ত ক্ষেত্রেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি: স্মৃতিতে সে-সভার কার্যাবলী অশোভন ঠেকলেও, তার আত্মজৈবনিক বাক্যচ্ছটায় এখন আর আমি অভিভূত নেই; এবং অনেক অনুচিন্তার পরে আজ স্পষ্টই বুঝেছি যে দার্শনিকদের গুরুভক্তি স্বপ্রাধান্যের ছদ্মবেশেই লোক-সমক্ষে আসে।

অথবা প্রাচ্য দর্শনের একীভাব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত পণ্ডিতবর্গ নিজেদের বিজ্ঞাপনে গুরুকে বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছিলেন; এবং শতমুখ আত্মপ্রসাদের মধ্যেও তাঁরা আচার্যদেবের নাম নিতে ভোলেননি—এমনকি প্রত্যেকে নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে মেনেছিলেন যে ভারতী-ভাণ্ডারের বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যাপনা বা সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী ফল। দুর্ভাগ্যক্রমে এ-প্রশস্তি যতখানি সুশ্রাব্য, সে-পরিমাণে মূল্যবান নয়; এবং নাটকের সূত্রধার অপরিহার্য বটে, তবু দর্শক স্বভাবত কুশীলবদেরই মনে রাখে। অবশ্য স্মৃতি-বিস্মৃতির অনেক-খানি দৈবাধীন; এবং লোকযাত্রার পিচ্ছিল পথে অধিকাংশ মহাপুরুষের পদরেখা ইদানীং দুর্নিরীক্ষ্য। বিশেষত যাঁরা দিশারী, কোনও লক্ষ্যে

পৌঁছাননি, শুধু সম্ভাবনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁরা হয়তো ঐতিহাসিক মানুষ নন; এবং ঋণকুণ্ঠ সংসার তাঁদের ধার শুধেছে পুরাণের যাদুঘর-নির্মাণে। কিন্তু সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় নিয়ামকেরা শত সহস্র বৎসর পূর্বে ইহলোক ছেড়েছেন; এবং ব্রজেন্দ্রনাথ আজও জীবিত, এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে বাণীলোভী ভারতবাসীর প্রত্যাশা মেটেনি। সুতরাং যখন দেখলুম যে সমবেত মনীষীরা ইতিমধ্যেই তাঁর উত্তরাধিকারে ভাগ বসাতে ব্যস্ত, তখন আমি না ভেবে পারিনি যে ব্যাপারটা অবিচার তো বটেই, অত্যাচারও কম নয়। আসলে বিদ্যানুরাগ যতই প্রগাঢ় হোক না কেন, কেবল পাণ্ডিত্য সর্বত্রই উপহাস্য; এবং তর্কের খাতিরে যদি ধ'রে নিই যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যতীত অন্য কোনও আখ্যা ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাপ্য নয়, তবে তাঁর গুণমুগ্ধ গত তিন পুরুষের বাঙালীরা যেমন নির্বোধ, তাঁর প্রেরণায় প্রবর্তিত অগণ্য ভাবুকের দলও তেমনই কপোলকল্পনা।

প্রকৃত পক্ষে আচার্যদেব বিদ্যাদিগ্‌গজদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্ব স্তরের লোক; এবং তাঁর সর্বজ্ঞতা নিশ্চয়ই অবিসংবাদিত, কিন্তু আরও অবিসংবাদিত তাঁর ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে বহু দিন যাবৎ বাঙালী মনীষার প্রতিভূকল্প ক'রে রেখেছিল; এরই কল্যাণে তিনি অসংখ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষণার পাথেয় যুগিয়েছেন; এবং এরই দৌরাত্ম্যে তাঁর কোনও স্থায়ী অবদান হয়তো মানুষী চিৎপ্রকর্ষে থাকবে না। কারণ অনেকের মতে অহমিকাই ব্যক্তিত্বের পাদপীঠ; এবং তার সংঘাতে অনুযাত্রের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়ে তাকে জ্ঞানান্বেষণে নামানো গেলেও, স্বতন্ত্র সত্যের সন্দেশ আনে মমত্বমুক্ত নিরাসক্তি। অর্থাৎ ব্যক্তিবাদী ভূমাবাদীর বিধর্মী; এবং তত্ত্বরচনার জন্যে একটা কোনও নৈর্ব্যক্তিক তন্মাত্রের অখণ্ড উপলব্ধি যেহেতু অত্যাবশ্যক, তাই নীট্‌শে-প্রমুখ সোহংস্বামীরা দর্শনের অছিলায় কাব্যচর্চাতেই মাতেন, হিউম্‌-পন্থী যুক্তিসর্বস্বদের আয়ত্তে আসে অলক্ষ্যভেদের ব্রহ্মাস্ত্র। তবে এ-অনুমান অনেকের কাছেই অসঙ্গত ঠেকবে; এবং আর কেউ প্রতিবাদের প্রয়াস না পাক, অন্তত আচার্যদেবের শিষ্যমণ্ডলী সমস্বরে বলবেন যে নিরহংকার ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু বিনয়ব্যবহারের জন্যে বিশ্ববিশ্রুত নন, ভূমানন্দও তাঁর

জীবনের আদিম ও অবিকার অনুভূতি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা তাঁদের প্রথম প্রস্তাবের সাক্ষ্য ; এবং তাঁদের দ্বিতীয় দাবি যে অনতিরঞ্জিত, তার প্রমাণ শীল মহাশয়ের তরুণ বয়সের অপ্রকাশিত মহাকাব্য "দি কোয়েস্ট্ ইটার্ন্যাল্।"

অধিকন্তু শুনেছি যে ব্রজেন্দ্রনাথ সত্যের যূপে একাধিক বার স্বার্থবলি তো দিয়েইছেন, এমনকি বৈষ্ণবদের খৃষ্টের পদান্তে বসিয়েও তিনি ঐতিহাসিক সততাকে দেশাত্মবোধ-রূপ শনির দশা থেকে বাঁচিয়েছেন। তথাচ আমার বিবেচনায় আচার্যদেব আত্মরত মানুষ ; এবং তাঁর চিন্তা-জগতের ভিত্তি যদিও একটা বিরাট্ উপলব্ধির উপরে, তবু সে-উপলব্ধি আপাতত আত্মোপলব্ধি— তাতে বোধহয় নৈরাত্ম্যের বীজ নিহিত নেই। অবশ্য এ-আত্মোপলব্ধিকে দৈনন্দিন আত্মম্ভরিতার সমপঙ্‌ক্তিতে ফেলা হঠকারিতা ; কিন্তু সাংসারিক অহংজ্ঞানের মতো দৈন্যবোধের গ্রন্থি থেকেই এরও উৎপত্তি। তবে সে-দৈন্যবোধে ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের স্থূল হস্তাবলেপ নেই, ঐকপদিক অসম্পূর্ণতা সেখানে জাতীয় আত্মগ্লানিতে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমী ঐতিহ্যের তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির অকিঞ্চিৎকরতাই তার উপলক্ষ ; রামমোহনী গৌরতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তার সাফল্য ; এবং তার ব্যসন প্রাদেশিক কূপমণ্ডুকত্ব। কারণ রামমোহনের পরবর্তীরা অনেক ঠেকে শিখেছিলেন যে সে-অগ্রদূতের নবাবিষ্কৃত ভাবরাজ্যে বাঙালীর উপনিবেশস্থাপনের উদ্যোগ আদৌ মঙ্গলময় নয় ; এবং সে-অঞ্চলের বাসিন্দারা অতীতের অবরোধ এড়িয়েছে বটে, বর্তমানের স্বায়ত্তশাসন তথাচ তাদের হাতে আসেনি। অর্থাৎ তারা এক দাসখত ছিঁড়ে ফেলে আর এক দাসখতে নাম লিখেছে মাত্র, ভিক্ষা-জীবিকার বদলে স্বোপার্জনের সামর্থ্য পায়নি। তাই ব্রজেন্দ্রনাথের যুগ স্বাবলম্বন-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে ; এবং তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁকে নেতৃত্বে ব'রে ত্রিভুবনে খবর পাঠালেন যে পশ্চিমের অমূল্য ধনরত্ন প্রাচ্য কোষাগারেরই লুণ্ঠনাবশেষ।

অচিরেই সাংখ্যে হিন্দু "পজিটিভ্ সায়ান্স্"-এর এজাহার বেরোল ; কণাদ অণুবাদী বৈজ্ঞানিকদের গোষ্ঠীপতি হয়ে উঠলেন ; এবং যে-নব্যন্যায়

নবজাত শিশুর ক্রন্দনকে কর্মবাদের অখণ্ডনীয় প্রমাণ হিসাবে গুণে এসেছে, শোনা গেল পাশ্চাত্ত্য লজিক্ তার সামনে নাকি নিরবধি অধোবদনে থাকবে। উপরন্তু আমরা ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারেই থামলুম না; যে-সর্বনাশা ব্যবকলন ও অমানুষিক সত্যানুরক্তি য়ুরোপীয় বুদ্ধি-ব্যবসায়ীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, তাতেও তাকে হারানোর আয়োজন চলতে লাগল। বলাই বাহুল্য সেই উত্তেজিত বিদ্রোহের মধ্যে দার্শনিকশোভন প্রশান্তির সুযোগ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথেরও জোটেনি; এবং হয়তো সেই জন্যে তিনি ভেবে দেখেননি যে প্রাচীন আর্যাবর্তে যদি অর্বাচীন অস্তদেশের অশরীরী প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই না মেলে, তবে ভারতের নাম-সংকীর্তন যতটা লজ্জাকর, তার পুনরুজ্জীবন ততোধিক পণ্ড শ্রম। তবে দৈবকৃপায় সে-অনাসৃষ্টির প্রকোপ সম্প্রতি কমেছে; এবং মানসিক পরিশ্রমের আধিক্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ না ঘটলে, শীল মহাশয় নিশ্চয়ই "নিউ এসেজ্ ইন্ ক্রিটিসিজ্ম্" অথবা "পজিটিভ্ সায়ান্সেজ্ অফ্ দি এন্শ্যেন্ট্ হিন্দুজ্"-এর অপেক্ষা মহার্ঘ্য বই একাধিক বার লিখে ফেলতেন। কিন্তু তাহলেও তত্ত্বদর্শনের একটা নূতন সমন্বয় আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতুম কিনা সন্দেহ; এবং বর্তমান জীবনের অশেষ বৈচিত্র্যই এ-সংশয়ের প্রথম কারণ বটে, তবু ব্রজেন্দ্রসাহিত্যের সর্ববাদিসম্মত দুর্বোধ্যতা, আর পক্ষান্তরে তাঁর অনুষঙ্গপ্রধান চিন্তাপ্রকরণের বিশৃঙ্খলা, এ-জন্যে কিয়দংশে দায়ী।

অবশ্য উক্ত দুরূহতা ও অবচ্ছেদ যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাক্তন অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তাতে হয়তো মতান্তর নেই; এবং তাই তাঁর মনকে আবাল্য পরিণত বলাও সমীচীন। তার মানে এ নয় যে ব্রজেন্দ্রনাথের মতামত জন্মাবধি বদ্‌লায়নি: বরং উল্‌টোটাই সত্য; এবং তাঁর কৈশোরিক হেগেল্-ভক্তি বার্ধক্যে স্বভাবতই বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে মিশে গেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন স্বাভাবিক হলেও, অনিবার্য নয়; এর মধ্যে কোনও অকাট্য যুক্তিসূত্রের চিহ্ন মেলে না; এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরে তাঁর অগাধ আস্থাই তাঁকে সমস্ত তুলামূল্য উৎরিয়ে অবাধ নিঃশ্রেয়সের সামনে এনেছে। সুতরাং এই ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে হেগেল্-এর ডায়ালেক্‌টিক্-প্রসূত নির্বিকল্প কৈবল্যের কোনও সম্পর্ক নেই: এ-নিরুপাধিক অনুভূতি

অচিন্ত্য ; অপবাদ-ন্যায়ের নেতিনেতিই এর একমাত্র সংজ্ঞা ; এবং তত্ত্ব-দর্শনের উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের অতিবিশিষ্ট অভিজ্ঞতাকেও সামান্যের অনুবন্ধে বাঁধা, সেই জন্যে ব্রজেন্দ্রনাথের স্বয়ংসিদ্ধি এ-পর্যন্ত কোনও চিন্তাপরম্পরা গড়তে পারেনি, মরমী প্রভাবে অন্তরঙ্গদেরই অন্তঃপ্রেরণা যুগিয়েছে। সে-ইষ্টাপত্তিও নিশ্চয় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ; তবে যাঁরা তত্ত্ব-সমন্বয়ের প্রণেতা তাঁদের ধরণ-ধারণ অন্য রকমের। বুদ্ধি ও ধারাবাহিকতাই সে-প্রতিভার গুণ ; এবং সে-প্রকৃতি মুখ্যত হেতুপ্রভব। পক্ষান্তরে হেতুবাদে নির্ভর ঘুচিয়েও অন্বীক্ষার উপরে আস্থা রাখা একেবারে অসাধ্য নয় ; এবং ব্র্যাড্‌লী-বর্ণিত সত্যের স্বরূপে সদসদের নির্দ্বন্দ্বও তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত।

অতএব উল্লিখিত মন্তব্যের সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথকে অন্যায় আচরণের জন্যে সনাক্ত করা আমার অনভিপ্রেত। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু আর গণিতবিলাসী বিপরীত পথের পথিক ; এবং শেষোক্তের শুচিগ্রস্ত নিত্যপদ্ধতি প্রায়ই প্রথমোক্তের ব্যবহারে আসে না। কারণ তথ্যই যদিও সব অনর্থের মূল, তথাচ তদ্ব্যতীত তত্ত্বের অন্য উপকরণ নেই ; এবং তত্ত্বের বেলা অন্তর্দর্শন আবশ্যিক বটে, তবু ভূয়োদর্শনও দুরাক্রম্য। এইখানেই সমন্বয়ের প্রয়োজন ; এবং তাত্ত্বিক যখন নিজেকে কোনও নির্বিভাষিক নিয়মের নিমিত্তমাত্র ভেবে পুরুষার্থ আর পরমার্থের দুস্তর ব্যবধানে লজিক্‌-এর সেতুবন্ধ গড়েন, তখনই তিনি তথাগত, তার আগে পর্যন্ত ব্যাসকূটের পদকর্তা দ্বৈপায়ন। অর্থাৎ আমার মতে ব্রজেন্দ্রসাধনার অন্তর্গূঢ় নিঃসম্পর্কতাই আর্য আদর্শের অমোঘ অভিব্যক্তি ; এবং প্রতিকূল জনশ্রুতি সত্ত্বেও আমি না মেনে পারি না যে আমাদের চিত্তবৃত্তি প্রকৃত ফিলজফির অন্তরায়। অন্ততঃপক্ষে আমাদের কাছে প্রামাণ্য এখনও প্রজ্ঞার অগ্রগণ্য ; এবং সে-প্রামাণ্য আধুনিক কালে আপ্তবাক্যের আঁচল ছেড়ে আত্মবেদের ভেক নিয়ে থাকলেও, যুক্তিকে আমরা জাল ব'লেই জানি। কাজেই বৈনাশিকেরা এ-দেশে তিরস্কার কুড়িয়েছে, প্রাচীর পূজা পেয়েছে ধর্মধ্বজেরা ; তাই হিন্দু দর্শন সার্থক গদ্যে লিপিবদ্ধ হয়নি, সূত্রাকারে অথবা সংক্ষিপ্ত শ্লোকে স্বাধিকারপ্রমত্ত ভাষ্যকারদের প্রশ্রয় দিয়েছে ; এবং সেই জন্যে একই ন্যায়নিষ্ঠার তাগিদে জ্যামিতির গড়া-ভাঙা

ভারতীয় কীর্তিকলাপের অন্তর্গত নয়, পাশ্চাত্ত্য ধীশক্তির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কিন্তু বিদেশের আত্মঘাতী বিচারবুদ্ধি বিজ্ঞানের পক্ষেই অপরিত্যাজ্য, জ্ঞানের নিকষে স্বদেশের আধ্যাত্মিক সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতাও অনুপকারী নয়; এবং জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অভিধা যেকালে আজ অবধি আলাদাই আছে, তখন এ-ক্ষেত্রে একাগ্রতা নিশ্চয়ই মারাত্মক। বস্তুত ব্যক্তির ন্যায় জাতির মধ্যেও অধিকারভেদ বিদ্যমান; এবং পশ্চিমের ভাবধারা যেমন অভিব্যাপ্ত স্বতোবিরোধের আবিষ্কারে যুগ-যুগান্ত কাটিয়েছে, পূর্বের ধ্যান-ধারণা তেমনই সেই বিপ্রলাপের পরপারে আবহমান কাল খুঁজেছে অনির্বচনীয় প্রজ্ঞাপারমিতাকে। বিশ্বমানবের ঐশ্বর্য বাড়াতে দুই পরিশীলনই সমান মর্যাদাবান; এবং এই সত্যকে সর্বাগ্রে অঙ্গীকার করেছিলেন ব'লেই, রামমোহন রায় অবিস্মরণীয়। শুনেছি শীল মহাশয়ও রামমোহনের পরম ভক্ত; এবং তাঁর অবচেতনায় অনুরূপ মৈত্রীর ঝঙ্কার বেজে থাকুক বা না থাকুক, তাঁর বিশ্বস্তর পাণ্ডিত্য যে সঙ্কলন-ধর্মেরই রূপান্তর, তাতে প্রতর্কের অবকাশ নেই। সুতরাং আজকের বহুধাবিভক্ত সমাজে তাঁর উপস্থিতি অতিশয় বাঞ্ছনীয়; এবং প্রাচ্য গুরুবাদ যে শুধু স্বার্থসংরক্ষণের জোরে বেঁচে নেই, তার সাক্ষ্য তাঁর মতো মানুষ। কারণ কোষ্ঠীবিচারে তিনি সক্রেটিস্-বংশের শেষ কুলপ্রদীপ; এবং সুসম্বদ্ধ "সিস্টেম্"-রচনা তাঁর কর্তব্য নয়, প্রতিবেশকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েই তিনি ভারমুক্ত। তাঁর ঐকান্তিক অন্তর্দৃষ্টি জাগতিক বীক্ষায় পর্যবসিত হবে পশ্চাদ্গামী প্লেটো-র প্রয়োগে; এবং সে-প্লেটো-র কণ্ঠস্বর যদি ভারতবাসী আজও শুনতে না পায়, তবে ব্রজেন্দ্রনাথের বিদূষণ সঙ্গত নয়, অপরাধী হয়তো হিন্দু দর্শনের ভাষাগত ঐতিহ্য।

বলাই বাহুল্য যে সংস্কৃতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর নিরক্ষরের বিদ্যানুরাগ প্রায় এক পর্যায়ের ব্যাপার; এবং বোধহয় সেই জন্যে এ-দেশের প্রাচীন কাব্যে গুণবাচক বিশেষ্যের বিস্ময়কর ব্যবহার আমাকে যেমন মাতিয়ে তোলে, শঙ্করভাষ্যের অনুপম বাক্‌সংযমে আমি তেমনই অপূর্ব উপমা ও অব্যর্থ উৎপ্রেক্ষার নিদর্শন খুঁজি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও আমি ভুলতে

পারি না যে সে-কালের শিক্ষায় ব্যাকরণ অধীত হত বারো বছর ধ'রে; এবং ইদানীন্তন দর্শনশাস্ত্রীদের মধ্যে সে-রকম ব্যুৎপত্তি যদিও বিরল, তবু তাঁরা নিশ্চয়ই দেবভাষার উৎপীড়নে অন্তত ততখানি বিপন্ন, আমরা যে-পরিমাণে ব্যতিব্যস্ত ইংরাজীর দাবিতে। অবশ্য গতানুগতিক বাংলায় নূতন প্রাণের উদ্বোধন শ্বেতদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অবদান; এবং কেবল মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র নন, বিদ্যাসাগরও পাশ্চাত্ত্য ভাবসম্পদের অধমর্ণ। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যের সনাতন ধারায় ক্রমবিকাশের আর স্থান নেই বুঝেই তাঁরা জাতীয় চিৎপ্রকর্ষের আমূল পরিবর্তনে মন দিয়েছিলেন; এবং এখনকার ভারতীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা হয়তো সংস্কৃতের ঐশ্বর্যে এমনই মুগ্ধ যে অন্য কোনও দিকে তাকাবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত তাঁদের নেই। অর্থাৎ ভাব ও ভাষার পৃথক্করণ আজ আমাদের আশুকৃত্য; এবং এখানকার কবিতাবিচারে রিচার্ড্‌স্‌-এর মতো সমালোচকের প্রয়োজন থাক বা না থাক, হিন্দু দর্শনের পুনরুদ্ধার তাঁরই সাধ্য, যিনি বিশ্লেষে মূর-এর সমকক্ষ। অন্ততঃপক্ষে এ-জনরব একেবারে অমূলক নয় যে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মতো বিদ্বানও দার্শনিক নন, দর্শনের ঐতিহাসিকমাত্র; এবং তাঁর প্রসাদগুণ অবশ্যস্বীকার্য বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের বিরাট পাণ্ডিত্য সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মূল বক্তব্যটুকুও বাংলায় বিশদ করতে পারেনি।

এমন মন্তব্য যখন তাঁদের বিষয়ে খাটে, তখন পাশ্চাত্ত্য জগতের তথাকথিত জড়বাদের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষকের তোতাপড়া আশ্চর্যজনক নয়; এবং তার পরে দর্শনের সার্থকতা কী শুধালে, ছাত্রেরা যদি উত্তরে বলে বৈরাগ্য-সঞ্চার, তবে তাদের গুরুমারা বিদ্যা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। অবশ্য শোনা যায় যে তিন বছর কেম্‌ব্রিজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে দেশে ফেরার সময় এক চৈনিক দার্শনিক নাকি মেনেছিলেন যে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমানে হ-ধাতুর যথাযথ প্রয়োগ প্রায় তাঁর আয়ত্তে এসেছে; এবং এটা হাসিরই গল্প। কিন্তু অনির্বচনীয়ের প্রশস্তিতে অনর্গল বাক্যব্যয় আরও উপহাস্য; এবং জীবনে মরমী অভিজ্ঞতার যেমন মূল্যই থাক না কেন, তা নিশ্চয় স্বতঃপ্রমাণ—অর্থাৎ অভিজ্ঞকে দেখবামাত্র আমাদের মধ্যে অনুকরণের ইচ্ছা জাগা উচিত। নচেৎ ঈশোপনিষদ আওড়াতে আওড়াতে কামিনী-কাঞ্চনের

ধ্যান কখনও আমাদের বিবেকে বাধবে না ; এবং সেই জন্যে দিনের পর দিন গলার আওয়াজ চড়াতে চড়াতে আমরা অম্লান বদনে রটাতে পারব যে প্রাচ্যের সর্বময় সত্ত্ব-গুণ তামসিক পাশ্চাত্ত্যের স্বপ্নাতীত। অথচ হিন্দুদের গর্ব যে তাদের সমাজ অবৈকল্যের প্রতিমূর্তি, কৈবল্যের অনুবাদ অথবা পূর্ণের অভিব্যক্তি ; এবং সেই সঙ্গে আমরা আবার ভজাতে ছাড়ি না যে যাদের আচার শাস্ত্রসম্মত, তারা গোপনে নাস্তিক কিনা, তা অপরের জিজ্ঞাস্য নয়। আমার বিশ্বাস অনুরূপ যত অনর্থ, সে-সমস্তের মূলে রয়েছে আমাদের পরাবিদ্যায় যুক্তির অভাব ; এবং হাজার বছরের নিরন্তর দুর্দশাও যেহেতু আমাদের শেখায়নি যে উপায় ও উদ্দেশ্যের সমীকরণ ভিন্ন সুস্থ সংসারযাত্রা অসম্ভব, তাই ভারতীয় মনীষীদের জানিয়ে লাভ নেই যে পশ্চিম অধঃপাতে গেলে, পূর্বের পুনরুত্থান অনিবার্য নয়, বরঞ্চ মানবসভ্যতার সমূহ বিপদ।

[ ১৯৩৭ ]

# আঠারো শতকের আবহ

কোল্‌রিজ্‌ বুঝেছিলেন যে হুইগ্‌-টোরি-র মধ্যে আপাতত আকাশ-পাতালের তফাৎ থাকলেও, ইংরাজী রাষ্ট্রব্যবস্থার অনাদি ত্রৈগুণ্যে উভয় পক্ষ সমান আস্থাবান; তবে স্বার্থরক্ষার গরজে প্রথমোক্তেরা যেমন রটাতেন যে রাজা, অভিজাত সম্প্রদায় আর প্রজামণ্ডলীর চিরস্থায়ী ত্রৈলোক্য রাজশক্তির অতি বৃদ্ধিতে বিপন্ন, তেমনই শেষোক্তেরা ইষ্টলাভের প্রত্যাশায় বিশ্বাস করতেন যে সে-সমাজশৃঙ্খলা অন্ত্যজদের অবৈধ উৎপাতে দুর্দশাগ্রস্ত। অবশ্য কোল্‌রিজ্‌-এর মন্তব্য এখনও স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি; এবং সেই জন্যে আজও আমরা অনেকে ভাবি যে ফরাসী বিপ্লবের আতিশয্য-প্রসঙ্গে বর্ক্‌-এর অতিশয়োক্তি তাঁর নিরপেক্ষ মাত্রা-জ্ঞানের নিদর্শন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা কোল্‌রিজ্‌-এর সিদ্ধান্তই ভজিয়েছে; এবং একাধিক বিশেষজ্ঞ এক রকম এক বাক্যে বলছেন যে দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ তৎকালীন কুলীনকুলসর্বস্বদের না পুছে সোজাসুজি প্রজা-রঞ্জনের প্রয়াস পেয়েছিলেন ব'লেই, টোরি-রা কার্যত হুইগ্‌ রাজদ্রোহীদের বাধ সাধেননি, তাঁদের রাজভক্তি থেমে গিয়েছিল মৌখিক প্রতিবাদে।

পক্ষান্তরে টোরি-রা তখনও পর্যন্ত বিবেক আর স্বার্থের প্রভেদ মানতেন। ফলত প্রতিষ্ঠিত রাজকুলের উচ্ছেদ-সাধন তাঁদের সাধ্যে কুলায়নি; তাঁরা নবাগত অরেঞ্জ্‌-বংশকে দূরে রেখেছিলেন; এবং প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ্‌-এর মুখে যেহেতু ইংরাজী ভাষা সুদ্ধ বেরোত না, তাই তাঁদের সময়ে হুইগ্‌-দের একাধিপত্য প্রায় অসীমে পৌঁছেছিল। তৎসত্ত্বেও হুইগ্‌ শাসন অটুট রইল না। তাঁদের অদৃষ্টদোষে তৃতীয় জর্জ্‌ জন্মালেন অসম্ভব রকমের জেদ নিয়ে; এবং সেই জেদ পাগলামিতে বদ্‌লাবার আগেই পৈতৃক মন্ত্রীদের যথেচ্ছাচার

তাঁর অসহ্য লাগল। উপরন্তু ষড়যন্ত্রী হিসাবে কোনও হুইগ্ তাঁর নাগাল পেতেন না ; এবং উৎকোচবিতরণের অসামঞ্জস্য-বশত হুইগ্ গোষ্ঠীতেও ইতিমধ্যে ফাট ধরেছিল। সুতরাং জন-কতক অসাধু টোরি আর সমস্ত অসন্তুষ্ট হুইগ্-দের জুটিয়ে তৃতীয় জর্জ্ অবিলম্বে এক দরবারী দল গ'ড়ে তুললেন ; এবং নিশ্চিন্ত হুইগ্ কর্তাদের চমক ভাঙতে না ভাঙতেই ইংলণ্ডের রাষ্ট্রভার তাঁদের কবল থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন রাজপ্রসাদে বঞ্চিত হয়ে অগত্যা তাঁদের চোখ পড়ল জনসাধারণের উপরে ; এবং স্বদেশের সিংহাসনে বিদেশী হ্যানোভেরিয়ান্-দের বসিয়ে তাঁরা যেহেতু ইতিপূর্বেই দেখিয়েছিলেন যে রাজাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকারে তাঁদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, তাই রাতারাতি আভিজাতিক মনোভাব ঘুচিয়ে গণশক্তির স্বপক্ষে বাগ্‌যুদ্ধ চালাতে তাঁরা লজ্জা পেলেন না। অবশ্য অসদুদ্দেশ্যে সৎকার্যের সম্পাদন সকল কালে সম্ভব ; এবং ফক্স্-প্রমুখ বিপ্লববিলাসীদের তর্জন-গর্জন অতৃপ্ত প্রত্যাশার অসরল অভিব্যক্তি ব'লেই, তার ঔদার্য তথা ঔচিত্য অস্বীকার্য নয়। কিন্তু বর্ক্-এর মতো মহাপুরুষও প্রকাশ্যে ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত কদাচারের মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন ; এবং মেকলে-র ব্যক্তিগত জীবনে যদিও অপবাদের অবকাশ ছিল না, তবু সে-জন্যে তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি প্রশংসনীয়, না স্বল্প মেধা ও সঙ্কীর্ণ মতি উল্লেখযোগ্য, তা আজ পর্যন্ত তর্কাধীন।

তবে স্বার্থ-পরমার্থের সমীকরণে শুধু হুইগ্-রা সিদ্ধহস্ত নন, সমগ্র ইংরাজ জাতিই সুবিধাবাদী। অন্ততঃপক্ষে সে-দ্বীপের প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী অন্তর্যামীর প্রত্যাদেশে সুবর্ণ সুযোগের সন্ধান পায় ; এবং সম্ভবত সেই জন্যে নিজেদের স্খলন-পতন-ত্রুটিতে তারা দমে না, বরং সকল অবস্থাতে আত্মোন্নতির অবকাশ খোঁজে। অতএব হুইগ্ আত্মম্ভরিতা জাতীয় চারিত্র্যের প্রকাশমাত্র ; এবং হয়তো এ-দিক থেকে তাঁরা সারা ইংলণ্ডের প্রতিভূকল্প ব'লেই, তাঁদের যথেচ্ছাচারেও সে-দেশের বিশেষ কোনও অনিষ্ট ঘটেনি। পক্ষান্তরে তাঁদের এমন কতকগুলি গুণ ছিল যা ইংলণ্ডে চির দিন দুর্লভ : সাধারণ ইংরাজের মতো তাঁরা কূপমণ্ডুকদের পছন্দ করতেন না ; তাঁরা বুঝতেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যতীত শিল্প-বিজ্ঞানের স্ফূর্তি দুঃসাধ্য ;

এবং তাঁরা যেহেতু জ্ঞানত প্রজ্ঞা ভিন্ন অপর-কিছুর নির্দেশ মানতেন না, তাই গুণের আদর তাঁদের সাধারণ ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

উপরন্তু প্রতিভার ধার না থাকুন, তাঁদের অনেকেই মনীষায় ফাঁকি পড়েন-নি; এবং তাঁদের সাহিত্যসাধনা বা দর্শনানুশীলন যথার্থ সৃজনী শক্তির অভাবে প্রায়ই বিফলে যেত বটে, তথাচ মানসিক ব্যাপারে আধুনিক রাষ্ট্রপতিরা যে হাস্যকর অক্ষমতা দেখান, সে-রকম আলাপ-আলোচনা তাঁদের কল্পনাতেও আসত কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ অনধিকার চর্চায় অসামান্য চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় দিতে না পারলে, তাঁদের আত্মপ্রসাদ টিঁকত না; এবং তাঁরা ভাবতেন যে সুখপাঠ্য চিঠি-পত্রে বহুমুখী ঔৎসুক্যের প্রকাশ শিক্ষিত মানুষ-মাত্রের প্রথম কর্তব্য। অবশ্য বাইরের সম্ভ্রমবোধ সত্ত্বেও তাঁদের অন্তর্বিবাদে নীচতা ও পরশ্রীকাতরতাই ধরা পড়ত; এবং যখন প্রাপ্যের অধিক পাওনা জুটত না, তখন তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে আত্মমর্যাদা ভুলতেন। কিন্তু হয়তো সেই কারণে তাঁদের মানুষী মূল্য বেশী: অন্ততঃ-পক্ষে নিজেরা দুর্বল ব'লে, তাঁরা পরের দোষও সহজে ক্ষমা করতেন; এবং তাই তাঁদের সৌহৃদ্য যেমন লোভনীয় লাগত, তেমনই নিরাপদ ঠেকত তাঁদের শত্রুতা।

মোটের উপরে তাঁদের পরিমণ্ডলে এমন একটা অসঙ্কোচ দেখা দিয়েছিল যা তাঁদের আগে বা পরে ইংলণ্ডে আর কখনও জ্ঞানগোচরে আসেনি; এবং এ-সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তাহলে আমরা আরও মানতে বাধ্য যে আঠারো-শতকী ইংলণ্ডে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি আদৌ অস্বাভাবিক নয়। তবে যাঁদের কাছে সভ্যতার প্রগতি আর দৈনন্দিন জীবনের উপকরণ-বৃদ্ধি সমানুপাতিক, তাঁদের মতে ভিক্টোরীয় যুগ নিশ্চয়ই অধিক প্রাগ্রসর; এবং যখন এই মানদণ্ডে মাপি, তখন হুইগ্ কীর্তি-কলাপের অনেকখানি অগত্যা বাদ পড়ে। কিন্তু তখনও পেংলারী বিচারপদ্ধতি টিঁকে থাকে; এবং সেই আদর্শ খাটালে, বোঝা যায় যে উনবিংশ শতাব্দী সংস্কৃত নয়, সভ্য, উন্নত নয়, অধঃপতিত। আসলে ভিক্টোরীয় যুগের কিছুমাত্র নিজস্ব নেই: তার প্রথম দিকটা আঠারো শতকের অস্তরাগে রঞ্জিত, এবং শেষার্ধ বিংশ শতাব্দীর পূর্বাভাস।

সে-যুগের অনন্য অবদান অজ্ঞাতসারে, অথবা বিপরীত বিশ্বাসে, ধ্বংসের বীজ-বপন ; এবং তখনকার বিলম্বিত ফসল কাটতে বর্তমান শতাব্দীর সমস্তটাই ফুরাবে কিনা, কে জানে ?

মিসেস্ ভিলর্স্-এর* মুখ্য পাত্র-পাত্রীরা আঠারো শতকের মানুষ ; এবং ভিক্টোরীয় যুগের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সম্পর্ক লেডি ক্যারোলিন্ ল্যাম্ব্-এর স্বামী তথা মহারাণীর প্রথম মন্ত্রী উইলিয়ম্ ল্যাম্ব্-এর মারফতে। উপরন্তু গ্রন্থকর্ত্রী ঐতিহাসিক নন, ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে খোশ-খবর-সরবরাহ ক'রেই তিনি খুশী ; এবং এই সব গল্প-গুজবেরও আপন মূল্য নেই, যারা তাঁর পরচর্চার অবলম্বন, তারা অন্যান্য কারণে অবিস্মরণীয় ব'লেই, তাদের বিষয়ে তুচ্ছ কথা শুদ্ধ অর্থগৌরবে গরীয়ান্। তবু আলোচ্য পুস্তকের উপসংহারে ইংরাজ শাসকসম্প্রদায়ের মানসিক অবরোহণ সুস্পষ্ট ; এবং সে-মতিপরিবর্তনকে আভিজাতিক সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে দেখা অসম্ভব—প্রবর্ধমান উনিশ শতকের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইংরাজ জাতির চিৎশক্তিই কেমন যেন লোপ পেতে থাকে। তবে সে-সর্বনাশের উপলব্ধি হুইগ্ দলের জীবদ্দশায় ঘটেনি ; এবং সেই জন্যে এ-বইয়ে মিসেস্ ভিলর্স্ উক্ত ট্র্যাজেডির আভাস দিয়েছেন মাত্র, তার ছবি আঁকেননি।

এখানে তিনি হুইগ্ প্রতিভার শেষ জৌলসটুকুই ফোটাতে চেয়েছেন ; এবং সেই মুমূর্ষু রশ্মিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে ডেভন্‌শার হাউস্-এর নবরত্ন সভা—বর্ক্, ফক্স্, শেরিডন্ ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গেরা। সুতরাং মিসেস্ ভিলর্স্-এর পুস্তক স্বভাবতই চিত্তাকর্ষক ; এবং তিনি যেহেতু সাধ্যপক্ষে নিজের জবানিতে লেখেননি, পারলেই সে-কালের উপাদেয় চিঠি-পত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করেছেন, তাই রচনারীতির জড়তা সত্ত্বেও "দি গ্র্যাণ্ড্ হুইগরি" আদ্যন্ত সুখপাঠ্য। কিন্তু তিনি একই লোককে একাধিক নামে ডাকতে অভ্যস্ত ; এবং এই দোষ যদিও মারাত্মক নয়, তবু বিরক্তিকর জটিলতার জনক। গ্রন্থকর্ত্রীর বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ এই যে তাঁর আড়ম্বরপ্রীতি এমনই প্রখর যে অষ্টাদশ শতাব্দীর জনসাধারণ কী ভাবে দিন কাটাত, কী চক্ষে বড় লোকদের কাণ্ড-কারখানা দেখত,

* The Grand Whiggery—By Marjorie Villiers (John Murray).

সে-সব প্রসঙ্গের উল্লেখ এই বৃহৎ পুস্তকে এক বারও নেই ; এবং আঠারো শতকের মতো আপাতনির্লিপ্ত যুগের সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর শুচিবায়ু মার্জনীয় বটে, কিন্তু এতখানি উন্নাসিকতা নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের পরিপন্থী।

[ ১৯৪০ ]

# ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড

ফ্রয়েডী মনস্তত্ত্বের বিচারে পিতা-পুত্রের অনিবার্য দ্বন্দ্ব সমাজজীবনের প্রথম সোপান ; এবং এ-সিদ্ধান্ত বিনা ভাষ্যে অগ্রাহ্য বটে, কিন্তু মহারাণীর মৃত্যু আর আমার জন্ম—এই দুর্ঘটনাদ্বয় সমসাময়িক ব'লেই, আমি সম্ভবত ভিক্টোরীয় যুগের হাল-আমলী সাধুবাদে অপারগ। কারণ নিরাসক্ত বুদ্ধিতে ভাবলে, উনিশ শতকের সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি আমার কাছেও তর্কাতীত ঠেকে ; এবং পূর্বপুরুষের আদর্শ ও আচারের বৈষম্য আমাকে যদিচ আশৈশব ভুগিয়েছে, তবু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র অনুরূপ সংঘর্ষের সন্ধান পেয়ে আজ আমি মানতে বাধ্য যে অবৈকল্যের অভাবে ভিক্টোরীয়া-র রাজ্যকাল অদ্বিতীয় নয়, সকল কালের সমকক্ষ। তাহলেও সহজাত শত্রুতার প্রতিবিধান আমার সাধ্যে কুলায় না ; এবং যে-বিবেকের নির্দেশে আমি বুঝি যে কায়মনোবাক্যের বিসংবাদ মানুষী সভ্যতার সনাতন উপসর্গ, সে-নিরপেক্ষতাই আমাকে দেখিয়ে দেয় যে দোষে কেন, এমনকি গুণে সুদ্ধ সে-যুগ বৈশিষ্ট্যবিহীন। আসলে তদানীন্তন প্রতিষ্ঠার মূল যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর অতিভূমিতে, তখনকার প্রগতি তেমনই পারগত আমাদের নির্বাহে ; এবং সাম্রাজ্যবাদের উদ্‌ভাবন ব্যতীত অন্য কোনও কৃতিত্ব সে-কালের আছে কিনা, শুধু তাই বিবেচ্য নয়, উপরন্তু উক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যেও ডিজ্রেলি-র প্রাচ্যশোভন কল্পনাশক্তি যে-পরিমাণে প্রশংসনীয়, হয়তো ততোধিক উল্লেখযোগ্য কার্ট্‌রাইট্‌-এর আঠারো-শতকী সৃজনপ্রতিভা।

অবশ্য তার পরেও বেণ্টামী হিতবাদ বাকী থাকে ; এবং সে-মতের সূত্রপাত যেহেতু হিউম্‌-এর ন্যায়নিষ্ঠ সংশয়ে, তাই আমার মতো বৈনাশিক

সেই একদেশদর্শীদের মায়া একেবারে কাটাতে পারে না। কিন্তু প্রসঙ্গত এ-কথাও স্মরণীয় যে ওই লোকায়ত্তিকদের সকলে সমস্বরে রটিয়েছিলেন যে তাঁদের বিবেচনায় তত্ত্ব তথ্যেরই নামান্তর; এবং সেই জন্যে যখন স্মরণে আসে যে অত বাদ-বিতণ্ডার স্থায়ী ফল যেমন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি ও দণ্ডবিধি, তেমনই তার উপসর্গ স্বয়ং বেন্টাম্-এর সেক্রেটারি বোরিং-এর অগ্নিবৃষ্টিতে কাণ্টন্ নগরীর আকস্মিক উচ্ছেদ, তখন অন্তত এশিয়াবাসীর কানে হিতবাদের নাম-সংকীর্তন কেমন যেন বেসুর শোনায়। পক্ষান্তরে ইতিহাস একটা ধারাবাহিক ব্যাপার; এবং বিশ্ববিধানের বিবরণে গণিতের নিয়ম খাটুক বা না খাটুক, কালস্রোতের শতাব্দীগত বিভাগ স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা। সুতরাং উনিশ শতকের স্বরূপ অঙ্ক ক'যে পাওয়া যাবে না; এবং আর যা ভুলি না কেন, মনে রাখতে হবে যে তার সূচনা ফরাসী বিপ্লবে আর সমাপ্তি ১৯১৪ সালের য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে। উপরন্তু তার আদ্যন্তে মহাপ্রলয় থাকলেও, তার মাঝে মাঝে খণ্ড প্রলয়ের অভাব নেই; এবং সেই উপনিপাতসমূহ যদিও ইংলণ্ডে সাংঘাতিক আকার ধরেনি, তবু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ডায়ালেক্‌টিক্ তরঙ্গে সে-দ্বীপপুঞ্জও নিয়ত দোদুল্যমান।

রাসেল্ ওই পরিবর্তনের ঊর্মিমালায় স্বাধীনতা ও সংগঠনের পতন ও অভ্যুদয় দেখেছেন; এবং ফিশার-এর মতে প্রচারধর্ম ও অজ্ঞেয়তাবাদ, ধনবিজ্ঞান ও তুলামূল্য, অবাধ বাণিজ্য ও স্বার্থসংরক্ষণ, যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ ও চার্টিস্ট্-দের সশস্ত্র বিদ্রোহ ইত্যাদি অন্যোন্যবিরোধী সমস্যাগুলো নাকি পরিণামী উদারনীতির অব্যর্থ অভিব্যক্তি। কিন্তু এতাদৃশ সামান্যীকরণ নিরতিশয় ব্যাপক; এবং এ-রকম সার্বভৌম নামের আশ্রয় নিলে, শুধু ভিক্টোরীয়া-র আমল নয়, মানবসভ্যতার সকল শাখা-প্রশাখাকে একই কাণ্ডে জুড়ে দেওয়া সম্ভব। আসলে সাধারণ্যের প্রতি অতখানি সদ্ভাব সাজে হোয়াইট্‌হেড্-এর মতো আদর্শবাদীদের, যাঁরা প্লেটোনিক্ তিতিক্ষায় অমর কণ্ঠস্বর শোনেন গান্ধি-আরুইন্ সন্ধির নশ্বর শর্তে; এবং ঐতিহাসিকের কর্তব্য যখন যুগপরম্পরার পার্থক্য-নিরূপণ, তখন তিনি সংজ্ঞাসঙ্কোচে বাধ্য। অতএব যিনি ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের স্বাতন্ত্র্য-সন্ধানে

বেরোবেন, তিনি কোনও চিরন্তন প্রত্যয়ে পৌঁছাবেন না, শেষ পর্যন্ত একটি সাময়িক সম্প্রদায়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করবেন ; এবং সে-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কোন্ ছার, তার স্মৃতি সুদ্ধ আজ ইংরাজী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিলুপ্ত বটে, কিন্তু তার আরম্ভ তথা আধিপত্য যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তবু তার প্রভাব ও প্রকোপ যেহেতু মহারাণীর সময়েই আত্ম-পর সকলের মধ্যে সমভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই হুইগরি-কে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের প্রাণবস্তু বলায় বোধহয় অতিশয়োক্তি নেই।

দুঃখের বিষয় হুইগ্ দলের নামোল্লেখ যত সহজ, তার পরিচয়-প্রদান তেমনই দুষ্কর। কারণ ব্যক্তির মতো দলের বৈশিষ্ট্যও তার কার্যকলাপের অপেক্ষা রাখে ; এবং হুইগ্-দের মধ্যে গর্জন-বর্ষণের সামঞ্জস্য তো কোনও দিন ঘটেইনি, এমনকি অবস্থাগতিকে তাদের নেতারা যখন সদাব্রতে না নেমে পার পায়নি, তখনও অনুযাত্রের পৃষ্ঠপ্রদর্শনে অথবা অসহযোগে তাদের আরব্ধ কর্ম বারংবার অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও তখনকার ভাবয়িত্রী প্রতিভা সেই সম্প্রদায়ের প্রশ্রয়েই পরিপুষ্ট ; এবং মহারাণীর সুবিখ্যাত নির্বন্ধাতিশয্য রমণীরঞ্জন স্তোকবাক্যের বশবর্তী হওয়ায় হুইগ্-দের রাজভক্তি সে-যুগে এত উথলে উঠেছিল যে তাদের দলে যোগ দেওয়া আর আভিজাতিক বিবেকেও বাধেনি। কিন্তু ইংলণ্ডের সিংহাসন দৈবাৎ একজন অবলার অধিকারে এসেছিল ব'লেই, হুইগ্-টোরি-র চির কলহ মুহূর্তমধ্যে মিটে যায়নি ; এবং উভয় পক্ষের প্রভেদ দেখাতে কোল্‌রিজ্ যদিও ভিক্টোরীয় আমলের প্রাক্কালেই মন্তব্য করেছিলেন যে হুইগ্-দের মতে রাজা, কুলীনমণ্ডলী ও জনগণ—এই ত্রিধাবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থার ভারসাম্য রাজশক্তির অতি বৃদ্ধিতে অরক্ষণীয়, আর টোরি-দের বিশ্বাস অন্ত্যজেরাই ইংরাজী রাষ্ট্রের অপ্রতিষ্ঠ অঙ্গ, তবু ফরাসী বিপ্লবের সন্নিকর্ষে যেমন বর্ক্-এর হিতবুদ্ধি তাঁর সংস্কারচেষ্টাকে দাবিয়েছিল, তেমনই চার্টিস্ট্ আন্দোলনের বিভীষিকায় মেকলে-র প্রাগ্রসর মতিগতিও নির্বিকার থাকেনি।

তথাচ হুইগ্-টোরি-র অদ্বৈত অসাধ্য ; এবং বংশমর্যাদায় তথা উপস্বত্বে দু দলের নেতারাই তুল্যমূল্য বটে, কিন্তু প্রারম্ভে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোট

পাকিয়ে, শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীগত সুবিধার বদলে ব্যক্তিগত সুযোগের নাম জপা ছাড়া হুইগ্‌-দের গত্যন্তর ছিল না। ফলত প্রবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন-সংগ্রহে তাদের সময় লাগেনি; এবং দায়ভাগের জন্মভূমি গ্রাম যেহেতু স্বাবলম্বীর প্রতিকূল, তাই হুইগরি-র আসর গোড়া থেকেই জমেছিল ব্যবসায়ীর শ্রীক্ষেত্র নগরে। অবশ্য দুর্গেশদের চেয়ে অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা গণনায় বেশী; এবং এই কারণে মধ্যবিত্ত মানুষকে মহাবিত্তসঞ্চয়ে মাতিয়ে হুইগ্‌-এরা হয়তো সংখ্যাধিকেরই স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছিল। তাহলেও নির্বাচনপ্রথার প্রথম সংস্কারে সাধারণের দুর্দশা এক তিল কমেনি, বরং শ্রমজীবীরা অনেকে তাদের ভোট হারিয়েছিল; এবং সমৃদ্ধি ও শক্তির এই হস্তান্তরে কুলপ্রদীপগুলো একে একে তৈলাভাবে নিবলেও, সে-ঘনায়মান অন্ধকারে সর্বহারারা প্রগতির পথে এগোয়নি। তৎপরিবর্তে মুষ্টিমেয় দুঃসাহসিক আর্ত পথিকের যথাসর্বস্ব লুটে, সর্বত্র রটিয়ে বেড়িয়েছিল যে জোর যার, মুলুক তার—প্রবাদটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; এবং সেই জন্যে ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যভাগে পদচ্যুত বেণ্টাম্‌-এর শূন্য বেদিতে চ'ড়ে ব'সে চার্লস্‌ ডারুইন্‌ দেখিয়েছিলেন যে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল জীবযাত্রার মূল মন্ত্র নয়, প্রাণিবিদ্যার সারমর্ম যোগ্যের অবশ্যম্ভাবী জয়।

উপরন্তু উদ্বর্তনের বর্ণচ্ছত্রে শ্বেত যেহেতু কৃষ্ণ বা পীতের ঊর্ধ্ববর্তী, তাই ব্রিটিশ্‌ শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা-নির্ধারণে নেমে ফসেট্‌ বলেছিলেন যে অনাগত ভবিষ্যতে হীন কর্মের ভার কাফ্রি বা চীনা ভৃত্যের স্কন্ধে চাপিয়ে ইংরাজ শ্রমজীবীরাও স্তরবিভক্ত সমাজব্যবস্থার কাছে যথেষ্ট আহার ও উচিত শিক্ষার দাবি করতে পারবে; এবং ডারুইনী মতবাদ তথা তার অনুসিদ্ধান্ত সর্বৈব মিথ্যা কিংবা শুধুই পুনর্বাদী, সে-সমস্যার সমাধান আজও অসম্ভব বটে, কিন্তু এ-সম্বন্ধে আর বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ নেই যে মনুষ্যলোকে তাঁর প্রত্যাদেশ খাটালে, অভিব্যক্তির উৎস নিশ্চয়ই অকালে শুকাবে। সুতরাং যদি তর্কের খাতিরে মানা যায় যে তদানীন্তন আত্মরতি ডারুইন্‌-কে ছোঁয়নি, তিনি বস্তুত সত্যানুরক্ত ছিলেন ব'লেই, অমানুষিক বিজ্ঞানে তাঁর অতখানি ব্যুৎপত্তি, তবু তজ্জনিত সমাজতত্ত্ব ভিক্টোরীয়ান্‌-দের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার অকাট্য সাক্ষ্য; এবং যে-অহেতুক

ব্যাপ্তির প্রসাদে তখনকার অর্থশাস্ত্র সর্বগ্রাসী ধনকুবেরদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সেবী ভেবে অব্যাহত প্রতিযোগের গুণ গেয়েছিল, সেই একদেশদর্শিতার জোরেই সে-কালের পদার্থবিদেরা বুঝেছিলেন যে বিশ্বযন্ত্রের আড়ালে বিশ্ববিধাতা লুকিয়ে নেই। পক্ষান্তরে তাঁদের নিষ্প্রমাণ জড়বাদের মূলে নিরাসক্ত প্রজ্ঞার নাম-গন্ধ না থাকায় তাঁরা কেউই জনসাধারণকে সংস্কার-মুক্তির উপদেশ দেননি; এবং সমসাময়িক অবৈজ্ঞানিকেরা স্বদ্ধ ন্যায়ের অবমাননায় এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে নিঃস্ব-নির্জিতের একমাত্র মুখপাত্র ব্রাউনিং-এরও লিখতে আটকায়নি যে জগৎসংসার চূড়ান্তে সৎ ও সুস্থ।

টেনিসন্-এর "ইন্ মেমোরিয়ম্" এই অভিব্যাপ্ত শুভবাদের বহির্ভুক্ত হোক বা না হোক, যেই "মড্"-এর উপসংহার পড়ি, অমনই অন্তত আমার আর সংশয় থাকে না যে কিপ্লিং-এর দুর্ধর্ষ জাত্যভিমান তাঁরই ঔরস-জাত; এবং ন্যুম্যানী মনীষার সাংঘাতিক সংঘাতে কিংস্‌লি-র অহমিকা সমূলে ঘুচেছিল বটে, তথাচ "অ্যাপলোগিয়া"-র শূন্যবাদ যখন রোমক গির্জাতন্ত্রেই লব্ধকাম, তখন সর্বব্যাপী অন্ধতার সংক্রাম শেষ পর্যন্ত ন্যুম্যান্-ও কাটিয়ে ওঠেননি। এমনকি মার্ক্‌স্-এর মতো মহাবিদ্রোহীও সে-রোগে আক্রান্ত; এবং ভিক্টোরীয়া-র রাজ্যে দীর্ঘ নির্বাসনের ফলেই তিনি যেমন অবচেতন শ্রেণীস্বার্থের পরিকল্পনায় পৌঁছেছিলেন, তেমনই তাঁর অসহিষ্ণু আত্ম-নিষ্ঠায়, অমূলক নিরুক্তির নিশ্চিন্ত পরিপোষণে, তথা সত্যাসত্যের সুবিধাসাপেক্ষ আদর্শ-স্বীকারে ভিক্টোরীয় যুগের দারুণ দুর্লক্ষণগুলোই সুপরিস্ফুট। সমগ্র ইংলণ্ডে একা জন্ স্টুয়র্ট্ মিল্-কেই সে-অভিশাপ বর্তায়নি; এবং সে-জন্যে শুধু পিতা-পুত্রের স্বাভাবিক বৈপরীত্য দায়ী নয়, তাঁর ক্ষেত্রে এ-কথাও স্মরণীয় যে ব্যতিক্রমই নিয়মমাত্রের প্রাণ। অর্থাৎ আমার মতে ট্রেজান্-পরবর্তী রোম সাম্রাজ্যের কথা ছেড়ে দিলে, য়ুরোপীয় ইতিহাসে অনুরূপ অন্ধতার নিদর্শন দুর্লভ; এবং অন্ধ তামসের তথাকথিত লীলাভূমি মধ্য যুগ যে এ-দিক থেকে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের অগ্রগণ্য নয়, তার প্রমাণ ন্যুম্যান্-এর ধর্মান্তরগ্রহণে।

ইংরাজ ভাবুকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন বটে যে প্রচলিত

যুক্তিবাদ মূলত হেতুপ্রভব নয়, আসলে পক্ষপাতজাত, কিন্তু কেবল সেই জন্যে স্বধর্ম তাঁর অসহ্য লাগেনি, পিতৃ-পিতামহের নিত্য পূজাপদ্ধতির মধ্যে নীরস বুদ্ধিজীবী ভিন্ন অপরের চিত্তপ্রসাদ দুর্ঘট জেনেই তিনি রোমক অমৃতে তাঁর প্রখর সৌন্দর্যপিপাসা মিটিয়েছিলেন। এই মনোভাবের সঙ্গে অ্যাকোয়াইনাস্-এর আন্বীক্ষিকী তুলনীয়; এবং বুদ্ধি ও বোধির সেই নৈয়ায়িক সমন্বয় যদিও ডান্স্ স্কোটাস্-প্রমুখ দার্শনিকদের প্রতিবাদ জাগিয়েছিল, তবু টোমিস্ট্-দের সঙ্গে তাঁদের বাদানুবাদ অবদমিত সুকুমারবৃত্তির উদ্ধার-কল্পে নয়—বরং অ্যাকোয়াইনাস্-এর শিষ্যসম্প্রদায় গণিতবিদ্বেষী ব'লেই, রজার বেকন্ তাদের অ্যারিস্টটেলী অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্লেটোনিক্ প্রজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। অবশ্য গণিতের সুশৃঙ্খলা অপরীক্ষিত কল্পিতসাধ্যের মুখাপেক্ষী; এবং সেই কারণে অঙ্কের সাহায্যে কৈবল্যপ্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা। কিন্তু এ-কথা রজার বেকন্ বুঝতেন; এবং তাই আনুমানিক সত্যের প্রতিভূ হিসাবেই তিনি তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের কোপকটাক্ষে পড়েছিলেন। বেকন্-শিষ্য অক্যাম্-এর ভাগ্য আরও মন্দ; এবং নিদারুণ ক্ষৌরকর্মে সামান্য বিধির নিশ্চয়তা ছেঁটে তিনি যেমন সমসাময়িকদের দুরুক্তি কুড়িয়েছিলেন, তেমনই রিনেসেন্স্-এর ভূমাবাদীরা তাঁর প্রতর্কে প্রমাদ গ'ণে অগত্যা আবার অবিদ্যার শরণ নিয়েছিল।

অতএব উজ্জীবিত য়ুরোপই অজ্ঞানান্ধকারের প্রতীক, সে-সম্মান মধ্য যুগের প্রাপ্য নয়; এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য মনীষা বিচার ও বিবেচনার চরমে তো পৌঁছেছিলই, এমনকি আবেলার-এর জন্ম যেকালে একাদশ শতকের শেষ ভাগে, তখন আর এক শ বছরও নিঃসন্দেহে আলোকপ্রাপ্ত। তবে সে-আলো ঘাটে, মাঠে, বাটে জ্বলেনি, প্রধানত মঠে মঠেই লালিত হয়েছিল; তার অনভ্যস্ত অভ্যাঘাতে অতর্কিত বুদ্ধির আত্মবেদ ঘোচেনি, সমীক্ষকেরা সবিনয়ে মেনেছিলেন যে মানুষের মন প্রামাণ্যের অন্তর্বর্তী; এবং তাই তাঁরা ব্র্যাড্লী-র মতো বুদ্ধির নির্দেশে বুদ্ধিবিসর্জনের প্রয়াস পেতেন না, মূল বিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের অবিরোধ-সম্পাদনে অনন্ত কাল কাটাতেন। অবশ্য

তখনকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কযুদ্ধ নাগরিক সভ্যতার ঊর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগে সম্ভবপর নয় ; এবং সে-জন্যে নিরাসক্ত অবকাশ যত না কাম্য, জনতার সংসর্গ ততোধিক পরিত্যাজ্য। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইংরাজ ভাবুকেরা ন্যায়দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন ; এবং আরও এক শতাব্দীর মধ্যে প্রগতির উন্মাদনা এ-রকমের সার্বজনীন রূপ ধরেছিল যে ন্যুম্যান্-এর মতো অসাধারণ পুরুষও পশ্চিমের যুক্তিপ্রধান ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে নামতে পারেননি, আবালবৃদ্ধবনিতার অধিকাংশ জীবনে অন্ধ বিশ্বাসের একাধিপত্য দেখেই নিঃসঙ্কোচে ক্যাথলিক্ কর্তা-ভজাদের দলে ভিড়েছিলেন।

বুঝি বা সেই জন্যে প্রতিবাদী বিবেকের জ্বালা-যন্ত্রণা তাঁকে আমরণ ভুগিয়েছিল ; এবং তৎসত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে আনুগত্যের পুরস্কার তাঁর কপালে জুটেছিল বটে, কিন্তু সধর্মীর উন্নিদ্র সন্দেহ থেকে তিনি মুহূর্তমাত্র অব্যাহতি পাননি। ফলত এমন অনুমান বোধহয় সমীচীন যে ন্যুম্যান্-এর স্বাবলম্বন নাতিগভীর ; এবং আপাতত প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গেলেও, তিনি শেষ পর্যন্ত ইংরাজ উৎকেন্দ্রিকদের অন্যতম নন। কারণ নাগরিক সমাজে অনুকল্প অভাবনীয় ; এবং গ্রামের গয়ংগচ্ছ যেমন আত্ম-সমাহিত ধ্যান-ধারণার পোষক, তেমনই ব্যতিব্যস্ত রাজধানীতে জনরবই সর্বেসর্বা। উপরন্তু শুধুই যে স্থানাভাববশত ইংরাজদের চিরাচরিত খাম-খেয়াল ভিক্টোরীয়ান্ লোকলজ্জার পোষ মেনেছিল, তা নয়, সে-কালের মানুষ যেহেতু শহরে শহরে ভিড় জমিয়েছিল ব্যবসাগতিকে, তাই ব্রিটিশ্ ভদ্রাসনের দুর্গপ্রাকারও আর দিগ্বিজয়ী সুনীতির বাধ সাধেনি। অর্থাৎ প্রকাশ্য অনাচারের সুবিধা মিলবে ভেবেই সকলে নেপথ্য সদাচারের প্রদর্শনী খুলে বসেছিল ; এবং এতাদৃশ অবস্থায় ভাববিলাসের প্রাদুর্ভাব তো স্বভাবসিদ্ধই, এমনকি ভাববিলাস পরের ধনে পোদ্দারির নামান্তর ব'লে, ভাবালু আবহে বিচক্ষণেরা কখনও যুক্তির জালে জড়িয়ে পড়ে না, প্রতিপক্ষের কুৎসা রটিয়ে নিজেদের কাজ গুছায়।

এইখানেই কার্লাইলী বীরপূজার সার্থকতা ; এবং ইতিহাসের অনুরূপ কুব্যাখ্যা আদৌ বিরল না হোক, সমস্ত শ্বেতাঙ্গ জাতির সমগ্র কর্তব্যভার

একলার স্কন্ধে চাপিয়ে ঔপনিবেশিক ঘোড়দৌড়ে ইংরাজদের অতুলনীয় ক্ষিপ্রতা নিশ্চয়ই অমানুষিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। অবশ্য উক্ত অহংসর্বস্ব কর্তব্যপরায়ণতার অনুপম অবদান ভারতের শাসনতন্ত্র; এবং প্রাপ্তবয়স্ক অপোগণ্ডদের জন্যে সিভিলিয়ান্ মা-বাপের পুষ্টিকর উৎকণ্ঠা একা আমরাই খুব কাছে থেকে দেখেছি। কিন্তু পিতৃত্বের প্রকারভেদ থাকলেও, তার প্রত্যেকটা যদৃচ্ছালব্ধ; এবং ভিক্টোরীয়া-র শ্বেতাঙ্গ প্রজারা যদিও রক্ষা-কর্তার ভক্ষ্য-সরবরাহে যথাসর্বস্ব খোয়ায়নি, তবু জন্মদাতার প্রতাপ তাদের ভাগ্যে অতিরিক্ত পরিমাণেই জুটেছিল। উপরন্তু আমাদের রাজসেবার মতো তাদের পিতৃভক্তিও স্বতঃসিদ্ধ সদ্ভাবের ধার ধারত না—তখনকার নাবালকেরা অভিভাবকের ইশারায় উঠত-বসত অন্নকষ্টের ভয়ে; এবং ইংরাজ ভূস্বামীর ঘরে যেহেতু ত্যাজ্যপুত্র আইনত অসম্ভব, তাই ভিক্টোরীয়ান্ পিতার একাধিপত্য গতানুগতিক নয়, বাণিজ্যজীবী নগর-বাসীরাই সে-স্বৈরতন্ত্রের মূলাধার। অর্থাৎ শুধু রাষ্ট্রনীতি নয়, ধর্মনীতিও অতঃপর ধনপতিদের মন যুগিয়ে চলেছিল; এবং এ-কথা সত্য বটে যে আঠারো শতকের শেষ দশাতেই নেপোলিয়ন্ সমগ্র ইংরাজ জাতিকে পসারী ব'লে বিদ্রূপ করেছিলেন, তথাচ তাঁর সমসাময়িক ইংলণ্ডে কেবল টাকা যথেচ্ছাচারের অধিকার পেত না, সে-দেশের সমাজপতিরা জন্মাত বংশমর্যাদা আর অর্থবলের উদ্বাহবন্ধনে।

ফলত প্রাগ্‌ভিক্টোরীয় যুগের আবহ আভিজাতিক, এতই আভিজাতিক যে যারা টাকা ঢেলেও, কৌলীন্য কিনতে পারত না, তারা বহু ব্যয়ে কুলাচার্যদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাখত, যাতে গোত্রে না হোক, অন্তত পর্যায়ে তাদের পৌত্র-প্রপৌত্রেরা যথাসাধ্য এগোয়; এবং তৎসত্ত্বেও ফরাসী সামন্তদের ভেদবুদ্ধি যেহেতু ইংরাজ সম্ভ্রান্তমণ্ডলীর মতিভ্রম ঘটায়নি, তাই অনুলোম-বিলোমের দ্বারা তারা এক দিকে যেমন জাতিগমনের শোচনীয় পরিণাম কাটিয়ে উঠেছিল, তেমনই অন্য দিকে সেখানকার উত্তরাধিকারে জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্য সন্তানদের স্বত্ব না থাকায় স্বোপার্জনক্ষম উচ্চবংশীয়েরাই তথাকথিত স্বাধীন বৃত্তি-সমূহকে নিজেদের বশে এনেছিল। হয়তো সেই জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজেরা ভাবত যে কুললক্ষণ কৌলীন্যের চেয়েও

আবশ্যিক ; এবং তদনুসারে বৈদগ্ধ্য ও সৌজাত্যের বিবাদ তো ঘুচেছিলই, এমনকি উনিশ-শতকী প্রগতির প্রসাদে নির্বাচনক্ষমতা অন্ত্যজদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেও, পরিবর্ধিত প্রতিনিধিসভায় অপাত্রের সংখ্যা বাড়েনি, বরং অপজাতদের প্রভাব কমেছিল। কারণ ফরাসী প্রবচনে সৌজাত্য স্বার্থবিরোধী ; এবং এ-কথা যদিও ঠিক যে প্রবাদমাত্রেই প্রতিপাদ্য, তবু বংশগৌরব যেকালে সাধারণ সম্মতির অপেক্ষা রাখে, তখন কুলতিলকদের পক্ষে প্রিয়চিকীর্ষা আপাতত আত্মচিন্তার অগ্রগণ্য।

অর্থাৎ আভিজাতিক শাসনতন্ত্র, অন্তত প্রথম প্রথম, সর্বতোমুখ সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করে, পরশ্রীকাতরতার প্রতিবিধান-কল্পে প্রতিভাবানদের প্রশ্রয় দেয়, সম্ভ্রান্ত জীবনযাত্রার সহজাত ঔচ্চাবচ্য প্রতিযোগের অতীত ব'লে, মানুষী প্রচেষ্টার মূল্য-বিচারে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাবনা ভাবে না ; এবং সেই জন্যে সে-রকম পরিমণ্ডলে সুইফ্‌ট্‌-এর মতো বিদেশী বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রচালকদের কটু কাটব্য শুনিয়েও একাধিক রাজমন্ত্রীর সখা ও সচিব হয়ে ওঠে, পোপ্‌-এর মতো কৃতঘ্ন কবি আশ্রিতবৎসলার কুৎসা রটিয়েও বিদ্বজ্জনের বাহবা কুড়ায়, জন্সন্‌-এর মতো নিঃসম্বল স্পষ্টভাষী পালকসম্প্রদায়ের মুখে চুণ-কালি মাখিয়েও সাহিত্যজগতে প্রামাণিকের পদ পায়। আসলে নির্ভীক চিত্তবৃত্তির দৃষ্টান্ত যে-সমাজে এত প্রচুর, তাতে অধিকারভেদ থাকলেও, সে-বৈষম্য নিশ্চয়ই মূলীভূত নয়, খুব সম্ভব বাহ্য ; এবং লোকত উনবিংশ শতাব্দীর সাম্য আঠারো শতকের চেয়ে বেশী বটে, কিন্তু শেলি-পরবর্তী অসমঞ্জদের নিয়মিত নির্যাতন দেখে এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত অপরিহার্য লাগে যে কালক্রমে ব্যক্তিগত অবস্থার তারতম্য যতই কমুক না কেন, ইংলণ্ডে তবু সৎসাহসের আদর বাড়েনি। ভিক্টোরীয়া-র রাজত্ব আবার হিতবাদের লীলাভূমি ; এবং বেণ্টামীরা গুণগ্রহণ দুঃসাধ্য জেনে গণনায় তলিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে 'অপ্রিয় সত্যের আপদ তো একেবারে চুকেছিলই, এমনকি তত্ত্বত স্বার্থ ও যাথার্থ্যের নির্দ্বন্দ্ব ঘটায় সাংবাদিকেরা সুদ্ধ অবিলম্বে বুঝেছিল যে শক্তিমানের মনোবাঞ্ছাই বাস্তবের অদ্বিতীয় নির্ভর।

তৎসত্ত্বেও ডিকেন্স্‌, রাস্কিন্‌, মরিস্‌ প্রভৃতি দু-চার জন আদর্শবিলাসী

লেখক যদিচ সদাশয়দের চিনির পাকে নিম খাওয়াতে চেয়েছিলেন, তবু ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের ঐকান্তিক প্রাণধারা খণ্ড খণ্ড পল্বলে আটকে পড়েছিল ; এবং তাই পারিপার্শ্বিক দৈন্যের চাক্ষুষ উপলব্ধি যেমন তাঁদের সাধ্যে কুলায়নি, তেমনই তাঁদের ভাবালু আবেদন পৌঁছায়নি কর্তৃপক্ষের কানে। উপরন্তু তত দিনে সাহিত্যের বাজারদরও প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিল ; এবং কারও আর সন্দেহ ছিল না যে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকদের হাতে, যারা, মানুষ কোন্ ছার, জড় প্রকৃতিকেও কলে ফেলে কেবলই সোনা নিংড়ায়। অতএব সারস্বতেরা স্বুদ্ধ নিজেদের উপকারিতা-প্রমাণে কোমর বেঁধেছিলেন ; লোকরঞ্জনে তাঁদের আর সাধ না মেটায়, বিজ্ঞানীদের অনুকরণে তাঁরাও পরেছিলেন প্রবক্তার ছদ্মবেশ ; এবং স্বদেশে প্রবক্তার অপমান অনিবারণীয় তথা ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক সর্বত্রই উপহাস্য বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে য়াং-প্রমুখ* ভিক্টোরীয়া-ভক্তেরা উক্ত অনধিকার চর্চার ছল ধরেন না, এমনকি তাঁদের মতে তদানীন্তন মানুষের অমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিযোগবিকল সমাজ-ব্যবস্থার বিষময় ফল নয়, বরঞ্চ তৎকালীন সভ্যতার শুচিবায়ু ছিল না ব'লেই, তখনকার বহুলাঙ্গ চিৎপ্রকর্ষ অন্যোন্যনির্ভর।

আসলে বর্তমানের বিশেষজ্ঞেরাই তাঁদের চক্ষুশূল ; এবং এই একাগ্র পণ্ডিত-মূর্খদের না দাবালে, ধ্রুপদী মনুষ্যধর্মের অপমৃত্যু যে অনিবার্য, তাতে তাঁরা একেবারেই নিঃসন্দেহ। অবশ্য এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে ভিক্টোরীয়ান্-দের মনীষা ব্যাপকতর হোক বা না হোক, আমাদের পঠন-পাঠন নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ ; এবং এই অভিযোগের উত্তরে যদিচ অন্তত এটুকু বক্তব্য যে সমগ্র বিশ্ববৈচিত্র্যকে এক নিয়মে বাঁধার প্রচেষ্টা শিশুসুলভ হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা, তবু অবচ্ছেদ জ্ঞানার্জনের অনন্য পন্থা নয়, অসংযুক্ত ভাবনা-বেদনা চিত্তবিকারের লক্ষণ। তবে আমার বিবেচনায় আজকালকার সোঽহংবাদ ভিক্টোরীয় উদ্যোগপর্বেই উৎপন্ন ; এবং সে-যুগের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য যেমন সর্বজ্ঞতার দাবি ক'রে শেষ

* Victorian England : The Portrait of an Age—By G. M. Young (Oxford).
Daylight and Champaign—By G. M. Young (Oxford).

পর্যন্ত লোক হাসিয়েছিল, তেমনই শত্রুদলের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারিভাষিকের দুর্গে ঢুকে, কোনওটা আর প্রাণে প্রাণে বেরিয়ে আসেনি। এর পরে কর্মকাণ্ডে অনাস্থা আমাদের একমাত্র গতি; এবং অনাস্থার ধর্ম এমনই ভয়ানক যে নিজের নাক কেটেও আমরা পরের যাত্রা ভাঙতে প্রস্তুত। তৎসত্ত্বেও আমি আধুনিকদের নিন্দনীয় ভাবি না; এবং আমার বিচারে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব বর্বরতার চিহ্ন নয়, সভ্যতার পরিচয়। অন্ততঃপক্ষে প্রতর্ক পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যের নিকটাত্মীয়; এবং গ্রীক্‌দের সময় থেকে পশ্চিমের মানুষ কোনও এক প্রকারে কৈবল্য-প্রাপ্তি অসম্ভব বুঝে বৃত্তির সংখ্যা তো বাড়িয়ে গেছেই, উপরন্তু বৃত্তি-বিশেষের মধ্যে বিকল্পের বাধ সাধেনি।

এই বহুরূপী জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক সংজ্ঞা শ্রমবিভাগ; এবং শ্রম-বিভাগ ব্যতীত ব্যক্তিগত ব্যুৎপত্তির অপচয় যেহেতু সুনিশ্চিত, তাই বর্ধিষ্ণু সভ্যতায় স্বপ্রাধান্য প্রশ্রয় পায় না, সহজাত ক্ষমতার যথোচিত প্রয়োগ সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনে। অতএব সাম্প্রতিকদের মনে অবিশ্বাসের ভয়াবহ প্রসার দেখে আত্মজিজ্ঞাসার অবদমন সঙ্গত নয়; তারই চালনে প্রাচীনেরা সশ্রদ্ধ দৈবানুগত্যে পৌঁছেছিলেন; এবং স্বকীয়তা আর বিধিলিপির সমীকরণ সাধারণত অধিকারভেদে থামে বটে, কিন্তু সর্বশক্তিমান পুরুষকারের নাম জ'পে সে-বিপদ কাটানো সম্ভব নয়, সে-জন্যে শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও সংশয়ের এমন সংমিশ্রণ চাই যাতে ব্যক্তি বনাম সমাজের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোনও পক্ষ পুরোপুরি না জেতে। আমি যত দূর জানি, সে-রকম লোকপাল পৃথিবীর কোথাও অদ্যাবধি জন্মায়নি; তবে ঐতিহাসিক ব্যাপারে সাহিত্যের সাক্ষ্য যাদের কাছে অবান্তর নয়, এলিজাবেথী ইংলণ্ডে তাদৃশ প্রতিসাম্যের আভাস তাদের মিললেও বা মিলতে পারে। কেননা কড্‌ওয়েল্‌-সদৃশ বামাচারীও এ-প্রসঙ্গে উইণ্ড্যাম্‌ ল্যুইস্‌-এর ন্যায় দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে একমত; এবং আমার মতো মধ্যবর্তীর কাছে রবর্ট্‌ সেসিল্‌-এর উন্নতি আর এসেক্‌স্‌-এর পতন শুধু পূর্বোক্ত স্থিতিস্থাপকতার নয়, এই সত্যেরও অকাট্য প্রমাণ যে সমাজব্যবস্থা সর্বাঙ্গীণ না হলে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই শিকল ছেঁড়ে, ব্যক্তিস্বরূপ ধরা পড়ে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরোহী ; এবং তার অভ্যুদয়ে অগত্যা যেমন পারিপার্শ্বিকের অধোগতি ঘটে, তেমনই ব্যক্তিস্বরূপের অবরোহ প্রতিবেশীর প্রতিষ্ঠা বাড়ায়। হয়তো বা সেই জন্যে যন্ত্রযুগের সমাজবিপর্যয়ে যাঁরা স্বনামধন্য, তাঁরা অকপট হিতৈষণা সত্ত্বেও অতখানি নিষ্ক্রিয় ; এবং শ্রমিকদের দুর্দশা-তালিকার পাদটীকায় এঙ্গেল্‌স্ যদিও ডিজ্রেলি-র নিরপেক্ষ দৃক্‌শক্তির গুণ গেয়েছেন, তবু "সিবিল্"-প্রণেতার রাষ্ট্রীয় প্রতিভা স্বপরিকল্পিত তুলাসাম্যের নির্মাণ-কার্যে আত্মোৎসর্গ করেনি, প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদ-কল্পে আজীবন চক্রান্ত চালিয়েছিল। আসলে অনুরূপ আত্মম্ভরিতা আর তৎসম্পর্কিত আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রায় সকল ভিক্টোরীয়ান্-এর মধ্যে বর্তমান ; এবং এই প্রবৃত্তিদ্বয়ের অভিশাপে সে-কালের মহাপুরুষেরা শুধু জ্ঞানপাপী নয়, এমনকি নিতান্ত নেতিবাচক। কারণ পরিবর্জনই ব্যক্তিবাদের মূল মন্ত্র ; এবং বিবেকের হিতোপদেশ আর নির্জিতের আর্তনাদ, উভয় উৎপাতই যেহেতু সমান বিপজ্জনক, তাই তখনকার ব্যক্তিবাদীরা একসঙ্গে অন্তর-বাহিরের অস্তিত্ব ভুলে এমন এক অমানুষিক লোকে পৌঁছেছিলেন যেখানে ঐশ্বর্যই অগতির গতি। কিন্তু তার পরে ব্যক্তিত্বেরও কোনও মানে থাকে না ; এবং যে-চারিত্র্য বা লোকমত তার বৈভাষিক অভিজ্ঞান, সে-দুটোকে সার্বজনীন বিষয়াসক্তির উদ্বেগে হারিয়ে কৃতার্থম্মন্যেরা অবশেষে দেখেন যে পরিমেয় ধন-সম্পত্তি ভিন্ন তাঁদের অপর পরিচয় নেই।

অর্থাৎ ব্যবসাতন্ত্র একাধারে অহংসর্বস্ব ও রক্ষণশীল ; সেখানে লাভের আশায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের অনুকরণে ব্যস্ত, অথচ কেউ কারও সাহায্য চায় না কিংবা পায় না ; এবং তার ফলে সমাজের অধিকারভেদ ঘুচুক বা না ঘুচুক, সমানাধিকার আসে না, বরং স্বাধিকারপ্রমত্তেরা অবৈতনিক বররুচিদের অনাহারে মারে। ভিক্টোরীয়া-র রাজ্যে এ-নিয়ম অন্তত নিপাতনে সিদ্ধ ; এবং তদানীন্তন মনোজগতের উচ্ছ্রিতি ও পরিব্যাপ্তির নিদর্শন হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত গ্ল্যাড্‌স্টন্-আদির কাব্যচর্চা উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু সে-সাক্ষ্যের প্রতিপক্ষে এ-কথাও অবশ্যস্মর্তব্য যে যুবরাজ তথা সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড্-এর বন্ধু-বান্ধব শিল্প-সাহিত্যে অথবা দর্শন-বিজ্ঞানে নাম কেনেনি, মহাজনীর মুনাফা জুয়ায় ফুঁকেই তাঁর মন

ঘুগিয়েছিল। সুতরাং এ-রকম অনুমান মোটেই অযৌক্তিক নয় যে ইংলণ্ডের শাসকবর্গ অতঃপর ঠাট বজায় রাখলেও, রাষ্ট্রপরিচালনার ভার ইতিপূর্বেই শ্রেষ্ঠীদের হাতে সঁপেছিলেন; এবং সে-অনভ্যস্ত ভারের চাপে তারা অনুগামীদের নিয়ে উপরে উঠতে পারেনি, উল্টে ঊর্ধ্ববর্তীদেরই টেনে সমভূমিতে নামিয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে অধোগতি আর প্রগতি এক নয়; এবং স্বয়ং হেগেল্-এর নিরুক্তি সত্ত্বেও গুণ ও গণনার প্রভেদ আকাশ-পাতালের চেয়ে বেশী।

অতএব য়্যাং যাই ভজান না কেন, ইংরাজী সভ্যতার পরাকাষ্ঠা ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের অলি-গলিতে অন্বেষ্টব্য নয়, আঠারো শতকের প্রথমার্ধেই দ্রষ্টব্য; এবং তখনই ব্যক্তি ছিল সমাজের মুখপাত্র, যেমন সমাজ করত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের প্রতিপালন। অবশ্য স্বার্থপরতা সকল মানুষের মজ্জাগত; এবং ভিক্টোরীয় যুগের আগেও এমন লোক বিরল নয় যে দেশ ও দশের সর্বনাশে আত্মোন্নতির প্রয়াস পেত। তথাচ পূর্ব কালে ন্যায়মার্গই বোধহয় ইংরাজদের টানত; এবং স্বাধিকারপ্রমত্ত দ্বিতীয় জেম্স্-এর সিংহাসনচ্যুতি সপ্তদশ শতাব্দীরই অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু অনাচারী ওয়রেন্ হেস্টিংস্-এর অপরাধমুক্তি এর এক শ বছর বাদে। আসলে হেস্টিংস্ হয়তো আগামী যুগের অগ্রদূত ব'লেই, বর্ক্, শেরিডেন্, ফক্স্-এর সমবেত চেষ্টা তাঁকে পাড়তে পারেনি; এবং অনুগামী সাম্রাজ্য-শাসকদের অনেকে যদিও ব্যভিচারে তাঁকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তবু সে-জন্যে আর কেউ কখনও বিপদে পড়েননি, প্রায় সকলের ভাগ্যে সম্মান-সমৃদ্ধির আতিশয্য ঘটেছিল। তবে প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস আজ প্রাচ্য মানুষকেই সাজে; এবং পশ্চিম যেহেতু লোকত কর্মফলে বীতশ্রদ্ধ, তাই ভিক্টোরীয়ান্-দের স্বায়ত্তশাসিত ভবিতব্য হয়তো পাশ্চাত্ত্য মতে প্রশংসনীয়। তাহলেও এমন ধারণার ভিত্তি নেই যে রাষ্ট্রজীবনে বীরপূজা অদৃষ্টবাদের চেয়ে কম ক্ষতিকর। অন্ততঃপক্ষে ইটালি ও জার্মানির সাক্ষ্য এ-রকম বিশ্বাসের প্রতিকূল; এবং নৈয়ায়িক শশবৃত্তি ইংরাজদের মজ্জাগত না হলে, সে-দেশও এত দিনে নীতিনিরপেক্ষ অগ্রনায়কদের পদান্তে লুটাত।

কারণ স্বপ্রাধান্যে ও জাত্যভিমানে উত্তরভিক্টোরীয় ইংলণ্ডই হিট্‌লার-মুসোলীনি-র দীক্ষাগুরু; কেবল যুক্তি-তর্কের অনভ্যাস-বশত ইংরাজেরা এখনও বোঝেনি যে সেই দুই আদর্শ মূলত অভিন্ন; এবং যে-কোনও স্বয়ংবৃত জাতিই যেকালে জৈবোৎকর্ষের অনন্য বাহক, তখন জাতীয় মহিমার একমাত্র আধার যে-কোনও স্বয়ম্ভর নেতা। অদৃষ্টবাদের বেলায় এই নির্বাচন নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে সিদ্ধ; এবং সেখানে কোনও এক জনের বা এক সম্প্রদায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না। এমনকি সাময়িক সর্ব-সম্মতিও সে-ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; এবং ভূতের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে জুড়ে, নিত্যের নিকষে নৈমিত্তিককে যাচিয়ে, তবেই অদৃষ্টবাদী কর্তব্যে হাত দেয়। সুতরাং নিয়তিনিষ্ঠা সভ্যতারই নামান্তর; এবং সভ্যতা যেমন প্রত্যুৎপন্নমতির জনক, তেমনই তার সঙ্গে অবিমৃষ্যকারিতার সম্পর্ক অহি-নকুলের চেয়েও বিসদৃশ। বস্তুত অবস্থানুরূপ কার্য বর্বরদেরই মানায়, পরিণামচিন্তা সভ্য মানুষের মজ্জাগত; এবং আরব্ধ কর্মের পরিসমাপ্তি কোথা ভাবলে, কর্তার আত্মপ্রত্যয় হয়তো টেঁকে না, কিন্তু তখন পরমুখা-পেক্ষিতাও আর উপকারে লাগে কিনা সন্দেহ। অতএব সে-সময়ে আধিদৈবিকের ধ্যান অত্যাবশ্যক ঠেকে, এবং প্রবর্তক আর প্রমিতির মধ্যে প্রভেদ থাকে না। আমার বিবেচনায় এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বসমাস গ্রীক্ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ; এবং সমসাময়িক বিদ্যাভিমানীদের মধ্যে অশ্রদ্ধার বৃদ্ধি দেখে টেনিসন্ যদিও মানবমনে বিনম্র বিস্ময়ের পুনরাবর্তন কামনা করেছিলেন, তবু তাঁর আর্ত প্রার্থনার পিছনে অনিশ্চয়ের উপলব্ধি একেবারেই নেই।

তাই য়াং-এর ওকালতি সত্ত্বেও সে-কালের কাব্যসাহিত্যে সফোক্লিস্-এর প্রতিধ্বনি আমি অন্তত শুনতে পাই না; এবং "অ্যান্টিগনি"-রচনাকালে সফোক্লিস্-ও মেনেছিলেন বটে যে জ্ঞানগর্বিতেরা অন্ধনীয়মান অন্ধদেরই সগোত্র, কিন্তু সে-অভিজ্ঞতার ফলে অক্ষম লীলাবাদ তাঁর কাছে অপরিহার্য ঠেকেনি, তিনি কায়মনোবাক্যে বুঝেছিলেন যে মানুষ ম'রে অদৃষ্টকে ফাঁকি দেয়। মৃত্যু-সম্বন্ধে এই অকুতোভয় ভিক্টোরীয় যুগে নিতান্ত দুর্লভ; এবং সেই জন্যে অষ্ট প্রহর অভিব্যক্তির নাম জ'পেও সে-যুগ ধ্রুপদী নিরাসক্তির

দিকে এগোয়নি, শেষ পর্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক বিষয়াসক্তির শরণ নিয়েছিল। অর্থাৎ তখনকার মরণাতঙ্ক নিরুপম জিজীবিষার উত্তরসাক্ষ্য নয়—সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ অথবা সঞ্চয়ের চক্রবৃদ্ধি গতাসুর অসাধ্য ব'লেই, ভিক্টোরীয়ান্-দের মনে মৃত্যুচিন্তা এতখানি জায়গা জুড়েছিল; এবং মধ্যবিত্ত নীতি-শাস্ত্রের উৎস খুঁজতে গিয়ে ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক এমান্যুয়েল্ বের্ল্ সম্প্রতি লিখেছেন যে শ্রেষ্ঠীরা আজও ভোগের লালসায় টাকা জমায় না। নচেৎ গত মহাযুদ্ধে সন্তান-সন্ততি হারিয়ে তাদের অর্থলিপ্সা নিশ্চয়ই সমূলে ঘুচে যেত, সার্বত্রিক সর্বনাশে ধনৈশ্বর্য কারও উপকারে লাগবে না জেনেও তারা আবার প্রাণপণে বিষয়কর্মে ব্যাপৃত হত না; এবং এতাদৃশ অর্থপৈশাচিকতার সঙ্গে মৃত্যু-সম্বন্ধে ডিকেন্স্-আদির ভাববিলাস যদিও আপাতত বিযুক্ত, তবু মনোবিকলনের মতে অবচেতনার স্বভাব স্বতোবিরোধী।

ওই জাতের মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে জেম্স্-এর পরিচয় না থাক, তিনি সুদ্ধ বলেছিলেন যে দুর্গন্ধে যতই ন্যাকার আসুক না কেন, সে-দুর্গন্ধ ঘন ঘন না শুঁকেও আমাদের স্বস্তি নেই; এবং ভিক্টোরীয়ান্ সোনার তরীতে মৃত্যুর অজ্ঞাতবাস এই কারণেই অনিবার্য। তবে অবচেতনা সে-যুগের নিজস্ব নয়; এবং এ-জন্যে সে-কালের দোষ ধরতে যাঁদের বিবেকে বাধে, তাঁরা যেই আঠারো শতকের নির্মম ভোগলিপ্সার বিশ্লেষণ করবেন, অমনই আমার কথায় তাঁদের অশ্রদ্ধা ঘুচবে। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর তথাকথিত ধ্রুপদী ধরণ-ধারণ কখনও নিষ্কাম ধর্মের ধার ধারত না; এবং অশন-ব্যসনের আধিক্য-বশতই সে-সময়ে অকাল মৃত্যুর প্রকোপ বেড়েছিল। কিন্তু তখনকার মানুষ আপনাদের দুর্বুদ্ধি নিজেদের কাছে ঢেকে রাখত না; তারা জানত যে সংযমের বাঁধ যদি মুহুর্মুহু ভাঙে, তাহলে প্রলয়পয়োধি অবশেষে কূল ছাপাবেই ছাপাবে; এবং আত্মবেদের পরিবৃদ্ধিই যেকালে মানবসভ্যতার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন এই অন্তর্দৃষ্টির গুণে আঠারো শতক যেমন সভ্য-পদবাচ্য, তেমনই এর অভাবে ভিক্টোরীয়া-র আমল অসভ্য। তবে অসভ্য-বিশেষণটা ভিক্টোরীয়ান্-দের উপরে চাপালে, প্রকৃত বর্বরদের উপযোগী পদবী আর হয়তো অভিধানে মিলবে

না ; এবং তাই স্পেংলারী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীকে সংস্কৃত আর উনিশ শতককে সভ্য বলাই বাঞ্ছনীয়।

উপরন্তু সংস্কৃতি ও সভ্যতার সেই পারিভাষিক প্রভেদ যিনি সর্বান্তঃকরণে মানবেন, তাঁর কাছে ভিক্টোরীয়ান্-দের ছিদ্রান্বেষ আর সার্থক ঠেকবে না, ধরা পড়বে যে মনুষ্যসমাজই দেহধর্মী ; এবং ব্যক্তিবিশেষের আপত্তি সত্ত্বেও যৌবন যেমন জরায় ফুরায়, তেমনই জাতিবিশেষের অনুমোদন-ব্যতিরেকেও ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতি ম্রিয়মাণ সভ্যতায় বদলায়। তখন সম্ভবত অধস্তনের অল্প-বিস্তর পদোন্নতি ঘটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অগ্রণীরাও তাদের চিৎপ্রকর্ষ হারায় ; এবং সে-অবস্থায় চির প্রথার অত্যাচার কমলেও, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা পায় না, বরং গতানুগতিক শাসক-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সেধে দু-একজন প্রবল পুরুষ সকলের হাতে-পায়ে দাসত্বের শিকল পরায়। অতঃপর প্রাণিমাত্রের মতো রাষ্ট্রও ম'রে ভূত হয় ; এবং সে-ভূত এক-আধ শতাব্দী জীবিতদের শাসিয়ে শেষ পর্যন্ত মহাভূতের মধ্যে বেমালুম মিশিয়ে যায়। তত দিনে তার পিণ্ড দেওয়ারও লোক জোটে না, তার নাম যদি কদাচিৎ কারও মনে পড়ে, তবে সে-নামের মানে আর জনমানব হৃদয়ঙ্গম করে না ; এবং তার পরেও যারা তার প্রত্নাস্থি নিয়ে নাড়ে-চাড়ে, তারা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে, সুস্থ শরীরে প্রলাপ বকে, অকারণে পরকে নাচায় আর নিজের সঙ্গে খেলে। সুতরাং প্রগতি আসলে উন্মার্গদেরই মারাত্মক মরীচিকা ; এবং তার পরিকল্পনা ভিক্টোরীয় আত্মশ্লাঘার অন্যতম উদাহরণ।

কারণ মণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ডে মহাকালের রথ যে-কম্বুরেখায় ঘোরে, তাতে অধঃ-উর্ধ্বেরই পার্থক্য আছে, অগ্র-পশ্চাতের বালাই নেই ; এবং কালাবর্তের এক-একটি পাক এক-একটি সভ্যতার অলঙ্ঘনীয় অয়ন। অর্থাৎ এই অয়নসমূহের প্রত্যেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লে, কোনও দুটোর অন্তঃ-প্রবেশ যত না অনাবশ্যক, ততোধিক অঘটনীয় ; এবং চক্রাকারে চললে, মধ্যপথে দিগ্‌বৈপরীত্য যেহেতু অবশ্যম্ভাবী, তাই বৃত্তবদ্ধ জাতিসকল কেবল প্রারম্ভে স্বগত নয়, অন্তিমে স্ববিরোধীও বটে। অতএব যারা এক বার উন্নতির চূড়ান্তে উঠেছে, অবশেষে অবনতির অতলে নামা

ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না; এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈষম্যে চড়া-পড়া যেমন সুস্পষ্ট, তেমনই সেই হ্রাস-বৃদ্ধির অমোঘ পৌর্বাপর্য কারও চেষ্টা-নিশ্চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না, সদসৎ-নির্বিচারে সমস্ত মানব-গোষ্ঠীকে জগদ্দল যাঁতায় পেষে। অবশ্য ইংরাজদের কীর্তিস্তম্ভ বোধহয় আজও অসমাপ্ত; এবং তাদের ইতিহাস যখন আদ্যন্ত জানা যাবে, তখন অষ্টাদশ শতাব্দীকে নিশ্চয়ই আর এতখানি লোভনীয় লাগবে না। কিন্তু সে-রকম দিন যদি না আসে, যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে পৌঁছানোর আগেই যদি ব্রিটিশ্ বৈজয়ন্তী ধূলায় লুটায়, তবে লোকে মহারাণীর রাজত্বকালেই মন্বন্তরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজবে; এবং সে-অভিশপ্ত উত্তরাধিকার থেকে দু-চারজন ভাগ্যমন্ত দৈবাৎ অব্যাহতি পাক বা না পাক, নিয়তির নাগরদোলা থামবে না, আত্মদর্শীরা শুধু বুঝবে যে চক্রচর জাতিদের গতিবিধি এত জটিল যে বৃহত্তর উত্থান-পতনের মাঝে মাঝেও তারা এক নাগাড়ে লাট খায়।

[ ১৯৩৮ ]

প্রথম মহাযুদ্ধ উপনিপাতকেও নিত্যনৈমিত্তিকের কোঠায় ফেলেছিল ; এবং তার পরে ফৌজদারী আদালতের ছোট খাট বিভীষিকায় আর কারও চমক ভাঙত না। অগত্যা সাংবাদিকেরা রোমাঞ্চসন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন মেসোপোটেমিয়ায় ; এবং সেখানে সুমেরীয় পুরাবৃত্তের পুনরুদ্ধার-কল্পে লেনার্ড্ উলি যে-খননকার্য চালাচ্ছিলেন, তার বিবরণে ও ছবিতে প্রায় সকল দৈনিক পত্র অন্তত কিছু দিনের জন্যে ভ'রে উঠেছিল। তাহলেও ইরাকী প্রত্নতত্ত্বের বিজ্ঞাপনটুকুই অন্তঃসামরিক সঙ্কটের অন্যতম প্রতিক্রিয়া, তার আরম্ভ তথা অনুশীলন অপদস্থ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উত্তর-সাক্ষী নয় ; এবং বাইবেলী মহাপুরুষদের লীলাভূমি ব'লে, ধার্মিকেরা তো এ-অঞ্চলের খোঁজ-খবর সর্বদাই রাখতেন, এমনকি আঠারো শতকের দুঃসাহসিক পুণ্যলোভীরাও ব্যাবিলন্ ও নিনিভার ধ্বংসস্তূপ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। স্থানীয় প্রাচীনদের "ক্যুনীফর্ম্" বা কীলক লিপির প্রথম নিদর্শন তাঁরাই সংগ্রহ করেন ; এবং সেই সকল মৃত্তিকালেখের অনুবাদ যদিও সমসাময়িকদের সাধ্যে কুলায়নি, তবু জন-কয়েক সুইডিশ্ মনীষী বুদ্ধিবলেই সে-লিপির উচ্চারণপদ্ধতি ধরতে পেরেছিলেন। অতঃপর হেন্‌রি রলিন্সন্-এর প্রাণপণ প্রয়াসে তার অর্থও অপ্রকাশ রইল না ; এবং ১৮৩৫ সালে পারস্য থেকে তিনি খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের যে-অনুশাসন টুকে আনলেন, তাতে যেহেতু লিপির বৈচিত্র্য না থাকলেও, ত্রিবিধ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল, তাই পারসিক সংস্করণের সাহায্যে অন্য দুটির মানে বুঝে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ভজালেন যে তিনটিই শুধু আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ নয়, সেগুলির সম্পর্ক এত নিকট যে সম্ভবত প্রত্যেকে একই উৎসে উৎপন্ন।

পক্ষান্তরে সে-উৎস যে স্থমেরীয় ভাষা, এ-আবিষ্কারের সম্মান ফরাসী পণ্ডিত জ্যুল্ ওপের-এর প্রাপ্য ; এবং সে-কালের বিশেষজ্ঞেরা তাঁর সিদ্ধান্ত তখনই তখনই মানতে চাননি বটে, কিন্তু পরবর্তীদের খনিত্র আজও সেই অনুমানের প্রেরণা যোগাচ্ছে।

উপরন্তু খননকার্যেও উনবিংশ শতাব্দীর অবদান অকিঞ্চিৎকর নয় ; এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাবিলোনিয়ার দুটি ধ্বংসস্তূপ খুঁজতে খুঁজতে টেলর এরিডু ও উর-নামক স্থমেরীয় নগরীদ্বয়ের সন্ধান তো পান বটেই, এমনকি তাঁর আগেই লফ্টাস্ উক্ত শহর-দুটি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেগুলির পরিচয় তখন তিনি জানতেন না ; এবং আসিরিয়ার প্রস্তর স্থাপত্যের সংসর্গে প্রত্নতত্ত্ব শিখে তিনি ইষ্টকাদিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন ব'লে, উরুকের বিখ্যাত দেবালয়ের খানিকটা খুঁড়েই তাঁর আগ্রহ মিটেছিল, তিনি আরও নীচে নামতে চাননি। কারণ সমসাময়িক পুরাবিদেরা ওপের-কে তফাতে রাখতেন ; এবং সত্যের খাতিরে আমরা মানতে বাধ্য যে সে-পর্যন্ত উল্লিখিত স্থানগুলিতে এ-রকম কোনও সাক্ষ্য মেলেনি যাতে ভাবা যেত যে স্থমেরীয় সভ্যতা ব্যাবিলন্-অস্থরের জনক। তৎসত্ত্বেও ইরাকী পুরাবৃত্তের গবেষণা এগিয়ে চলেছিল ; এবং ১৮৭৪ সাল থেকে ফরাসী সরকারের অনুগ্রহে লাগাশ্ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষে যে-পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ স্থরু হয়, তার ফলেই স্থমেরীয় ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারা আমাদের জ্ঞানগোচরে এসেছে। তবে সে-ইতিহাসের আদিপর্ব আমরা পড়তে পেরেছি সম্প্রতি ; এবং স্থসার প্রাক্‌স্থমেরীয় সংস্কৃতি যদিও গত শতাব্দীর শেষেই দ মর্গান্-এর কাছে ধরা দিয়েছিল, তবু সে-সংস্কৃতি যেহেতু যাযাবর অবস্থারই রূপান্তর, তাই আমরা স্থানীয় সভ্যতার প্রথম স্তরে পৌঁছেছি উলি-প্রমুখ সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রযত্নে। অর্থাৎ উর-রাজবংশের বহুবিজ্ঞাপিত সমাধিমন্দিরই স্থমেরীয় জাতির প্রাচীনতম নিদর্শন ; এবং সে-কবরগুলির বয়স-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, এখন আর এতে সন্দেহ নেই যে উক্ত গোরস্থান খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার থেকে আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যবর্তী। কিন্তু উলি নিজে আরও পাঁচ শ বছর পিছিয়ে গেছেন ; এবং যত দিন স্থমেরের অন্যত্র

নরবলির প্রমাণ না জোটে, তত দিন অবধি অনেকেই উলি-র দিকে ঝুঁকবেন।

সে যাই হোক, এ-সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত যে সুমেরীয় জাতি ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের প্রাগ্‌বর্তী ; এবং সে-সময়েও তারা এমন সুব্যবস্থিত সমাজে বাস করত যে শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে তারা নিশ্চয় তখন যৌবনে পৌঁছেছিল। বস্তুত অনুশাসনের যুগে সুমেরীয় চিৎপ্রকর্ষের কোনও বিস্ময়কর উন্নতি আমাদের চোখে পড়ে না, বরং তাদের প্রাগৈতিহাসিক কীর্তিকলাপই এখনও আমাদের তাক লাগায়। কারণ তাদের লিখিত ইতিবৃত্ত প্রধানত যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণমাত্র ; এবং সে-হানাহানির মধ্যে তারা স্বভাবতই তাদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি, দিগ্বিজয় অথবা আত্মরক্ষার দাবি মেটাতে গিয়ে প্রাচীনতর চর্যা ও চর্চা ভুলতে বসেছিল। অবশ্য তাদের প্রাক্তন পরিচয় আমাদের অবিদিত ; এবং তাদের আদি বসতি কোথায়, কারা তাদের পূর্বপুরুষ, তারা কবে সুমেরে আসে—এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা আজ পর্যন্ত জানি না। তাহলেও এ-কথা নিরাপদে বলা চলে যে আমরা যখন ইরাকে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ পাই, তখন তারা সেখানকার পুরাতন বাসিন্দা—এত পুরাতন বাসিন্দা যে তখন আর তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই, নানা রক্তের সংমিশ্রণ ঘ'টে তাদের ভিতর সঙ্করতা দেখা দিয়েছে। অন্ততঃপক্ষে তাদের পুরাকালীন ভাস্কর্য তথা করোটি-কঙ্কালের সাক্ষ্য সেই রকম ; এবং সুমেরীয় ভাষার সমগোত্রীয় ভাষা যদিচ অন্যত্র মেলে না, তবু পণ্ডিতেরা মর্জিমতো তার সঙ্গে তুর্কী, জর্জীয়, বাস্ক্‌, চীনা, কোরীয়, তামিল, বাণ্টু ও পোলিনেসীয় ভাষার মিল খুঁজে পেয়েছেন। আবার তারা নিজেরা ভাবত যে মহাপ্লাবনের আগে তাদের দেশ ছিল পারস্য উপসাগরের পূর্ব পারে, এবং দেবরোষে অন্য সকলে ডুবে মরলে, তাগ্‌তুগ্‌-নামক জনৈক ধার্মিক সপরিবারে পালিয়ে ব্যাবিলোনিয়ায় সংসার পাতে।

পক্ষান্তরে সুমেরীয় মন্দিরগুলি যেহেতু পর্বতের আদর্শে নির্মিত, তাই কোনও কোনও পণ্ডিতের অনুমানে তারা মূলত ইরানীয় অধিত্যকার

অধিবাসী ; এবং আলোচ্য গ্রন্থের* প্রণেতা উক্ত মত মানেন না, তাঁর বিশ্বাস তারা এক সময়ে থাকত কৃষ্ণ সাগর ও ক্যাস্‌পিয়ান্‌ সমুদ্রের মধ্যবর্তী প্রদেশে। সৌভাগ্যক্রমে উৎপত্তির আলোচনা স্থগিত রেখেও পরিণতির বিচার সম্ভবপর ; এবং সুমেরীয় জাতির জন্মবৃত্তান্ত অনিশ্চিত ব'লেই, আজ আর এ-কথা তর্কাধীন নয় যে খৃষ্টাব্দের ত্রিশ শতক পূর্বে তারা যতখানি ঐহিক সমৃদ্ধির অধিকারী ছিল, যন্ত্রযুগের অভ্যুদয় পর্যন্ত য়ুরোপ ততোধিক ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়নি। উপরন্তু আয়ুর পরিমাণে সুমের যদিচ মিসরের সমকক্ষ নয়, তবু প্রভাবে তথা প্রতিপত্তিতে সে-সভ্যতা হয়তো ঈজিপ্ট্‌কে হারিয়েছিল ; এবং প্রতিদ্বন্দ্বী নগররাষ্ট্রের অনৈক্য-বশত গ্রীক্‌দের মতো তারাও বারংবার বিদেশী শত্রুর কবলে পড়েছিল বটে, তথাচ তাতে তাদের সমাজব্যবস্থা অপ্রতিষ্ঠ হয়নি, বরং বিজেতারাই তার কুহকে ম'জে অবিলম্বে নিজেদের বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিহার করেছিল। এমনকি মাঝে মাঝে য়িহুদী ও বর্বরের হাত ঘুরে, ইরাকের অধিরাজ্য যখন সুমের ও আক্কাদের দোটানা থেকে অবশেষে ব্যাবিলনের তত্ত্বাবধানে চ'লে গেল, তখনও দিগ্বিজয়ী হামুরাবি সুমেরীয় আদর্শেই তাঁর সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুললেন ; এবং তাঁর জগদ্বিখ্যাত শাসনবিধিতে তিনি কেবল সেই সনাতন নিয়ম-নিষেধকেই স্থান দিলেন, যেগুলো আবহমান কাল ধ'রে সুমেরের ভূতপূর্ব রাজাদের একাধিক অনুশাসনে ছড়িয়েছিল। অবশ্য তার পরে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে সুমেরীয়দের অস্তিত্ব আর কারও মনে রইল না ; তারা আস্তে আস্তে ব্যাবিলোনীয়দের সঙ্গে মিশতে লাগল। তাহলেও তাদের ধর্ম ও আচার আরও পনেরো শ বছর টিকেছিল ; এবং খৃষ্টপূর্ব সাত শতকে সুদ্ধ তাদের নাম একেবারে ডোবেনি—তাদের ভাষায় কথোপকথন তদানীন্তন অসুরবাসীদের সাধ্যে না কুলালেও, সেখানকার প্রত্যেক শিলালিপিতে কথিত ভাষার পাশে পাশে সুমেরীয় ভাষা যথাবৎ ব্যবহৃত।

কিন্তু এটাই সুমেরীয় দুর্মরতার শেষ নিদর্শন নয় : যে-বূ্যহরচনার গুণে অ্যালেক্‌জাণ্ডর-এর অভিযান কোথাও থামেনি, তা বোধহয় সুমেরীয়

* Buried Empires—by Patric Carleton (Arnolds).

কারয়িত্রী প্রতিভার অন্যতম কীর্তি ; এবং তৎসত্ত্বেও সার্গন্, নারাম্-সিন্ বা ডুঙ্গি যেমন রাজ্যবিস্তারব্যাপারে সেকেন্দারের সঙ্গে তুলনীয় নন, তেমনই তাঁদের জয়যাত্রার প্রসার তো প্রায় সমান রোমহর্ষক বটেই, এমনকি তার ফল নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। পক্ষান্তরে সুমেরীয়েরা স্বভাবত অসুর-বাসীদের চেয়ে কম রক্তপিপাসু ছিল ; এবং উরের সমাধিমন্দিরে নরবলির প্রাচুর্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের বাহুল্য দেখে সে-বিশ্বাস যদিও প্রথমে ধাক্কা খায়, তবু তাদের সঙ্গে পরিচয় যতই বাড়ে, ততই বোঝা যায় যে সাধারণ নাগরিকের আষ্টপ্রহরিক জীবনে ন্যায়বল বাহুবলকে দাবিয়ে রাখত। তাহলেও শুরু থেকেই তাদের সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাগ প্রশ্রয় পেয়েছিল। তবে সেখানকার অধিকারভেদ বোধহয় কৌলীন্যের ধার ধারত না, জীবিকা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণও আপনা-আপনি বদলাতে থাকত। অন্ততঃ-পক্ষে প্রথিতযশা রাজারা শ্রেণীবিশেষের শোষণে অন্য সকলের উচ্ছেদ অপছন্দ করতেন, ধর্মের নামে পুরোহিতদের উদরপূর্তি ঘটতে দিতেন না ; এবং খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব ২৫৯০ সালে মহাপ্রাণ উরুকাগিনা তাঁর রাজ্য থেকে দাসপ্রথা তাড়িয়েছিলেন। অবশ্য উরুকাগিনার মতো রাজা সুমেরেও একাধিক বার জন্মায়নি ; এবং পররাষ্ট্রব্যাপারে সুদ্ধ অস্ত্রধারণ অমার্জনীয় ভেবে তিনি অবশেষে যখন একাধারে প্রাণ ও সিংহাসন হারালেন, তখন উরে দাসত্ব আবার ফিরে এসেছিল কিনা, তা আমাদের জানা নেই। তথাচ সে-দেশে পূর্ত ইত্যাদি হিতৈষণা রাজধর্মের প্রধান অঙ্গ ব'লে বরাবরই স্বীকৃত হয়েছিল ; এবং যাতে অব্যাহত ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যায় প্রতি-যোগিতা বা অকারণ চুক্তিভঙ্গ ঢুকতে না পারে, তদনুরূপ বিধি-নিষেধের পরিকল্পনাতে অনেক রাজাই প্রচুর সময় কাটিয়েছিলেন। বস্তুত সভ্যতার পথে সুমেরীয়েরা এতখানি এগিয়েছিল যে কেবল কৃষিকর্মের আয়ে তাদের কুলাত না, অধিকাংশ নাগরিকের দিন চলত বিকিকিনির লাভে ; এবং সেই জন্যে বড় বড় দেবালয়েও তারা হাট বসাত, একত্রে পুণ্যার্জন ও ধনাগম তাদের বিবেকে বাধত না।

ফলত অধিদৈবতের সঙ্গে তারা প্রায় অপত্য-সম্বন্ধ পাতিয়েছিল ; এবং তাদের প্রধান দেবতা বিশ্বমাতা যদিও প্রাচীন জাতি-মাত্রের

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির রহস্যময় প্রতীক, তবু সুমেরের ছোট খাট দেব-দেবীরা বোধহয় সেখানকার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতারই মুখপাত্র। কিন্তু ১৯২২ সালে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ক'রে স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন যে প্রাচীন জগতে সুমেরীয়দের চেয়েও নিরীহ জাতি তো ছিলই, এমনকি এই ভারতীয় জাতি হয়তো সাংসারিক সম্পদেও সকল প্রতিবেশীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উক্ত আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সকলেই এক বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের আরম্ভ আর্য বিজেতাদের সঙ্গে; এবং মুখ্যত জ্যোতিবিজ্ঞানের সাক্ষ্যে স্থানীয় পণ্ডিতেরা বলতেন বটে যে আর্যেরা এ-দেশে পা দিয়েছিল ৫০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে, তথাচ এক য়াকোবি বাদে, পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা প্রত্যেকেই ভাষাতত্ত্বের নির্দেশে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালের আগে আর্যদের নাম এ-অঞ্চলে শোনা যায়নি। উপরন্তু সেই অর্ধবর্বর যাযাবরেরা যেহেতু অশ্বচালনা ও কাব্যরচনা ভিন্ন অন্য কোনও কলাবিদ্যার ধার ধারত না, তাই প্রত্নতত্ত্ব এ-ক্ষেত্রে স্থির মীমাংসায় আসতে পারেনি; এবং সে-দিন পর্যন্ত পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র ও স্থূল রকমের মৃৎপাত্র ব্যতীত প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগের আর কিছু নিদর্শন না থাকায় দ্রাবিড় সভ্যতার মহিমা-কীর্তন ঐতিহাসিকের কাছে হাস্যকর ঠেকত। তবে বিশপ্ কল্‌ড্‌ওয়েল্-প্রমুখ দু-একজন নিরুক্তকার ভারতের আদিম ভাষা-সমূহ ঘেঁটে এই কিংবদন্তী রটিয়েছিলেন যে এখানকার অনার্য বাসিন্দারা রাজা, নগর, মন্দির, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র ও লিখিত পুস্তকাদির চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছিল; এবং বেলুচিস্তানের দ্রাবিড়-ভাষাভাষী ব্রাহুইদের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে গবেষকেরা মাঝে মাঝে কল্পনার রাশ ছাড়তেন।

সুতরাং মহেঞ্জো-দড়োতে এক বৌদ্ধ স্তূপ খুঁড়তে খুঁড়তে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জানলেন যে সেটি প্রাচীনতর প্রত্নাবশেষে নির্মিত, তখন অলৌকিক প্রতিভাই তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টির অঞ্জন পরিয়েছিল; এবং সেই জন্যে তিনি অবিলম্বে ধরতে পেরেছিলেন যে সে-ধ্বংসে কয়েক ফুটের উপরে-নীচে অন্তত দু হাজার বছরের তফাৎ রয়েছে।

অবশ্য আর্যেরা নিজেরা রটিয়েছিল যে ভারতবর্ষে ঢুকতেই, তাদের সঙ্গে এক কৃষ্ণকায় মহাজাতির সংঘর্ষ বাধে; এবং সেই আদিম মানুষেরা নাকি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগরে থাকত, সর্ববিধ শিল্প-কলায় তাদের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, আর ব্যবসা-বাণিজ্যে কেউ তাদের এঁটে উঠতে পারত না। কিন্তু তারা যেহেতু নানারকম অশ্লীল উপচারে বিবিধ বিগ্রহের ভজন-পূজন করত, তাই নিরাকারপন্থী আর্যেরা কর্তব্যের তাগিদে তাদের ধনে প্রাণে মারে; এবং সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে প্রমাণ মিলল বটে যে আর্যদের আত্মপ্রসাদ একেবারে অমূলক নয়, তবু সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল যে তথাকথিত দাসদের সয়তানির সম্বন্ধে তারা যত গল্প বানিয়েছিল, সেগুলো সর্বৈব মিথ্যা, সে-ধরণের মিথ্যা তাদের বর্তমান বংশধর হের ষ্ট্রাইখার-এর সংবাদপত্রকেই সাজে। কারণ যে-জাতি আম্রি, নাল, মহেঞ্জো-দড়ো, হারাপ্পা, রূপার ইত্যাদি নগরের প্রতিষ্ঠাতা, তাদের সমান শান্তিপ্রিয় মানুষ পৃথিবীর আর কোথাও এখনও জন্মায়নি; এবং মহেঞ্জো-দড়োতে প্রাপ্ত কয়েকটা কঙ্কাল দেখে যদিও স্বভাবতই মনে হয় যে স্থানীয় অধিবাসীদের অপমৃত্যু ঘটেছিল, তথাচ কতিপয় খেলার তলোয়ার আর শোভাযাত্রার সড়কি ভিন্ন অপর কোনও অস্ত্র এখানে বা অন্যত্র আজ অবধি কেউ খুঁজে পায়নি। উপরন্তু মার্শাল্-এর পরবর্তীরা না মানুন যে এই সব শহরে দুর্গ বা পরিখা নেই, সে-সকলের নির্মাণ নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কিনা, তা এখনও অনিশ্চিত; এবং তাদের অগণিত সীল-মোহরে কী লেখা আছে, তার পাঠোদ্ধার পর্যন্ত তাদের বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা যেমন পুরোপুরি কাটবে না, তেমনই তাদের উপনিবেশসমূহে অনুশাসনের নিতান্ত অভাব বোধহয় এই বিশ্বাসের পরিপোষক যে তারা কখনও কোনও যশোলিপ্সু রাষ্ট্রনায়কের কবলে পড়েনি।

বলাই বাহুল্য যে শিলালিপি ইত্যাদি লিখিত দলিল-পত্রের অবর্তমানে তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের অগোচরে রয়েছে; এবং ব্যবসাগতিকে সুমেরে পৌঁছে, তারা যদি সেখানে তাদের স্মৃতিচিহ্ন

ছেড়ে না আসত, তবে সিন্ধু সভ্যতার কাল-নির্ণয় হয়তো আমাদের সাধ্যে কুলাত না। তাহলেও আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারতুম তাদের সংস্কৃতি উৎকর্ষের কোন্ উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিল, এবং কতখানি শুচিতা, সদ্বুদ্ধি ও সঙ্কল্প নিয়ে তারা তাদের নগরগুলির পরিকল্পনা করেছিল। তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও কম শৃঙ্খলা দেখা যায় না; এবং যেহেতু তাদের প্রত্যেক শহরে প্রায় সব বাড়ি-ঘর সমান মাপের, তাই এই অনুমান স্বাভাবিক যে সেই গণতান্ত্রিক জাতির মধ্যে খুব বেশী ধনবৈষম্য ছিল না। সুমেরীয়দের মতো তারাও বুঝত যে বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসতি; এবং সম্ভবত বণিকোচিত কাণ্ডজ্ঞানের গুণে তারা সর্বত্র অলঙ্কারের আতিশয্য বাঁচিয়ে চলত। তথাচ দরকার পড়লে, তারা কলাকৌশলে পরবর্তী গ্রীক্‌দের সুদ্ধ হার মানাত; এবং উল্লিখিত সীল-মোহরগুলি তো অতুলনীয় বটেই, এমনকি যে দু-একটা প্রস্তর বা ধাতু-মূর্তি হারাপ্পা ও মহেঞ্জো-দড়োতে বেরিয়েছে, সেগুলির বস্তুনিষ্ঠা তথা রূপায়তনিক শুদ্ধি সর্বসম্মতিক্রমে বিস্ময়াবহ। দেশজয়ে বিরত থেকেও তারা পৃথিবীর যতখানি ঘুরে বেড়িয়েছিল, তার হিসাব শুনে সত্যই চমক লাগে: তাদের নগরে ব্রহ্ম দেশের চুনি ও ইরাকী প্রসাধনসামগ্রীর সাক্ষাৎ মেলে; উর-রাজবংশের কবরে পঞ্জাবী পুঁতির মালা, ভারতীয় বানরের প্রতিকৃতি, সিন্ধু প্রদেশের মৃৎপাত্র ইত্যাদি ছাড়াও, যে-সোনার শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেছে, তা এ-দেশী কেশ-বিন্যাসের অনুকরণ; এবং সারা মেসোপোটেমিয়ায় আজ অবধি যেকালে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহার নেই, তখন আক্কাদের এক সম্প্রতি-আবিষ্কৃত প্রাসাদে জঞ্জালনির্গমের সুব্যবস্থা বুঝি বা সিন্ধু মিস্ত্রীদের কীর্তি। শুধু তাই নয়, কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এই সভ্যতার প্রভাব ঈস্টর দ্বীপে পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছিল; কারণ সেখানকার লিপি নাকি মহেঞ্জো-দড়ো লিপিরই নকল।

মহেঞ্জো-দড়োতে একটি অট্টালিকা বেরিয়েছে, যা দেবমন্দির, না সাধারণ স্নানাগার, তা আমরা এখনও জানি না। তৎসত্ত্বেও সেখানকার বসত-বাড়িতে ঠাকুরঘরের এত ছড়াছড়ি যে স্থানীয় নাগরিকদের ধর্মপ্রাণ না

ব'লে উপায় নেই। তবে হয়তো আধ্যাত্মিক বিষয়েও তারা গণতান্ত্রিক আদর্শ মেনে চলত ; এবং ধর্মের মতো ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সংঘের অনধিকার প্রবেশ তাদের ভালো লাগত না। আসলে নৃবিজ্ঞানীরা যে-সার্বজনীন ধর্মের নাম দিয়েছেন "লাইফ্ রিলিজন্" অথবা প্রাণধর্ম, তারই প্রকারভেদ সিন্ধু দেশের সর্বত্র শিকড় ছড়িয়েছিল ; এবং জগন্মাতার স্বামী বা পুত্র হিসাবে পশুপতিও জনসাধারণের পূজা পেতেন। সুতরাং প্রাণধর্মেই শক্তিমন্ত্রের সূত্রপাত ; এবং শাক্ত আর তান্ত্রিক সমার্থবাচক। এমনকি টানা-হেঁচড়া করলে, শৈবেরাও এই দলে ভিড়তে পারে ; এবং পরবর্তী কালের শাক্ত ও শৈব দ্রাবিড়েরা সিন্ধু জাতির বংশধর হোক বা না হোক, অন্ততঃপক্ষে এ-বিশ্বাসের কোনও হেতু নেই যে সে-জাতির পাট উঠতেই আর্য ধর্ম সারা ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেললে। অবশ্য ঐতিহ্য আর ইতিহাস এক নয় ; এবং নিঃসংশয় প্রমাণের অভাবে তন্ত্রপ্রকরণের জনশ্রুত প্রাচীনতা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য। তাহলেও এ-কথা স্বীকার্য যে এ-দেশে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে, সে-সমস্তের ভিতরে তান্ত্রিক সাধনাই সর্বপুরাতন ; এবং আ-বুদ্ধ-চৈতন্য সংস্কারকদের মধ্যে এমন এক জনেরও সাক্ষাৎ মেলে না যিনি ওই ভাবধারার বাইরে থেকে জনগণকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ বৈদিক হিন্দু ধর্মের বিধিবদ্ধ যাগ-যজ্ঞ এখানকার মাটিতে বাড়েনি ; তৎসম্পর্কিত চাতুর্বর্ণ্য নির্যাতিত অন্ত্যজদের কাছে সদা-সর্বদা অন্যায় ঠেকেছিল ; এবং তন্ত্র শুধু এই সঙ্কীর্ণতার বাধ সাধেনি, ব্যক্তিমর্যাদার উপরে জোর দিয়ে আর সহজ আরাধনার গুণ গেয়ে প্রাগার্য মনুষ্যধর্মকে নিরন্তর বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সেই জন্যে যোগদর্শনও তন্ত্রের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ; এবং তন্ত্রের মতোই তাতে অপৌরুষেয় প্রামাণ্য পরিত্যক্ত ও বিশ্বমানবিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা শিরোধার্য হয়েছে। অতএব মহেঞ্জো-দড়োতে তান্ত্রিক পদ্ধতির উপস্থিতি-সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ না জুটলেও, আমরা সেখানকার মুদ্রাচিত্রের সাক্ষ্যে এ-কথা অনায়াসে বলতে পারি যে সিন্ধু সভ্যতাই যেকালে যোগসাধনার আবিষ্কর্তা, তখন তান্ত্রিক আদর্শও তদানীন্তন মানুষের অজ্ঞাত ছিল না ; এবং কালক্রমে এই দুই মার্গকেই আর্য বিজেতারা

আগা-গোড়া বদলেছিল বটে, কিন্তু ভারতের যে যে-অংশে তাদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম, সেই সেই অংশে তন্ত্রের প্রতিপত্তি যেমন প্রবল, মহেঞ্জো-দড়োর শিল্পগত প্রভাব তেমনই সুস্পষ্ট। উদাহরণত বাংলা দেশ উল্লেখযোগ্য ; এবং শুধু মহাস্থান ও পাহাড়পুরের তক্ষণকলাই সিন্ধু ভাস্কর্যকে স্মরণে আনে না, আধুনিক বাঙালীর নিত্যব্যবহার্য খেলেনা, কাঁথা, বাসন-কোসন ইত্যাদিও সেই ধারাকে অবিকৃত রেখেছে। বস্তুত সারা ভারতের লোকশিল্প বোধহয় প্রাগার্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক ; এবং আপাতত এ-বিশ্বাসও সঙ্গত যে আর্যদের নিরাকার ধর্ম স্বভাবদোষেই সুকুমার কলার পরিপন্থী। বুঝি বা সেই কারণে বৌদ্ধ যুগের আগে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অভাব এত শোকাবহ ; এবং তার পরে যদিচ বৌদ্ধ দেব-দেবীদের কোল দিতে হিন্দু সমাজেও অগণ্য রূপকার জন্মাল, তবু তাদের সৃষ্টি কেমন যেন ক্ষিতিনিরপেক্ষ রয়ে গেল, তার আভিজাতিক অলঙ্কারবাহুল্যে অন্ত্যজদের সহজ বস্তুনিষ্ঠা কোনও কালে আমল পেলে না। ফলত সংস্কৃত শিল্প টিঁকল না ; শেষ পর্যন্ত আর্যাবর্তের মান বাঁচালে অনার্যেরা ; এবং যে-উৎস থেকে তাদের প্রাণধারা উৎপন্ন, তা এমনই অফুরন্ত যে সর্বনাশে চাপা প'ড়েও তার প্রেরণা শুকায়নি, শোষিত ভারতকে পাঁচ হাজার বছর ধ'রে একা সেই অমৃত যোগাচ্ছে।

অবশ্য মহেঞ্জো-দড়োর তারিখ-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে ; এবং যাঁরা তাকে ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের অগ্রবর্তী বলেন, তাঁরা যেমন সকল সমস্যার সমাধানে অক্ষম, তেমনই যাঁদের মতে তার বয়স আরও পাঁচ-সাত শতাব্দী কম, তাঁরাও সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। প্রথম দল স্বপক্ষসমর্থনে এই যুক্তি দেখান যে উরের শিরস্ত্রাণ যে-স্তরে পাওয়া গিয়েছে, তা সর্বসম্মতিক্রমে খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর আগেকার ; এবং সেই স্তরের প্রসাধনসামগ্রী যখন হারাপ্পার ঊর্ধ্বতর স্তরে বর্তমান, তখন উর-রাজবংশের সমাধিমন্দির বোধহয় হারাপ্পার চেয়ে অর্বাচীন। উপরন্তু মহেঞ্জো-দড়ো হারাপ্পার চেয়ে বেশ খানিকটা বড় ; এবং আত্রি মহেঞ্জো-দড়োর বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সুতরাং সুমের সিন্ধু সভ্যতার অনুজ ; এবং সিন্ধু সভ্যতা সুসার সমসাময়িক, যার আয়ুষ্কাল খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৪০০০ বৎসরের মধ্যবর্তী। কিন্তু এ-

সিদ্ধান্ত মানলে, আর ভাবা চলে না যে আর্যেরাই সিন্ধু সভ্যতাকে নিপাতে পাঠিয়েছিল ; এবং মহেঞ্জো-দড়োর পতন যদি বা আধিদৈবিক কারণে ঘ'টে থাকে, তবু সিন্ধু ও পঞ্জাবের অন্যান্য নগরগুলি নিশ্চয়ই আপনা-আপনি ধ্বংসে পড়েনি, কোনও স্থায়ী শত্রুর আক্রমণেই একে একে নষ্ট হয়েছিল। ফলত দ্বিতীয় দল কতকগুলো সীল-মোহর আর মৃৎপাত্রকে সাক্ষী ডাকেন ; এবং তাদের জবানবন্দি শুনে তাঁরা সাব্যস্ত করেন যে বাড়তে সিন্ধু সভ্যতার অনেকখানি সময় লেগেছিল বটে, কিন্তু তার পরিণত রূপ খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ সনের ও-দিকে দ্রষ্টব্য নয়, বরং আরও পাঁচ শ বৎসরের ভিতরেই তাকে জরা ধরেছিল। জনৈক পণ্ডিত সম্প্রতি আবার ভজাতে চেয়েছেন যে মহেঞ্জো-দড়োর একখানি মৃৎফলক ঋগ্বেদের একটি সূক্তের সচিত্র সংস্করণ ; এবং তাহলে সেই মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়তো অনিবার্য, যার অনুসারে আর্যেরা ভারতসন্তান তথা বোগজ্-কুয়ের অনুশাসন হিন্দু দিগ্বিজয়ের অন্যতম সাক্ষ্য। তবে আমার শৈশবেও উক্ত অনুমান সর্বসম্মতির ধার ধারত না ; এবং তার প্রতিবাদীরা রটাতেন যে কয়েক হাজার বছরের মধ্যে আর্যেরা যেহেতু ভারতবর্ষে এসেছিল অন্তত দুই প্রস্থে, তাই দ্বিতীয় বারের অভিযান যাদের বিরুদ্ধে, সেই দ্রাবিড়েরাও আদিতে আর্য। পক্ষান্তরে কল্পনাবিলাসের একমাত্র প্রতিকার খননকার্য ; এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে বিদেশীরা যত না উদাসীন, সরকারের কার্পণ্যে স্থানীয় গবেষকেরা ততোধিক নিশ্চেষ্ট।

অন্ততঃপক্ষে এতে সন্দেহ নেই যে বর্তমান প্রসঙ্গে আমার মতো মূর্খের বাক্যব্যয় হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা ; এবং বিশেষজ্ঞ কার্ল্‌টন্ সাহেবও সিন্ধু সভ্যতার বিবরণ যথাসংক্ষেপে সেরেছেন। আসলে মহেঞ্জো-দড়ো-সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল যৎকিঞ্চিৎ ; এবং উলি-র অধীনে তিনি সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্বেই হাত পাকিয়েছেন। উপরন্তু ভারতীয় ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান নাতিবিস্তৃত ; এবং অধীত বিদ্যার প্রয়োজনে ওই বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য ব'লেই, তিনি সিন্ধু সভ্যতার নাম নিয়েছেন, নচেৎ হয়তো ও-দিকে এগোতেন না। অবশ্য তিনি সে-সম্বন্ধে যতটুকু লিখেছেন, তা প্রায় নির্ভুল। কিন্তু যেখানে তিনি পূর্বপ্রকাশিত বৃত্তান্তের চুম্বক-সংগ্রহ

ছেড়ে স্বকীয় মন্তব্য দিতে গিয়েছেন, সেখানে তাঁর যুক্তিজালে তো ছিদ্র আছেই, এমনকি ভারতীয় পুরাণ-উপকথার উপহাস্য বিকৃতিও তাঁর পুস্তকে সুলভ। পক্ষান্তরে সুমের-সম্পর্কে তিনি সর্বত্রই বিশ্বাসযোগ্য, যদিচ তিনি নিজেও মানেন যে মারি-অনুশাসনের আবিষ্কার তাঁর কালগণনাকে বাতিল করেছে। তবে এটা নিশ্চয়ই সামান্য ত্রুটি; এবং লেখক আপনাকে সুমেরীয় চিৎপ্রকর্ষের ব্যাখ্যাপনে আবদ্ধ রাখলে, এই বিদূষণের প্রয়োজনমাত্র থাকত না। দুঃখের বিষয় কার্ল্‌টন্‌ সাহেবের আগ্রহ মুখ্যত অনুশাসনের প্রতি; এবং দু-একটা ব্যতিক্রম বাদে অনুশাসনলব্ধ ইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ শান্তি-সংস্কৃতির অগ্রগণ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানিও উক্ত নিয়মের প্রমাণ; এবং প্রত্ন মৃৎপাত্রের সারগর্ভ বর্ণনা সত্ত্বেও এর অধিকাংশই বিভিন্ন রাজবংশ ও তদীয় জয়-পরাজয়ের তালিকা। ফলত বইটি সম্ভবত পরীক্ষার্থীদের উপকারে লাগবে, সাধারণ পাঠকের মন যোগাতে পারবে না। তাহলেও এতে রসের অভাব নেই। কারণ লেখক শুধু বিবেকসম্পন্ন ঐতিহাসিক নন, তিনি স্বাধিকারপ্রমত্ত সমাজবিজ্ঞানীও বটে; এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পোষণে তিনি প্রাচ্যের বর্তমান ধরণ-ধারণ-সম্বন্ধে যত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেগুলোর প্রত্যেকটাই যেমন অবান্তর, তেমনই হাস্যকর। বইটির প্রধান ঐশ্বর্য কখানি আলোকচিত্র; এবং সেগুলি এত সুনির্বাচিত ও সুমুদ্রিত যে সে-জন্যে পুস্তকের একাধিক মুদ্রাকরপ্রমাদ সুদ্ধ মার্জনীয়।

[১৯৩৯]

# পিতা-পুত্র

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাস্থাপন আজ প্রায় অসম্ভব : জটিল গণিতের সাহায্যে বরং বা প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবীই সৌর জগতের কেন্দ্র ; কিন্তু মানুষকে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিতে আর কোনও রাষ্ট্রপতি ইচ্ছুক নন। অথচ মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই মতবাদ ছিল মানবসভ্যতার সামান্য লক্ষণ। অবশ্য তখনও কর্তৃপক্ষ নিরীহনিগ্রহে কোথাও কার্পণ্য দেখাতেন না ; এবং আপন ভাগ্য-নির্বাচন দূরের কথা, অব্যাহত প্রতিযোগের পেষণে দৈবদত্ত ক্ষমতার বিকাশও ব্যক্তির কাছে দুঃসাধ্য ঠেকত। তবে সে-কালের অত্যাচারীরা সুদ্ধ লোকলজ্জার ভয় পেতেন ; একটা যেমন-তেমন বিপদের অছিলা ব্যতীত কেউ কখনও সাধারণের স্বাধীনতা-সঙ্কোচে এগোতেন না ; এবং কার্যত অনেকেই দুর্বলকে প্রবলের ক্রীতদাস ব'লে ভাবতেন বটে, তবু অন্তত বক্তৃতার সময়ে সকলে একবাক্যে মানতেন যে আমরা প্রত্যেকে ইচ্ছাশক্তির আধার, তথা সদাচারে অধিকারী।

সে-আদর্শে বিশ্বাস রাখলে, অবচেতন মনের পরিকল্পনা স্বভাবতই অসহ্য লাগে ; এবং সেই জন্যে যখন ১৯১২ সালে ফ্রয়েড-এর "টোটেম্ অ্যাণ্ড্ ট্যাবু"-নামক বইখানি বেরোয়, তখন তার প্রতিবাদে পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই সমস্বরে মুখ ছুটিয়েছিলেন। কারণ তাতে পরীক্ষালব্ধ মনোবিকলন-শাস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ক'রে ফ্রয়েড্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলেন যে মানুষের হৃদয়ব্যাপার কোন্ ছার, তার অধ্যাত্ম জীবনও অকথ্য প্রবৃত্তির লীলাভূমি ; এবং ধর্ম আধির সঙ্গে তুলনীয় হওয়ায় উভয়ত্র আমাদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধি-বিবেচনার চোখে ধুলো দিয়ে

আপনার নিষিদ্ধ চরিতার্থতার সুবিধা খোঁজে। বলাই বাহুল্য যে এ-স্বীকারোক্তি মানুষী অহমিকায় এতখানি বাধে যে এ-প্রসঙ্গে নাস্তিকেরা সুদ্ধ ফ্রয়েড্-এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন; এবং জড়বিজ্ঞানের কল্যাণে ন্যায়নিষ্ঠ বিধাতার প্রতি তাঁদের ভক্তি যেহেতু তৎপূর্বেই উবে গিয়েছিল, তাই তাঁরাই সর্বাগ্রে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তাঁদের ব্যবহার যেমন নীতিপরায়ণ, তেমনই যুক্তিযুক্ত।

এতাদৃশ সর্বসম্মতির আনুকূল্য সত্ত্বেও প্রাজ্ঞ মানুষের আত্মপ্রসাদ খুব বেশী দিন টি‍ঁকল না: প্রথম মহাযুদ্ধের মারণ সে কোনও ক্রমে কাটিয়ে উঠল বটে, কিন্তু পরবর্তী শান্তি তাকে ধনে-প্রাণে মারলে; এবং তার পরে বিশ্লেষণী মনস্তত্ত্বের অনেক ছিদ্রই যদিচ আমাদের চোখে পড়ল, তবু কারও মনে আর সন্দেহ রইল না যে মনুষ্যসমাজ কেবল জাড্যগুণে জঙ্গম। ফলত জীবের বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে ফ্রয়েড্ আবার প্রচার করলেন যে মৃত্যুই আদিম নিশ্চেষ্টার অন্তিম নিদর্শন; অপেক্ষাবাদী দার্শনিকেরা আমাদের ক্রিয়া-কর্মে "ন্যূন চেষ্টা"-বিধির সন্ধান পেলেন; এবং যেন তাঁদের অনুমানের প্রমাণ-স্বরূপ দেশে দেশে হরেক রকমের ডিক্টেটর পদানত প্রজাবর্গের উপরে অবাধ কর্তৃত্ব খাটিয়ে দেখালেন যে মানুষে আর মেষে সত্যই কোনও তফাৎ নেই। অন্ততঃপক্ষে এ-সিদ্ধান্ত আজ তর্কাতীত যে বৃদ্ধেরা শিশুদের মতো নির্বোধ ও আবেগসর্বস্ব; এবং যে-প্রেরণায় তারা আজীবন চলে, তার উৎপত্তি পিতা-পুত্রের প্রাথমিক সম্পর্কে।

উপরন্তু আমাদের উপর পিতার আবশ্যিক প্রভাব তাঁর দেহান্তেও ফুরায় না; অন্তকালে আমাদের শাসন-ভার তিনি যাঁর হাতে দিয়ে যান, সেই প্রতিনিধিকেই আমরা কখনও ডাকি ভগবান-নামে, কখনও বা ভাবি নেতা ব'লে; এবং দুর্ভাগ্যবশত উক্ত হস্তান্তরপ্রথা স্বনির্বাচিত নর্ডিক্-দের মধ্যেই প্রচলিত নয়, তথাকথিত "বৃত" জাতিও অনুরূপ চিরাচারের দাস। অর্থাৎ অপরাপর বিষয়ের মতো এখানেও য়িহুদীরাই জার্মান্-দের গুরু; এবং এত শতাব্দীর বিপরীত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা যেহেতু এখনও প্রায় সকল ব্যসনে জ্যু-দের পদানুসরণে বাধ্য, তাই তাদের সীমাইট্-বিদ্বেষ

সম্প্রতি হয়তো উন্মাদ-রোগে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই দুই জাতি পিতৃগ্রন্থিতে আবদ্ধ কিনা, সে-বিশেষ আলোচনার স্থান অন্যত্র; বর্তমানে এইটুকুই উল্লেখযোগ্য যে দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে মানুষমাত্রেই পিতৃ-মুখাপেক্ষী; এবং শুধু তাই নয়, ব্যক্তির বেলায় এ-মনোভাব যেমন জন্মায় মাতার অনুগ্রহে পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে দেখে, তেমনই জাতি-নামক ব্যক্তিসমষ্টির ক্ষেত্রে এর অস্তিত্ব অধুনালুপ্ত পিতৃতন্ত্রের স্মারক।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন গোষ্ঠীর সকল নারীকে একা পিতাই ভোগ-দখল করতেন, তখন অপরাধীর পুরুষত্বহানি ভিন্ন অন্তর্বিবাহ-নিবারণের আর কোনও উপায় ছিল না। অথচ বহির্বিবাহের অসুবিধা অনেক: পত্নীর লোভে প্রাণদান কারও মতেই প্রশস্ত নয়; এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড চির দিন বিদ্রোহপ্রসূ। সুতরাং পৈতৃক প্রতাপ শেষ পর্যন্ত টিঁকল না; পুত্রেরা দল পাকিয়ে পিতাকে মেরে ফেললে; এবং সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যিক স্বৈর শাসনের স্থানে স্বাভাবিক স্বায়ত্তশাসনের আবির্ভাব হল। এই স্বায়ত্তশাসন সমাজবিজ্ঞানে মাতৃতন্ত্র-নামে পরিচিত; এবং এ-ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক লক্ষণ পশুপূজা। সে-পশু গোষ্ঠীপতি, অর্থাৎ পিতার প্রতীক; এবং তাই প্রত্যহ সে যেমন অর্চনীয়, তেমনই বৎসরে এক দিন তাকে বলি দিয়ে তার রক্ত-মাংস না খেলে, পিতার প্রতিপত্তি ও পরাক্রম পুত্রদের অধিকারে আসে না।

কারণ ইতিমধ্যে পিতৃহত্যার স্মৃতি তাদের মনে আদিম পাতকের আকার ধরে; এবং পাপবোধমাত্রেই নিউরোসিস্-এর অন্তর্গত—সে-আধির আবেশ থেকে তখনই মুক্তি মেলে, যখন পাপপরিস্থিতির পুনরভিনয়ে অবদমিত অভিজ্ঞতা অভীষ্টসিদ্ধির উন্মাদনায় অন্তত কিছু ক্ষণের জন্যে অপরাধ ভুলতে পারে। কিন্তু পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ এমনই মৌল, এতই সর্বব্যাপী ও জটিল যে তার গ্রন্থি বছরে এক বার খুললেও, শান্তি পাওয়া যায় না। অতএব পশুপূজা ক্রমশ একেশ্বরবাদে বদ্‌লায়; এবং মৃত পিতা অমর মূর্তিতে ফিরে এসে সেই পশু-রূপী কলুষকে হয় মেরে ফেলেন, নয় তাকে বাহন বানিয়ে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়ান। তবে এ-বারে তাঁর আধিপত্য আর অত্যাচারের উপরে দাঁড়ায়

না ; তাদের যৌন জীবনের স্বাধীনতা বজায় রেখে, সন্তানেরা তাঁকে স্বেচ্ছায় ডেকে, তাঁর হাতে তুলে দেয় ন্যায়বিচারের ভার ; এবং এ-বন্দোবস্ত যেকালে তাদের নিজেদের মঙ্গলার্থে, তখন এর স্থায়িত্ব যেমন ভূতপূর্ব পিতৃতন্ত্রের চেয়ে বেশী, তেমনই তারা ঠ'কে এর আদর করতে শেখে ব'লে, এ-অবস্থা বুদ্ধির দিক থেকেও সমধিক অগ্রসর।

ফ্রয়েড্-এর মতে উল্লিখিত ইতিহাস সকল ধর্ম-সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু অন্যান্য মহামনীষীদের মতো তিনিও যেহেতু আপন জ্ঞানের সীমা জানেন, তাই এ-পুস্তকে তিনি তাঁর প্রভূত পাণ্ডিত্য দেখাবার প্রয়াস পাননি, যে-ধর্ম তাঁর আজন্ম পরিচিত, তাতেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। সে-প্রসঙ্গেও তিনি যতটা মনস্তাত্ত্বিক, ততটা ঐতিহাসিক নন ; এবং এখানে তিনি যদিও তাঁর জাতিগত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সদা-সর্বদা প্রস্তুত, তবু তাঁর প্রত্নতত্ত্বচর্চা সর্বত্রই গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম ও নিউরোসিস্-এর প্রাক্প্রস্তাবিত উপমিতির পুনর্নির্মাণ। অবশ্য সে-উপমিতি যাতে ঐতিহাসিক গবেষণার বিশ্বাসযোগ্য ফলাফল মেনে চলে, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবান। তবে যে-গবেষণা তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে, তা কেবল জেলিন্-এর অনুমোদিত।

অর্থাৎ অন্যান্য গবেষকদের বৈমত্য সত্ত্বেও ফ্রয়েড্ জেলিন্-এর সঙ্গে মানেন যে মোজেস্ মিসরসম্রাট্ ইখ্‌নাটন্-এর একজন অমাত্য ছিলেন ; এবং প্রভুর মৃত্যুর পরে রাজকীয় একেশ্বরবাদ যখন ঈজিপ্ট্ থেকে বিদূরিত হল, তখন মোজেস্ পলাতক হিব্রু-দের সেই ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তাদের পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু য়িহুদীদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সে-সময়ে খুব উঁচুতে ওঠেনি। তাই তারা বেশী দিন নিরাকারের উপাসনা সইতে পারলে না, সনাতন রীতিতে পিতৃপ্রতিম মোজেস্-কে মেরে আবার টোটেম্-পূজায় ফিরে গেল। তবু বিবেকের দংশন থামল না ; বরং প্রত্যাগত অধিষ্ঠাতা জাভে-র বজ্রনির্ঘোষ তাদের অহোরাত্র কাঁপাতে লাগল ; এবং সেই জন্যে অল্প দিন পরে মোজেস্-নামধারী আর এক নেতা যেই তাদের ব্রহ্মবাদের মন্ত্র পুনরায় শোনালেন, তারা তৎক্ষণাৎ তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে ভাবলে যে তিনি বুঝি সেই পুরাতন মোজেস্, যাঁর থেকে

এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের, তথা নিহত প্রথম পিতার, বিশেষ কোনও তফাৎ নেই।

অন্ততঃপক্ষে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই সমীকরণই সুন্নতের একমাত্র ব্যাখ্যা ; এবং সে-সংস্কারের সূত্রপাত যেখানে বা যবে ঘ'টে থাক না কেন, তার উদ্দেশ্য যখন সর্বত্রই শুদ্ধি, তখন তাকে পিতৃহত্যার প্রাক্তন পাতকের প্রতীকী প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দেখতে আমরা অতিঅবশ্য বাধ্য। সে যাই হোক, দ্বিতীয় মোজেস্-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই য়িহুদীদের বঞ্চিত উদ্গতির আরম্ভ আর যথার্থ একেশ্বরবাদের উৎপত্তি ; এবং পিতা-পুত্রের এই পুনর্মিলন যেহেতু অসহ্য সন্তাপের ফল, তাই হিব্রু-রা ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁকে ছাড়তে পারেনি, উল্টে প্রবক্তাপরম্পরার মধ্যে তাঁরই প্রতিমূর্তি দেখেছিল। তবে শুধু পিতৃপ্রতিম ব'লেই, জ্যুইশ্ প্রফেট্-রা মহাপুরুষ-পদবাচ্য নন, বুদ্ধি-বিবেচনায় ও আদর্শনিষ্ঠায়, কর্মক্ষমতায় ও কবিত্বশক্তিতে, পুরাতত্ত্বে ও দূরদৃষ্টিতে তাঁদের সমকক্ষ মেলা ভার ; এবং অন্যত্র জন্মালেও, তাঁরা নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধি পেতেন।

পক্ষান্তরে প্রসিদ্ধি আপনা-আপনি লোকপ্রসিদ্ধিতে বদ্লায় না, মহত্ত্ব কেবল তখন মাহাত্ম্যের পর্যায়ে ওঠে, যখন কোনও একজন মানুষ জ্ঞানত নিজেকে সমগ্র জাতিগত অচৈতন্যের আধার হিসাবে দেখে ; এবং মৃত মোজেস্-এর শূন্য সিংহাসনে নিরন্তর নিজেদের বসিয়ে য়িহুদী প্রবক্তারা সে-জাতিকে তো পাপভয় থেকে মুক্ত করেছিলেন বটেই, এমনকি পুনরুক্তির ফলে তজ্জনিত আশ্বাস যদি জ্যু-দের মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে না পড়ত, তবে তারা আজ মাত্র ভাবয়িত্রী প্রতিভা নয়, কারয়িত্রী প্রতিভার জন্যেও ঈর্ষ্যাপর বিজাতীয়দের অভিশাপ কুড়াত কিনা সন্দেহ। অতএব প্রবক্তারা স্বজাতির ক্ষতিও কিছু কম করেননি ; এবং তাঁদের কাছে পুত্রবৎ আচরণ পেয়েই য়িহুদীরা ধরাকে সরা ব'লে ভাবতে শেখে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়োজন ভোলে, বর্তমানের দাবি-দাওয়ায় কান না পেতে সাধারণ আধিগ্রস্ত মানুষের মতো অতীতের পুনরভিনয়ে কাল কাটায়।

সুতরাং যখন যীশু এসে আত্মবলিদানে আদিম পাপের প্রায়শ্চিত্ত সারলেন,

তখন পিতা-পুত্রের চিরন্তন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তারা যোগ দিতে পারলে না, পিতা-পুত্রের নবজাত ঐক্যের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে পিতার দিকেই ঊর্ধ্ব নেত্রে তাকিয়ে রইল। অর্থাৎ জ্যু-রা কখনও কবুল করতে চায়নি যে তারাই এক দিন মোজেস্-কে প্রাণে মেরেছিল; এবং এই অবদমনের ফলে তারা আজও পৌত্তলিকতার উল্লেখে শিউরে ওঠে, ভগবানের নামকরণে বিরত থাকে, মুখে না মানলেও, মনে মনে বোঝে যে আধ্যাত্মিক প্রগতির নিয়ামক আর তারা নয়, সে-সম্মান এখন খৃষ্টানদের প্রাপ্য। তারা অনুতাপের জ্বালা জুড়াতে গিয়ে অজ্ঞানত পিতৃপক্ষে ভিড়েছে; এবং সেই জন্যে পুত্রপূজা তো তাদের অসহ্য লাগেই, এমনকি স্বীকৃতিই যেহেতু মোক্ষলাভের অনন্য উপায়, তাই তাদের পাপবোধ কোনও কালে কাটে না, পীড়নমাত্র তাদের কাছে প্রাপ্য ঠেকে।

আকারে ক্ষুদ্র এবং পুনরুক্তিময় হলেও, "মোজেস্ অ্যাণ্ড্ মনোথীয়িজ্‌ম্" * ফ্রয়েড্-এর সর্বশেষ রচনা। কিন্তু কেবল সেই জন্যে এ-বইখানি মূল্যবান নয়: এর অভিপ্রায় এতই ব্যাপক যে উল্লিখিত সংক্ষেপে এর মর্মোদ্ঘাটন অসম্ভব; বরং এ-ক্ষেত্রে সারসংগ্রহের চেষ্টাও অবিচার। কারণ এ-পুস্তকও যদিচ আগা-গোড়াই বিকলনী মনোবিজ্ঞানের দলিল, তবু এর সিদ্ধান্ত শুধু সামান্য মনের পরিচায়ক নয়, ফ্রয়েড্-এর স্বকীয় চিত্তবৃত্তি ও বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গি এতে যতখানি ধরা দিয়েছে, অন্যত্র তেমন ফুটে ওঠেনি; এবং এই নিজস্ব যেহেতু প্রমাণনিরপেক্ষ, তাই এখানে তর্ক-বিতর্কের উস্মাবোধ তো নেই বটেই, এমনকি এর একদেশদর্শিতাও ভিতরে ভিতরে অনেকান্ত। পক্ষান্তরে গ্রন্থখানির পটভূমি য়ুরোপীয় সভ্যতার চিতাগ্নিতে আলোকিত; এবং সে-আলোর দীপ্তি এমনই অন্তরস্পর্শী যে তার সামনে এসে ফ্রয়েড্-এর মতো নৈর্ব্যক্তিক পুরুষও অগত্যা আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলেছেন।

সে-আত্মপ্রকাশ কোথাও অসংযত নয়, তার মধ্যে অভিযোগের নাম-গন্ধ নেই, তাতে আছে কেবল বিশ্লেষণ, অংশত আপনাকে, এবং সাধারণত স্বজাতিকে, যার প্রতিভূ ব'লেই, ফ্রয়েড্-এর স্থৈর্য ও ধৈর্য, সীমাজ্ঞান ও

* Moses and Monotheism—By Sigmund Freud (Hogarth Press).

শালীনতা হয়তো আমরণ অবিকৃত ছিল। তাহলেও বইখানির মূল বক্তব্য আনুমানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট। তবে সে-কথা ফ্রয়েড্ নিজেও জানতেন; এবং তাই সে-বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার হয়তো অশোভন। তৎসত্ত্বেও "মোজেস্ অ্যাণ্ড্ মনোথীয়িজ্‌ম্" পড়তে পড়তে অনেকেরই স্মরণে আসবে যে য়ুং-এর বিবেচনায় আমাদের পারমার্থিক উপলব্ধি আধিজনিত নয়, অন্ততঃপক্ষে তার মধ্যে যৌনাতীত উপাদানও এত প্রকট যে তাকে কামপ্রবৃত্তির এলাকায় না আনাই সঙ্গত; এবং শিষ্যের এই সিদ্ধান্তে গুরুর আপত্তি কোথায় ও কেন, তা এই পুস্তকে লেখা থাকলে, সাধারণ পাঠক বিশেষ ভাবে উপকৃত হত।

ফ্রয়েড্ সে-তর্ক যেন ইচ্ছাসহকারেই এড়িয়ে গেছেন; এবং বিদ্রোহী শিষ্যের প্রতি তাঁর মন এমনই বিরূপ যে গোষ্ঠীগত অচৈতন্যের আলোচনায় নেমেও তিনি য়ুং-এর নাম নেননি। অবশ্য এই নিরাধার অচৈতন্য তাঁর মতে কোনও অতিমর্ত্য পদার্থ নয়, একে তিনি বহু ব্যক্তিগত অচৈতন্যের যোগফল ব'লে ভাবতেন; এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ব্যষ্টির অসুখ সারলেই, সমষ্টির স্বাস্থ্য ফিরবে। কিন্তু সাম্প্রতিক জগতে সে-ধারণাকে তো টিঁকিয়ে রাখা শক্তই, এমনকি আজও যে-সমস্ত জাতি প্রাক্-পৌরাণিক যুগে আবদ্ধ রয়েছে, যন্ত্রসভ্যতার কবলে পড়েনি, তাদের বেলাও ব্যক্তির মন আর গণের মন ভিন্নধর্মী, হয়তো বা বিপরীতধর্মী। দুঃখের বিষয় ফ্রয়েড্ নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় বীতশ্রদ্ধ; এবং বোধহয় সেই জন্যে তিনি এ-প্রশ্নেরও জবাব দেননি যে কেবল মনোবিকলনের উত্তরসাক্ষ্যে প্রত্যক্ষদর্শী নৃতত্ত্ববিদেরা কেন মানবেন যে পিতৃতন্ত্র আর পশুপূজা পরস্পর-বিরোধী, উভয়ের তাৎকাল্য কোনও সমাজেই সম্ভব নয়।

[ ১৯৪১ ]

মনোবিকলনে ধরা পড়ে যে মানুষমাত্রেই পরিবর্তনবিমুখ ; অথচ প্রতিনিয়ত না বদ্‌লে সে বাঁচতে পারে না। যে-জগতে তার বাস, সেখানে স্থিতি অনুকল্প ; এবং যোগবিভূতির কিংবদন্তী বিশ্বাস্য হোক বা না হোক, শুধুই আধিদৈবিক উৎপাত তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় না, এমনকি নিজের দেহবিকারেও সে সদা-সর্বদা অস্থির। ফলত বিবর্তনে মনের আদিম অদ্বৈত ঘুচিয়ে সে আজ অচৈতন্যের উপরে চাপিয়েছে আত্মবিপর্যয়ের তত্ত্বাবধান, আর চৈতন্যকে নিযুক্ত করেছে অবস্থান্তরের নিয়ম-নিরূপণে ; এবং তার বিশ্বাস যে বুদ্ধির দিগ্বিজয়ে যদি অন্তরায় না আসে, তবে সে অচিরে বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মধ্যে এ-রকম এক কার্য-কারণশৃঙ্খলার সন্ধান পাবে যে চরাচরের ওলট-পালট আর তাকে প্রাণে মারবে না, ভবিষ্যতের সংসারযাত্রা পর্যন্ত তার মন যুগিয়ে চলবে। খানিকটা কপালের জোরে আর বাকীটা অবস্থা-গতিকে তার এ-আশা একেবারে বিফলে যায়নি ; বহিঃপ্রকৃতি কোনও দিন তার কাল্পনিক হেতুবাদের তোয়াক্কা রাখে না বটে, তবু বারংবার ঠেকে ঠেকে সে এখন প্রকৃতির ধরণ-ধারণ অল্প-বিস্তর বুঝতে শিখেছে ; এবং এই অনিশ্চয় অভিজ্ঞতার কল্যাণে তার সভ্যতা আপাতত সমৃদ্ধ। কিন্তু এত ভুগেও তার স্বভাব শোধরায়নি ; তার অন্তরস্থ পুরাণ পুরুষ বিপ্লবে ঠিক আগের মতোই সন্ত্রস্ত ; এবং থামা অসম্ভব ব'লে, এই আতঙ্ক সত্ত্বেও যেমন অগত্যা তার পায়ের বিরাম নেই, তেমনই সাধ থাকলেও, অবচেতন প্রতিবন্ধকের প্রতিপক্ষে এগোনো অধিকাংশ মানুষের সাধ্যে কুলায় না।

সেই জন্যে আধুনিক সমাজে মনোব্যাধির এত প্রাদুর্ভাব ; এবং

বিশেষজ্ঞদের মতে হিস্টিরিয়া শুধু অবলাদের প্রবলাস্ত্র নয়, অনেক সময়ে পুরুষের কাছেও রোগের ভান স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে অধিক প্রীতিকর। উপরন্তু এই অবধি মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিবাদ না থাক, ফ্রয়েড্ নিজে এখানে থামতে অনিচ্ছুক ; এবং তিনি যেহেতু তত্ত্বত জড়বাদী, তাই তাঁর বিশ্বাস যে জড়সম্ভূত জীবের মধ্যে নিশ্চেষ্টাসংরক্ষণের পৈতৃক প্রবৃত্তি স্বধর্মানুযায়ী আত্মরক্ষার অগ্রগণ্য। অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় আধি-ব্যাধির মানস গ্রন্থি কোন্ ছার, ম'রেও মানুষ বর্তমান থেকে পালিয়ে অতীতের কোলে বিশ্রাম চায় ; এবং মুমূর্ষাকে তিনি কেবল নৈরাশ্যের চরম অভিব্যক্তি হিসাবে দেখেন না : রিরংসার মতো জিজীবিষু প্রবৃত্তিও মৃত্যু-কামনার সংক্রাম কাটাতে পারে না ব'লেই, প্রণয়ীরা ধর্ষণ আর মর্ষণ—এই দ্বিবিধ রতির দোটানায় রাত্রি-দিন উদ্ব্যস্ত। অবশ্য মনস্তত্ত্ব এখনও বিজ্ঞান-পদবাচ্য নয় ; এবং প্রেম ও ঘৃণার অন্যোন্যবিরোধী সমন্বয় সম্প্রতি সে-শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও, উক্ত ধ্রুবদ্বয় এ-যাবৎ একাধারে শুধু কাব্য-নাটকের আশ্রয় যুগিয়েছে। কিন্তু কবিকল্পনা-সম্বন্ধে বুদ্ধিমানের অবজ্ঞা অনুচিত ; এবং কল্পনার নির্দেশ যদি ন্যায়ের বিধান নাই মানে, তবু বাস্তব জগতের প্রতি কবির পক্ষপাত আসলে হয়তো বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে বেশী। অন্ততঃপক্ষে ভূয়োদর্শী নৃতত্ত্ববিদ্‌ও এ-প্রসঙ্গে ভাবপ্রবর্তিম কবির সঙ্গে একমত যে যুদ্ধ আর পুত্রেষ্টির আনুষ্ঠানিক সাদৃশ্য যেকালে সুস্পষ্ট, তখন সে-দুই প্রকরণের প্রেরণা খুব সম্ভব অভিন্ন ; এবং ফ্রয়েড্-এর মনে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ নেই যে অবচেতনের নৈরাজ্যে একাধিক বিপ্রলাপ একত্রে বিদ্যমান।

তাহলেও আত্মবিবাদের অস্তিত্ব-অঙ্গীকার শক্ত ; এবং যাঁরা স্থান, কাল ও পাত্রের অতীত ভূমানন্দে অনধিকারী, তাঁদের অভিজ্ঞতায় যত বৈষম্যই থাক না কেন, তাতে তর্কশাস্ত্রের প্রথম নিষেধ বিনা ব্যতিক্রমে মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অবশ্যস্মর্তব্য যে ব্রহ্মবিদ্যাই নেতিবাদের একমাত্র পরিণতি ; এবং নিয়মানুবর্তিতা যেহেতু ব্রহ্মোপলব্ধির মতো শুধু অগতির গতি নয়, অনেক সময়ে অভীষ্টসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়, তাই অবৈধতার অভাবে বিধানপ্রমাণের চেষ্টা অনুপকারী। সে-জন্যে সদর্থক সাক্ষ্যের প্রয়োজন ; এবং নিয়ম আর নিষেধের পারস্পরিক মুখাপেক্ষা তো সন্দেহ-

জনক বটেই, এমনকি নিয়ম ও দৃষ্টান্তের সম্পর্কও শুঁড়ী আর মাতালের সুপরিচিত সহযোগের সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং অব্যবস্থার অবর্তমানে ব্যবস্থার ব্যাপ্তি দেখা হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা; এবং নিয়ম-সম্বন্ধে নিরুক্তি কেবল তখন সম্ভব, যখন দৃষ্টান্ত বা বৈপরীত্য নয়, কোনও সামান্য বিধান থেকে নাতিপ্রশস্ত বিধিতে অবরোহণ সহজ ও সুকর। দুঃখের বিষয় ন্যায়শাস্ত্রের মূল সূত্রত্রয় এ-রকম কোনও সাধারণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়; এবং সেই কারণে নির্দ্বন্দ্বকে অভিজ্ঞতার অপরিহার্য লক্ষণ ব'লে বুঝেও আমরা মরমীদের বৃথা বাক্যে অর্থ খুঁজি। সুতরাং স্বতোবিরোধ না হোক, অন্তত বিরোধের সঙ্গে মানুষমাত্রেই সুপরিচিত; এবং আমরণ জীবনের ধাক্কা খেয়েও, সে যদিচ সংঘর্ষের মধ্যে অস্তি-নাস্তির তাৎকাল্য মানতে বাধ্য নয়, তথাচ এক বার ভাবতে বসলে, সে আর অস্বীকার করে না যে সদসদের বিকল্প ব্যতীত প্রাণযাত্রা অচল।

সময়ে দ্বন্দ্বে তার ভয় ভাঙে; এবং সে ইতিহাস প'ড়ে বোঝে যে স্বতোবিরোধ সুদ্ধ অস্থায়ী। অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর অনভিজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধির দরুন আজ যে-সমস্যাকে অগভীর দৃষ্টিতে বিবাদমূলক ঠেকে, কাল জ্ঞান বাড়লে, তার ন্যায্য সমাধানে আর তিলার্ধ সংশয় থাকে না। তখন হঠাৎ তার নিরাশা দুরাশায় বদ্‌লায়; এবং বর্তমানের ভাবনা ভুলে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে তাকিয়ে ভাবে যে সে টিঁকুক বা না টিঁকুক, সভ্যতার প্রগতি কোনও দিন থামবে না—আধুনিক প্রতর্ক আগামী প্রমিতির প্রসাদ পাবে। তবে তার পর কী ঘটবে, তা যেহেতু নিছক কল্পনাবিলাসের গোচরে আসে না, তাই সে অগত্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দ্বারে ধরনা দেয়; এবং সে-দৈবজ্ঞের কথায় শুভবাদের উপজীব্য জোটে না, জানা যায় যে এণ্ট্রাপি-র চক্রবৃদ্ধি জগৎসংসারকে প্রলয়ের দিকে পাঠাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজে বিশ্ববিকীরণের ধ্বংসতীব্র আকাশবাণী; এবং তারই তালে তালে চলে পরমাণুর লম্ফ-ঝম্প, যাতে য়ুরেনীয়ম্ সীসায় না নেমে নিঃশ্বাস নেয় না। অবশেষে উদ্বর্তনের সমর্থনে ডাক পড়ে জীবলোকের। কিন্তু সেখানেও কোনও আশ্বাস মেলে না: বরঞ্চ প্রাণিবিদ্যা শেখায় যে অভিব্যক্তির উৎস এখনও শূন্যে মেশেনি বটে, তবু জাতিবিশেষের বেলায় ক্ষয়ই এ-যাবৎ

জিতেছে। অনন্তর প্রগতির সঙ্গে প্রকৃতির অহি-নকুল-সম্বন্ধ ফুটে বেরোয়; এবং প্রথমে প্রতিবেশপরাজয়ের অভিলাষ-পোষণ ক'রে ক্রমশ আমরা যখন ধরতে পারি যে শীতের প্রকোপে আপাদমস্তক রোমশ পরিচ্ছদে মুড়ে আমরা উন্নতির শিখরে উঠি না, বিবর্তনের সোপানমার্গে প্রয়োজনমতো ধাপ-কয়েক নামি, তখন বুদ্ধিগত বিরোধকে আর সাময়িক লাগে না।

অর্থাৎ মানুষী চিন্তার মুষ্টিমেয় পদার্থ-প্রত্যয়াদি চিরনির্দিষ্ট ব'লেই, প্রবর্ধমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ ব্যাসকূটের রঙ্গভূমি; এবং তৎসত্ত্বেও ফলিত বিজ্ঞানের প্রসার যদিচ থামে না, তবু প্রতিযোগী অর্থাপত্তির আপত্তি-বিপত্তি মনীষার আপোষে সত্যই মেটে কিনা সন্দেহ। অবশ্য আলোকের স্বরূপ-সম্বন্ধে কণাবাদীদের সঙ্গে তরঙ্গধর্মীদের বাদ-বিতণ্ডা সম্প্রতি লুই দ ব্রোগ্লি-র মীমাংসা মেনেছে; এবং সেই সামঞ্জস্যের জন্যে তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু এ-রকম পরিকল্পনার দ্বারা গণিতের মান যতই বাড়ুক না কেন, অণু আর উর্মির বাস্তবিক সাযুজ্য কিছুমাত্র এগোয় না; বরং আমার মতো মূর্খ ভাবতে পারে যে সমুৎপন্ন সর্বনাশে আধুনিক পণ্ডিতেরা আর অর্ধত্যাগে নিস্তার পান না, সনাতন প্রথায় সমস্যার সমাধান অসম্ভব দেখে সমস্যার সঙ্গে গতানুগতিক কাণ্ডজ্ঞানকেও যথাসম্ভব ঝেড়ে ফেলেন। অন্ততঃপক্ষে য়ুং-এর মতো স্থিতপ্রাজ্ঞের বিচারেও বিরোধভঞ্জনের চেষ্টা পণ্ড শ্রম; এবং যারা দারুণ দ্বিধায় দিশা হারিয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ চায়, তাদের তিনি অধ্যবসায়ের শত নাম শোনান না, অবিলম্বে সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র তাকাবার উপদেশ দেন। কারণ তাঁর ধ্যানলব্ধ সিদ্ধান্ত আর পাভ্‌লোভ্‌-এর প্রয়োগপ্রতিষ্ঠ অনুমান উভয়ে বোধহয় এ-বিষয়ে একমত যে ব্যক্তি আধিদৈবিক প্রয়োজনের নিমিত্তমাত্র; এবং তাই তার বিশ্ববীক্ষার প্রতীকাদি এক দিকে যেমন নির্বিকার, তেমনই অন্য দিকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাতন্ত্র্য অবস্থাবিশেষে অধিকারভেদের শাসন-মুক্ত।

নচেৎ সুরিখের কূপমণ্ডূকেরা তদ্‌গত চিত্তে ছবি আঁকতে গিয়ে তির্যক্‌ অলাতচক্রে ঘুরে মরত না; নতুবা খাদ্যের পরিবর্তে রঙীন আলো দেখে কুকুরের জিহ্বায় লালা ঝরত না; নয়তো আমের বীজে জাম জন্মাত,

ভিন্ন জাতির নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী ভিন্ন আকার ধরত, সীজর-নেপোলিয়ন্-এর অনুকরণ ছেড়ে মুসোলীনি পেত আত্মসমাহিতির প্রয়াস। অর্থাৎ সোহংবাদের প্রাচীনতা সত্ত্বেও নিঃসম্পর্ক নূতন ইহলোকে দুর্লভ; এবং এই অনেকান্ত পৃথিবীর যোগসূত্র কাকতালীয়-ন্যায়ের মতোই শিথিল বটে, কিন্তু ইতিহাস পুনরুক্তিময় ব'লেই, স্বদেশপ্রত্যাখ্যাত প্রবক্তারা অন্তত বিদেশে সমাদর কুড়ায়। কারণ পূর্ণতা ও সত্তার ব্যতিহার-সম্বন্ধে খৃষ্টান্ দার্শনিকদের নিঃসংশয় হয়তো একেবারে অমূলক নয়; এবং আমানুষ প্রাণী যদি স্বভাবত ইষ্টানিষ্টের পার্থক্য না চিনত, তবে তার পাট তো ইতিপূর্বে উঠতই, এমনকি বহিঃপ্রকৃতিও এত দিন তার প্রাক্তন প্রবৃত্তির সঙ্গে তাল রেখে না চললে, সে নিশ্চয়ই নিমেষের বেশী টিঁকত না। দুর্ভাগ্যবশত স্বভাব প্রায়ই অচেতন; এবং মজ্জাগত অনীহার অঙ্গীকার শুধু আমাদের আত্মপ্রসাদে বাজে না, আমাদের দেহধর্মেও বাধে। কাজেই পারেতো-র বিবেচনায় মানুষের অধিকাংশ ক্রিয়া-কর্ম নিরতিশয় অসঙ্গত; এবং একা বিজ্ঞানেই যেহেতু উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও উপলক্ষের অভেদ সম্ভব, তাই তিনি যেমন শুধু সেই চর্চাকে অযৌক্তিকের এলাকায় ফেলেননি, তেমনই বোধহয় মনুষ্যত্বের অভিশাপেই, ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বেঁচেও, 'বিজ্ঞানের শোচনীয় পরিণাম তাঁর চোখে পড়েনি।

পারেতো বুঝেও বোঝেননি যে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্যে জ'ন্মে বিজ্ঞান যখন অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর মন যোগাতে গিয়ে সারা সভ্যতার সঙ্গে মরতে বসেছে, তখন অন্যায়-উপাধি সর্বাগ্রে তারই প্রাপ্য; এবং সামাজিক কার্যকলাপের জাতি-বিচারে তিনি অনুরূপ আরও অনেক ভুল করেছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর মূল প্রতিপাদ্য অসার্থক নয়; এবং তাঁর মতো অহংসর্বস্ব হলে, আমরাও মানব না বটে যে আমাদের অদ্বিতীয় অভিমত পূর্বসূরীদের প্রতিধ্বনি, তবু তাঁর দিব্যদৃষ্টি যদি আমাদের অধিকারে আসে, তাহলে আমরা নিশ্চয় জানব যে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর আচারে-ব্যবহারে যুগে যুগে যতই পরিবর্তন ঘটুক, তার সংস্কার কখনও বদলায় না। কারণ এই সংস্কার বা "রেসিডিউ" অহৈতুক, লক্ষ্যহীন বা স্বগত; এবং মানুষ যেমন এরই প্রেরণায় চলে, তেমনই তার কার্যক্রম এর দ্বারা ধার্য নয়।

অর্থাৎ শুধু তার মানস প্রতিক্রিয়া এর আজ্ঞাধীন ; এবং একই সংস্কারের বশে নানা মানুষ নানা কাজে লাগে। অতএব কেউ ভাবে যে ভাইনীদের অগ্নিপরীক্ষা ভিন্ন দেশের ও দশের মঙ্গল নেই ; কেউ ধ'রে নেয় যে নিরীহনিগ্রহের প্রতিবিধানই হিতৈষণার আত্মকৃত্য ; এবং উভয়ত্র এই কুসংস্কার প্রকাশ পায় যে অকল্যাণ একটা সাময়িক উৎপাত, যার নিরাকরণ শক্তিমানের ইচ্ছাসাপেক্ষ। তবে মৌরসী সমাজে ষড়্বিধ সংস্কার ধরা পড়ে ; এবং সেগুলোর প্রত্যেকটা অপরিহার্য, অথচ গোটাকয়েক আপাতত পরস্পরবিরোধী ব'লে, সব কটাকে এক সঙ্গে এক জনের মধ্যে মেলে না। ফলে কোনও ব্যবস্থা চির কাল টিঁকেনি ; এবং কেবল তাই নয়, সমস্ত সংস্কারের একত্র সমাবেশ যেহেতু অসম্ভব, অগত্যা সমাজমাত্রেই শ্রেণীবিভক্ত আর শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য স্বভাবত স্বল্পায়ু।

কারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবশ্যক পারম্পর্যে একটা সংস্কার কিছু দিন চললে, তার বিপরীত সংস্কার আপনা থেকে উৎপন্ন হয় ; এবং সমাজপতিরা যেমন অমর নয়, তেমনই প্রতিভাবানের ঔরসেও নিষ্প্রতিভ সন্তান জন্মায়। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনে আজ যে-দল জেতে, নিসর্গের স্বয়ংবরসভায় কাল আর তার মাল্য জোটে না ; এবং তখন সে যদি নিজের অক্ষমতা মেনে নিয়ে অপাঙ্‌ক্তেয়দের স্বপক্ষে স্থান দেয়, তবেই তার মঙ্গল, নচেৎ আসন্ন কুরুক্ষেত্রে তার সপরিবার নিপাত নিশ্চিত। এই সত্যকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে আদর্শ সমাজ ব্যতীত অন্য কোথাও বিস্তারের ইচ্ছা আর সংরক্ষণের প্রবৃত্তি—এই অন্যোন্যবিমুখ প্রাথমিক সংস্কার-দুটো যুগপৎ কার্যকর নয় ; এবং সাধারণত রাষ্ট্রপরিচালকেরা হয় এত সাবধান যে আত্মীয়দের অসার জেনেও তাঁদের ক্ষাত্র দুর্গে অন্ত্যজদের প্রবেশ তাঁরা অপছন্দ করেন, নয় এমন বৈশ্যভাবাপন্ন যে শত্রু আগত বুঝেও তাঁদের খোলা হাটে তাঁরা বেড়া লাগান না। সেই জন্যে বিপ্লবের রক্তগঙ্গায় আভিজাতিক শাসকগোষ্ঠীকে ডুবিয়েও মনুষ্যসংসার প্রজাতন্ত্রে এসে কূল পায় না, গণনায়কদের বেবন্দোবস্তে একাধিক যুদ্ধ-বিগ্রহে হেরে আবার স্বৈরাচারে আশ্রয় চায় ; এবং আমাদের সাময়িক অভিভাবকেরা প্রতি বার শক্তিহস্তান্তরের আগে ও পরে জনহিতের ডঙ্কা পেটান বটে,

কিন্তু এই নিরন্তর পরিবর্তন সর্বসম্মতির অপেক্ষা রাখে না, কেবল একাগ্র অনুচরদের প্রতি পক্ষপাত দেখায়। এমনকি বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলও একটা কথার কথা ; এবং শুভবুদ্ধির সঙ্গে আত্মম্ভরিতার সম্পর্ক এ-রকম নিকট যে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য-ব্যতিরেকে ইষ্টানিষ্টের বিচার পারেতো-র বিদ্রূপ জাগাত।

পক্ষান্তরে গণিতের পদ্ধতি যতই নিরপেক্ষ হোক না কেন, তার প্রয়োগ নির্বিকল্প নয় ; এবং সেই জন্যে তার নির্দেশেও বিবিধ সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটার নির্বাচন অসাধ্য, সে-উপায়ে হয়তো কেবল এইটুকু জানা যায় যে উপস্থিত বিধান ভবিষ্যতে কেমন দাঁড়াবে। অর্থাৎ ভালো-মন্দের বাছাই ন্যায়াতিরিক্ত ব্যাপার, সেখানে বিবেক-নামক ব্যক্তিগত খেয়ালই সর্বেসর্বা ; এবং সমাজতত্ত্ব যেকালে প্রামাণিক বিজ্ঞানের পদ-প্রার্থী, তখন কোনও রকম হার্দ্য বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া তার উচিত নয়, কোন্ সমাজের উপচিকীর্ষা কতখানি—সে-প্রসঙ্গ অমীমাংসিত রেখে সমাজবিশেষের উপকারিতা কোথায় ও কিসে—সেই আলোচনায় মনোনিবেশই তার একমাত্র কর্তব্য। কারণ পারেতো-র বিবেচনায় উল্লিখিত ক্ষেত্রদ্বয় এমনই স্বতন্ত্র যে এক উত্তরে উভয়ের সমীকরণ প্রায় অসম্ভব ; এবং রাষ্ট্র যত দিন সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের লীলাভূমি থাকবে, অন্তত তত দিন মূল্যবিচার তো আমাদের ক্ষমতায় কুলাবে না বটেই, এমনকি অবস্থাবিশেষের উপকারিতাও প্রজারঞ্জনের পরিমাপে আবিষ্কার্য নয়, তার পরিমাণ অন্যান্য সমাজের অনুপাতে অধীত সমাজের প্রবলতর অস্ত্রে-শস্ত্রে বা প্রশস্ততর বাণিজ্যে। আসলে সাধারণ সুখ-সুবিধার বহিরাশ্রিত হিসাবনিকাশ একেবারেই অচল ; এবং কেন অচল, তা যিনি বুঝতে চান, নানা মুনির নানা মত, কিংবা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি ইত্যাদি প্রবাদবাক্যগুলো তাঁর স্মরণীয় নয়। সে-সময়ে এইটুকু ভেবে দেখাই যথেষ্ট যে কোনও অঞ্চলের প্রজননবৃদ্ধি আবশ্যক, না অনাবশ্যক,—এই শাশ্বত সমস্যারও সনাতন সমাধান নেই ; এবং রাষ্ট্র যুদ্ধব্যবসায়ীদের কবলে পড়লে, এ-প্রশ্নের উত্তর যেমন হাঁ, তেমনই রাজদণ্ড যদি শ্রেষ্ঠীদের হাতে আসে, তবে এর জবাব না। অতএব মানবচৈতন্য সদা-সর্বদা উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন ; এবং উভয়-

সঙ্কট স্বভাবতই গতিপরিপন্থী ব'লে, মানুষের সংস্কার শত সহস্র বৎসর ধ'রে নির্বিকার রয়েছে।

পারেতো-র জন্ম ও মৃত্যু, দুই, দুটো রাষ্ট্রবিপর্যয়ের অব্যবহিত আগে আর পরে ; এবং পিতা-পুত্রের অনিবার্য বৈপরীত্যের ফলে তিনি আজীবন মাৎসীনি-মার্কা উদারনীতির বিপক্ষে কলম চালিয়ে শেষ কালে যেহেতু বাহুবলের মাহাত্ম্য-কীর্তনে বিস্তর বাক্যব্যয় করেছিলেন, তাই এক দিকে ফাশিস্ট্-রা যেমন তাঁর প্রশংসায় শতমুখ, তেমনই অন্য দিকে তিনি বামাচারীদের চক্ষুশূল। কিন্তু রাসেল্-এর মতে মানুষমাত্রেই যখন ঝোঁকের মাথায় হাঙ্গাম বাধিয়ে বুদ্ধির সাহায্যে সে-গোলোযোগ মেটাতে চায়, তখন একদেশদর্শী ভিন্ন আর কেউ ভাববেন না যে রাজনৈতিক পক্ষপাতের স্পর্শদোষ একা পারেতো-র সমাজতত্ত্বেই বর্তমান ; এবং জ্ঞানপাপী হেগেল্ যদি প্রুষ স্বৈরাচারের ডায়ালেক্‌টিক্ আবশ্যিকতা দেখিয়েও শুধু তত্ত্বের জোরে গুরুবাদী বিপ্লবীদের পূজা পেতে পারেন, তবে তথ্যের গুণে পারেতো নিশ্চয়ই সদাশয়ীদের প্রণিধান-যোগ্য। উপরন্তু তিনি আসলে ফাশিস্ট্ নৃশংসতার অগ্রদূত নন, পরিবর্জিত মনুষ্যধর্মের অন্তিম মুখপাত্র ; এবং মনুষ্যধর্ম পশ্চিমাকাশেই অস্ত গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার উদয় খুব সম্ভব প্রাচ্যে। অন্ততঃপক্ষে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতো বৌদ্ধ ভাবুকেরাও বুঝেছিলেন যে জীবের বিবর্তন অনিবার্য ব'লেই, তার বৃত্তি অস্থায়ী নয় ; এবং বৃত্তি না থাকলে, সংসারযাত্রায় তো ঘন ঘন পূর্ণচ্ছেদ পড়ত বটেই, এমনকি কেউ কখনও প্রতীত্যসমুৎপাদের চেষ্টায় মাথা ঘামাত কিনা সন্দেহ। হয়তো সেই জন্যে বৈনাশিকেরা সত্য ও শুভের অলৌকিক আদর্শে আস্থা হারিয়ে সক্রেটিস্-এর সঙ্গে সমস্বরে মেনেছিলেন যে শ্রেয়োবোধ প্রত্যেকের মধ্যে বদ্ধমূল, কেবল চিত্তশুদ্ধির অভাবে তা আমাদের গোচরে আসে না ; এবং আমার বিশ্বাস পারেতো-র "রেসিডিউ" এই বৃত্তিরই নামান্তর— অর্থাৎ বৃত্তির ন্যায় "রেসিডিউ"-ও মানস জগতের স্বতঃসিদ্ধ আদিভূত।

মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সম্প্রতি লিখেছেন যে ফাশিস্ট্ রাষ্ট্র মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শেষ আস্ফালন হলেও, ফাশিস্ট্ দর্শন নাকি বেদ-বেদান্তের

সমবয়সী ; এবং কিছু কাল পূর্বে অধ্যাপক ক্রস্‌ম্যান্ ভজিয়েছিলেন যে আসলে প্লেটো-ই এই অনর্থের জন্মদাতা। সুতরাং পারেতো-র প্রায়শ্চিত্তে গ্রীক্ বা বৌদ্ধ মনীষীদের ডেকে আনা হয়তো সঙ্গত নয়, স্বয়ং মার্ক্‌স্-এর শরণ নেওয়াই সমীচীন ; এবং উপসংহারে এঁদের যতই অমিল থাক না কেন, অন্তত উপক্রমণিকায় উভয়ে বোধহয় একমত। কারণ মার্ক্‌স্-এর মতো পারেতো-ও বুঝেছিলেন যে ধনবিজ্ঞানই সমাজ-জীবনের একমাত্র নিয়ন্তা ; এবং সেই হেতুপ্রভব বিদ্যার সংজ্ঞা-সম্পর্কে তাঁদের পার্থক্য যদিও সুপ্রকট, তবু অর্থনীতির আনুকূল্যেই যে শাসকবর্গ ক্ষমতাশালী, এ-বিষয়ে কোনও পক্ষেরই সন্দেহ ছিল না। ফলত তাঁরা দু জনেই অহিংসার নিন্দা রটিয়েছেন ; এবং তাঁদের বিবেচনায় অর্থনীতি যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকারভেদ, তাই উৎপাদিকাশক্তির হস্তান্তরে রক্তপাত তাঁদের কাছে দূষণীয় ঠেকেনি। অবশ্য সে-আদ্যাশক্তি কী রকম, জড় বা চেতন—কোন্ বিশেষণ তার প্রাপ্য, তাতে পরিবর্তন না প্রগতি— কিসের সাক্ষ্য মেলে, এ-সব প্রসঙ্গে তাঁরা আপাতত বিপরীত-গামী ; এবং মার্ক্‌স্ যেখানে নিষ্কাম কর্মের প্রচারক, পারেতো সেখানে অবাধ প্রতিযোগের পতাকাবাহী। কিন্তু মার্ক্‌স্-এর বিরুদ্ধে বাকুনিন্-এর অন্যতম অভিযোগ এই যে সাম্যবাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত এমনই বাহ্য যে তাঁর উপদেশে কান পাতা মানে স্টেট্ সোশ্যালিজ্‌ম্-এর সাধারণ স্বত্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পিষে মারা ; এবং পারেতো মুখে স্বপ্রাধান্যের গুণ গেয়েছেন বটে, কিন্তু সর্বগ্রাসী ফাশিস্ট্ রাষ্ট্র যে তাঁরই আদর্শসম্ভূত, এ-রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা উদারনীতিকদের মধ্যে খুব সুলভ।

উপরন্তু উন্নয়নে আস্থা সত্ত্বেও মার্ক্‌স্-এর জিহ্বায় ভবিষ্যদ্বাণী আটকায়নি ; এবং কর্মকাণ্ড থেকে হেতু-প্রত্যয়ের বালাই চুকিয়েও পারেতো স্বসমুখ-বাদে পৌঁছাননি, সমাজতত্ত্বই লিখে গেছেন। অগত্যা আমি মনে করি যে প্রকাশ্যে না হোক, অন্তত প্রকারান্তরে মার্ক্‌স্-ও বৃত্তির দুর্মরতা মেনে নিয়েছিলেন ; এবং তথাচ প্রগতির উপরে তাঁর আস্থা দুর্মর বটে, কিন্তু তাঁর বিরাট মতবাদের ভিত্তি নিশ্চয়ই এই বিশ্বাসে যে সভ্যতার প্রত্যেক পর্যায়ে মানুষ একই প্রয়োজনের দাস। তবে সেই প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়

অন্তের আয়ত্তে ব'লে, সমানাধিকার নৈরাজ্যবাদের আগে সে কোনও মতে থামতে পারবে না; এবং উক্ত কৈবল্যপ্রাপ্তির দিন-ক্ষণ যদিও অঙ্কশাস্ত্রের ধার ধারে না, তবু তার আবশ্যিকতা কায়মনোবাক্যে না বুঝলে, মনুষ্য-জাতির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ মার্ক্‌স্‌-এর ভাবতে বাধেনি যে তাঁর অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি শুধু ন্যায়পরায়ণতার পরিচায়ক নয়, তাঁর বস্তুনিষ্ঠাও অন্য সকল সিদ্ধান্তের পরিপন্থী, এবং কার্য-কারণের মার্জনীয় বিপর্যয় ঘটিয়ে সেই তন্ময় দৃক্‌শক্তিই তাঁকে দিয়ে রটিয়েছিল যে সাবধানে যারা ইতিহাস পড়েছে, তারা অবিলম্বে দেখতে বাধ্য যে আধ্যাত্মিক সম্পদ বা ভাবের ঔদার্য ঐহিক অবস্থার উৎকর্ষ বাড়ায় না, বরং ধনোৎপাদনের পদ্ধতি ও পণ্যবিনিময়ের প্রথা যেহেতু বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তির সঙ্কোচ ঘোচায়, তাই বিপ্লববিশেষের প্রেরণা মনীষীদের শ্রেয়োবোধে বা দার্শনিকদের জীবনবেদে অন্বেষ্টব্য নয়, সে-ঘটনাঘটনের সূত্রপাত তখনকার ধনবণ্টনে কিংবা তদানীন্তন অর্থশাস্ত্রে। আসলে প্রচলিত বিধি-বন্দোবস্তে যখনই আমরা আস্থা হারাই, তখনই ধরা পড়ে যে নূতন ধনোৎপাদন তথা পণ্যবিনিময়-পদ্ধতির সঙ্গে গতানুগতিক সমাজব্যবস্থার তাল কেটেছে; এবং মানুষের বিবেক বা বোধি এই বিরোধনিরাকরণের উপায় জানে না, যে-অবস্থান্তরের ফলে বিরোধবিশেষের উৎপত্তি, তার মধ্যেই সামঞ্জস্যসাধনের প্রকরণও মেলে।

এমনকি যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এই নিত্য সংঘাতের নিমিত্ত, শাস্তি তার সাধ বা সাধ্যের তোয়াক্কা রাখে না; এবং উৎপাদিকাশক্তি আর উৎপাদনপ্রণালীর অসঙ্গতি যেমন অতিমানুষিক, উভয়ের সন্ধিও তেমনই বস্তুজাত। আমাদের ভাবনা-বেদনা খুব জোর সেই প্রাকৃত ডায়ালেকটিক্‌-এর মুকুরমাত্র; এবং সেই জন্যে অবরোহী চিন্তার দ্বারা সে-নিয়মের আবিষ্কার সম্ভবপর নয়, ঘটনানিয়ন্ত্রিত আরোহী অভিজ্ঞতাই বার বার ঠেকে তাকে চিনতে শেখে। তৎসত্ত্বেও অনেকে এখনও নিঃসন্দেহ নন যে মার্ক্‌স্‌ প্রকৃত প্রস্তাবে জড়বাদী, না জীববাদী, কিংবা তাঁর সম্বন্ধে রাসেল্‌-এর অনুমানই সত্য, এবং তিনি ডুাই-প্রচারিত উপযোগবাদের আদিপুরুষ। কিন্তু সে-সমস্ত সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক;

এবং এখানে আমার এইটুকুই বক্তব্য যে বিষয়-সম্পর্কে তাঁর আর বার্ক্‌লি-র সিদ্ধান্ত সময়ে সময়ে যতই এক রকম শোনাক না কেন, বিশ্বব্যাপারে তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্যের লীলা-খেলা দেখেননি, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাই তাঁর কাছে অবশ্যস্বীকার্য লেগেছিল। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে বিষয় বিষয়ীর প্রভাবে বদ্‌লায় বটে, কিন্তু বিষয়ীর কর্মপ্রবর্তনা যেকালে বিষয় থেকেই আসে, তখন তত্ত্বত বিষয়ী গৌণ আর বিষয় মুখ্য ; এবং বিষয়ীর সংস্পর্শে বিষয়ের বিকার অনিবার্য ব'লে, তার স্বরূপ যদিও কারও ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তবু তার নির্গুণ সত্তা না মানলে, আমাদের এক মুহূর্ত চলে না। ফলত ফয়েরবাখ্‌-এর বিরুদ্ধে গিয়েও মার্ক্‌স্‌ নিজেকে জড়বাদী আখ্যাই দিয়েছিলেন ; এবং তাঁর প্রধান শিষ্যদ্বয়—এঙ্গেল্‌স্‌ ও লেনিন্‌—বিজ্ঞানবাদের প্রতি গুরুর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত লক্ষ্য সুদ্ধ করেননি, জ্ঞানত না হোক, অন্তত অজ্ঞাতসারে মেকিয়াভেলি-র বস্তু-প্রত্যয়কেই বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। কারণ মেকিয়াভেলি-ও ইতিহাসের ভিতরে স্বধর্মনিষ্ঠ তন্মাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন ; এবং তাই মধ্য যুগের অতিজীবিত সমাজ-ব্যবস্থা তিনি সইতে পারেননি।

অগত্যা তিনি ভজিয়েছিলেন যে ইতিহাসের সাহায্যে উপাধির আপদ কাটিয়ে এক বার অব্যয়, অক্ষয় দ্রব্যগুণে পৌঁছাতে পারলে, এ-রকম আদর্শ রাষ্ট্র আপনা-আপনি গ'ড়ে উঠবে যাতে ব্যক্তিত্বের বিসংবাদ থাকবে না, স্বত্বের সংঘর্ষ বাধবে না, ত্রিকালদর্শী পদার্থবিদের নেতৃত্বে ও দ্রব্যের নির্বিশেষ ঐক্যে মানুষ মানুষকে ভাববে ভাই ; এবং বলাই বাহুল্য যে এ-রাজ্যেও বৃত্তিই একেশ্বর। অর্থাৎ তারই ফলে মেকিয়াভেলি-র বৈশেষিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান একাধারে সাম্য আর স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক, গতি ও স্থিতির মুখাপেক্ষী ; এবং সেই জন্যে অহিংসায় মেকিয়াভেলি-র অভক্তি মার্ক্‌স্‌ ও পারেতো-র চেয়ে বেশী বই কম নয়। আসলে এ-ধরণের দ্বৈধ জড়বাদীর পক্ষে অনতিক্রম্য ; এবং যাঁরা ফিশ্‌তে-কীর্তিত আত্মরতির প্রতিভূকল্প নন, এমন জীববাদী যেহেতু সনাতন সাধারণ্যের ভুক্তভোগী, তাই তাঁরাও অভিব্যক্তিতে ন্যায়সঙ্গতি আনতে পারেননি, অনুমান করেছেন যে যদি অনুক্রমের নাম জপা যায়, তবে প্রগতির রথ নিরাপদে এগোবে। কেননা

তাঁদের মতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেকালে মানস ধাতুতে গঠিত, আর মন স্বভাবতই পরিণামী, তখন জাগতিক ক্রমবিকাশে মানুষেরও স্থান আছে বটে, কিন্তু নিরবধি কালের তুলনায় মনুষ্য-জাতির পরমায়ু এতই সংক্ষিপ্ত যে সভ্যতার বিবিধ পর্যায়ের মধ্যে সাদৃশ্য সম্ভবত বৈসাদৃশ্যের অগ্রগণ্য ; এবং হেগেল্ এখানে থামেননি, ভাববাদে মানুষী উদ্বর্তনের অনন্ত সোপানমার্গ দেখে রটিয়েছিলেন যে সমাজজীবনের আকার-প্রকার যেমন দেশে দেশান্তরে, তথা যুগে যুগান্তরে, অবিকার থাকে, তেমনই সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যে-উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের উপরে স্থাপিত, তার নিয়ত পরিবর্তন অনিবার্য।

টয়েন্‌বি-ও বিশ্বাস করেন যে সভ্যতায় চিরন্তন জড়প্রকৃতির স্থূল হস্তাবলেপ যতই পরিষ্কার হোক না কেন, বস্তুর অভ্যাঘাতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া চিরনির্দিষ্ট নয় ; এবং বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কে বৈচিত্র্য অনিবার্য ব'লে, একই প্রতিবেশে ভিন্ন যুগের মানুষ ভিন্ন চিৎপ্রকর্ষে পৌঁছাতে বাধ্য। কিন্তু এ-কথা মানলেও, প্রগতির পূজা আমাদের আশুকৃত্য নয় ; এবং তথ্যের গরজে যদি সংস্কৃতির স্তরভেদ স্বীকার্যই ঠেকে, তবু সত্যের খাতিরে এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য যে সভ্যতার পর্যায়পরম্পরায় কোনও কালাতীত গুণের তারতম্য ধরা পড়ে, অথবা সেগুলোর জাতি-বিচারে অগ্র-পশ্চাৎ ব্যতীত অপর কোনও পার্থক্য দ্রষ্টব্য। বিপরীত সিদ্ধান্ত আপাতত জাত্যভিমানের ফল ; এবং জাত্যভিমান কেবল নাৎসী বিজিগীষারই শনি নয়, দুর্দমনীয় জার্মানির মতো পরাধীন ভারতও ভাবে যে সেই সভ্যতার জন্মভূমি। দুর্ভাগ্যবশত প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সম্প্রতি যেমন মহেঞ্জো-দড়োর খবর শুনেছেন, তেমনই মায়া সংস্কৃতির বার্তাও আর তাঁদের কাছে গোপন নেই ; এবং মিশর আর মায়ার অদ্ভুত সাদৃশ্য সত্ত্বেও অব্যাহত আদান-প্রদানের অসুবিধা দেখে আমরা যখন সে-দুই ভূখণ্ডের আত্মীয়তা মানি না, তখন নীল নদের গভীর কর্দমে সিন্ধুদেশীয়দের পদাঙ্ক-সন্ধান হয় অসাধ্যসাধনের নামান্তর, নয় আত্মপ্রসাদের সাক্ষ্য। আসলে ইতিহাসের উপরে কার্য-কারণের আরোপ হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা ; এবং প্রাচীন পৃথিবীও যেহেতু একেবারে দুর্গম ছিল না, তাই এক স্থানের

সামগ্রী পর্যটকদের মারফৎ স্থানান্তরে যেত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীরা অপরিচিত বস্তুর বা ভাবের যথাযথ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই শিখত না, প্রায়ই তাকে নূতন কাজে লাগাত। উদাহরণত জ্যামিতির পুরাবৃত্তান্ত স্মরণীয়; এবং অহিন্দু গবেষকেরাও বৈদিক সাহিত্যে তার সাক্ষাৎ পান বা না পান, অনুরূপ ভূয়োদর্শনের সাহায্যে গ্রীকরা শুধু বেদি বানায়নি, সে-নিষ্প্রমাণ প্রাচ্য বিদ্যার ভিত্তিতে তারা গ'ড়ে তুলেছিল পাশ্চাত্ত্য প্রজ্ঞার অটল কীর্তিস্তম্ভ।

হিন্দুস্তানী গাড়ু, ঘটি বা বদনার ভাগ্যবিপর্যয় আরও রোমহর্ষক; এবং অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানের সঙ্গে কালাপানি পেরিয়ে সেই লজ্জাকর শুদ্ধিপাত্র আর আঁস্তাকুড়ের আশে-পাশে লুকাতে চায় না, সগৌরবে চ'ড়ে বসে ড্রইং রুমের সমুচ্চ শেল্‌ফে। অবশ্য উত্তমর্ণ আর অধমর্ণের এতখানি বৈপরীত্য সর্বত্র চোখে পড়ে না; দুই পক্ষ যেখানে একই অঞ্চলের বাসিন্দা, সেখানে সমীক্ষার বিস্তার যদি কমানো যায়, তবে একটা ধারাবাহিকতার আভাস হয়তো কচিৎ-কদাচিৎ মেলে; এবং সেই জন্যে হোয়াইট্‌হেড্‌-প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীরা পশ্চিমের দর্শনে-বিজ্ঞানে আজও প্লেটো-র স্বাক্ষর খোঁজেন। কিন্তু এ-কথা তাঁদের মুখেও বাধে যে আধুনিক য়ুরোপ প্লেটোনিক্‌ অ্যাথেন্স্‌-এর প্রতিচ্ছবি; এবং ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পরেও চীন ও জাপানের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন যে-পরিমাণে স্বকীয়, য়িহুদী-প্রস্তাবিত খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে মুস্‌লিম্‌-প্রচারিত মনুষ্যধর্ম ঢুকিয়ে প্রতীচ্য ততোধিক স্বতন্ত্র। কারণ জাত্যভিমান যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, জাতির বৈশিষ্ট্য নিরতিশয় নিশ্চিত; এবং এই পার্থক্যের কষ্টিপাথরে উত্তম-অধমের যাচাই চলে না বটে, তবু মানুষের আচার-ব্যবহার, তথা মতিগতি, এর দ্বারা এতখানি নির্ধারিত যে দেখে শেখা প্রায়ই তার সাধ্যে কুলায় না, সে সাধারণত ঠেকেই শেখে। অথচ সে মানুষ; এবং মানুষী সমস্যার সবগুলোই তাকে আজীবন ঘিরে থাকে। কেবল সমাধানের বেলায় পরের মুখে ঝাল খাওয়া তার বারণ; এবং প্রত্যেক প্রশ্ন নিজের বুদ্ধিতে বুঝে, নিজের উপায়ে সকলের দাবি না মেটালে, সে নিজেকে সজাগ রাখতে পারে না, জীবন্মৃত্যুর অগাধে তলায়।

অতএব সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্যক্তির বৈষম্যে ভাঁটা লাগে, তখন জাতির যৌবনসুলভ তেজ ফুরিয়ে তাকে বর্তায় বার্ধক্যোচিত অনীহা, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের প্রেরণা ভুলে সে মজে স্মৃতির কুহকে, স্বাবলম্বী-দের নির্বাসনে পাঠিয়ে সে কান পাতে সংখ্যাধিকের পরামর্শে ; এবং তার পর প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত তার মাথায় ঢোকে না, উপযাচকের আবেদন তার গোচরে আসে না, সে ম'রে প্রেতত্ব পায়, আর কণ্ঠহারা ছায়ামূর্তি নিয়ে জীবিতদের সামনে প্রহেলিকার মতো ভেসে বেড়ায়।

অন্ততঃপক্ষে তাই ভিকো-র বিশ্বাস ; এবং সেই বিশ্বাসের পিছনে মনোবিদেরা ভিকো-র নিঃসহায় শৈশব ও অক্ষম জরার খোঁজ পেয়েছেন বটে, কিন্তু গত দু শ বছরের গভীর গবেষণাতেও এমন কোনও অবিসংবাদিত তথ্য বেরোয়নি যার ফলে এলিয়ট্‌-স্মিথ্‌-এর "সংস্কৃতিব্যাপন" আজ সর্ববাদিসম্মত : বরঞ্চ সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্বে আমাদের জ্ঞান বাড়ায় আমরা নিঃসংশয়ে জেনেছি যে মানুষের ঐতিহ্যবোধ ইতিহাসের চেয়েও পুরাতন ; এবং "সাফোক্ অস্থিস্তর"-এর উপরে দাঁড়িয়ে ময়র, লীকি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ভজিয়েছেন যে প্লায়োসীন্ যুগেই ডার্মস্‌ডিনীয়ান্, আইসিনীয়ান্ ও প্রীশেলীয়ান্-নামক তিন-তিনটি সংস্কৃতি বহু সহস্র বৎসর ধ'রে পূর্ব অ্যাংলিয়াতে পাশাপাশি বসবাস ক'রেও কিছুমাত্র বদ্‌লায়নি, বা পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যে হাত দেয়নি। উপরন্তু সংস্কৃতির স্বাধিকার প্রাগিতিহাসের সাক্ষ্যেই গ্রাহ্য নয়—ভিকো-র গুরুবিস্মৃত শিষ্য স্পেংলার সভ্য জাতিদের ইতিহাসেও অনুরূপ অবৈকল্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ; এবং মুখ্যত পশ্চিমের ও গৌণত প্রাচ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতঃসিদ্ধ সংস্কৃতিধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তাঁকে দেখিয়েছে যে মানবসভ্যতা শাখা-প্রশাখাযুক্ত মহামহীরুহ নয়, তার গতিবিধি কম্বুরেখায় আঁকা যায় না, সে তুলনীয় অবচ্ছিন্ন, উত্থান-পতনশীল, যৌবন-জরাসম্পন্ন, স্বল্পায়ু ব্যক্তির সঙ্গে। এমনকি এ-উপমাও আংশিক ভাবে সত্য ; এবং বংশরক্ষার ক্ষমতা আছে ব'লে, মুমূর্ষু মানুষ যদিচ খানিকটা মৃত্যুঞ্জয়, তবু জাতিগত সভ্যতা সর্বত্র অপুত্রক, তার মৃত্যু পুরোপুরি বিলুপ্তি। সুতরাং সভ্যতা মণ্ডলাকার ও সীমাবদ্ধ ; এবং তার স্বভাব চক্রবর্তী ও আত্মঘাতী। অর্থাৎ তার জীবনের প্রথমার্ধ বর্ধিষ্ণু আর শেষার্ধ

ক্ষীয়মাণ; যেখানে তার যাত্রারম্ভ, সেখানেই তার যাত্রাশেষ; এবং তার উন্নতি তথা অবনতি একই অন্তঃপ্রেরণার অবশ্যম্ভাবী ফল।

স্পেংলারী পরিভাষায় উক্ত আরোহণ-পর্বের নাম সংস্কৃতি আর অবরোহণটা সভ্যতা-অভিধেয়; এবং তাঁর বিশ্বাস যে এই নাগরদোলার ওঠা-পড়া মনুষ্য-জাতির জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যেহেতু কোথাও কখনও থামেনি, তাই এর গতিবিধি যারা নিরাসক্ত মনে বুঝতে চেয়েছে, সৃষ্টির মূল রহস্য তাদের কাছে সুপরিস্ফুট। কারণ কীর্তিমান মনুষ্যগোষ্ঠীর এক-একটা এক-একটা নক্ষত্রের মতো, যার প্রত্যেকটাই বিকর্ষণগুণে অন্যদের থেকে একেবারে পৃথক বটে, কিন্তু আচরণে ও আয়তনে তাদের মধ্যে এতখানি সৌসাদৃশ্য বর্তমান যে অপর সকলের প্রতিমান হিসাবে কোনওটা নগণ্য নয়। অধিকন্তু স্পেংলার-এর মতে সকল সভ্যতার কার্যক্রম যেমন এক, তেমনই সেই কার্যক্রমের নির্বাহকেরা সমানধর্মী, হয়তো বা আকৃতিতেও অভিন্ন; এবং সেই জন্যে দুটো সভ্যতার সংমিশ্রণ বা অন্তঃপ্রবেশ যতই অনাবশ্যক ও অভাবনীয় লাগুক, আবেষ্টনবিশেষের অবরোধে আর পাঁচটা পরিবেশের পরিকল্পনা সার্থক ও সম্ভবপর। তবে সভ্যতার ব্যষ্টিসমূহ তুল্যমূল্য শুধু সমস্যার দিক থেকে; এবং যখন জোর পড়ে সমাধানের উপরে, তখন তাদের বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। অতএব এই প্রভেদ-প্রতিপাদনের জন্যে পাউলি-প্রস্তাবিত ব্যাবর্তন-বিধির ঐতিহাসিক প্রয়োগ প্রশস্ত নয়; এবং সকল জাতির জীবনে যদৃচ্ছার চাপ সমমাত্রিক হলেও, ভবিতব্যের বিচারে তাদের বৈষম্য স্বতঃপ্রমাণ। উক্ত পার্থক্যের ব্যাখ্যায় স্পেংলার প্রাচীনদের বিশ্বাত্মিক পটভূমির সঙ্গে অর্বাচীনদের আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতের বৈরূপ্য দেখিয়েছেন; এবং তাঁর বিচারে সভ্যতার এ-দুই পর্যায়ে অনুরূপ প্রয়োজন আনুষ্ঠানিক সৌসাদৃশ্য ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু গ্রীকো-রোমান্-দের দৈবানুগত্য আর আধুনিক য়ুরোপীয়ান্-দের স্বাবলম্বন স্বভাবত এতই পরস্পরবিরোধী যে কবিরা উভয়ত্র যদিও একই তাগিদে ট্র্যাজেডি লিখেছেন, তবু সে-দু রকম ট্র্যাজেডির তাৎপর্য একেবারে আলাদা।

অবশ্য দুটো সম্পূর্ণ সভ্যতাব্যষ্টির বৈপরীত্যও কালাবর্তের বৃত্তাভাস

কিনা, অথবা ভূত-ভবিষ্যতের সকল সভ্যতাকে পাশাপাশি সাজালে, একটা চিরন্তন উত্থান-পতন ধরা পড়ে, না পড়ে না— সে-সম্বন্ধে স্পেংলার-এর দর্শনে কোনও হঠোক্তি নেই ; এবং সরোকিন্-এর বিরাট্ পাণ্ডিত্য পারেতো-র প্রভাব কাটাতে না পেরে মানুষের অতীত বিবর্তনে একটা একান্তর ছন্দের সন্ধান পেয়েছে বটে, তবু সে-ছন্দের মূল সূত্র জানবে হয়তো মনুষ্যগোষ্ঠীর সর্বশেষ প্রতিনিধি। কিন্তু ইতিমধ্যে রুথ্ বেনিডিক্ট্ প্রাক্‌সভ্য সমাজেও রূপকল্পের স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্রতা দেখেছেন ; এবং তাঁর মতে সেই রেড্ ইণ্ডিয়ান্ রূপক অক্ষরে অক্ষরে সত্য, যাতে প্রত্যেক জাতি একই প্রাণপ্রবাহ থেকে তৃষ্ণার জল তুলেছিল ঈশ্বরদত্ত বিভিন্ন মৃৎপাত্রে। কারণ মানুষের সামনে অনন্ত সম্ভাবনা খোলা থাক বা না থাক, যে পরের মুখ চেয়ে বাঁচতে চায়, তার পক্ষে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অর্জনীয় ; এবং আমাদের কণ্ঠ থেকে যত আওয়াজ বেরোয়, আলাপের সময়ে সে-সবগুলোর প্রয়োগ যেমন অর্থবোধের আশাকে বিড়ম্বনায় পরিণত করতে বাধ্য, তেমনই শক্যতামাত্রেই যদি শক্তি-রূপে ফুটে উঠত, তবে বাইবেলী সৃষ্টিবর্ণনার সঙ্গে ভূপঞ্জরবিদ্যার বিবাদ কোনও দিন বাধত না, প্রাণিবিজ্ঞানীরাও প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরিবর্তে ভাগবত দাক্ষিণ্যেরই গুণ গাইতেন। আসলে মানুষী জ্ঞানের বর্তমান জটিলতায় সে-রকম সারল্য আর পোষণীয় নয় ; এবং তাই টয়েন্‌বি-র মতো সাম্যবিলাসীও আজ অগত্যা মানেন যে পরিবেশের ক্রিয়া সকল জাতির পক্ষে যতই অভিন্ন হোক, ক্ষেত্রবিশেষে তার প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই পৃথক।

সারা পায়ে জুতোর ঘর্ষণ লাগলেও, যখন কড়া পড়ে শুধু দু-একটা জায়গায়, সেকালে চার দিক থেকে অনুরূপ আক্রমণ সয়েও পৃথক্ পৃথক্ জাতি যে স্ব স্ব উপায়ে তাদের সামর্থ্য দেখাবে, তাতে বিস্ময়প্রকাশের অবকাশ নেই ; এবং জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সাদৃশ্যই এখানে সুপরিস্ফুট। কারণ আড্‌লার-এর মতে একই উত্তরাধিকারে জ'ন্মে, একই শিক্ষা পেয়ে দুই ভাই যেমন তাদের নিজ দেহের অসম্পূর্ণতা-বশত দু ধরণের মেজাজ বেছে নিয়ে সেই মৌলিক ক্ষতিপূরণের চেষ্টায় নামে, তেমনই টয়েন্‌বি-র বিবেচনায় দুটো জাতির বাহ্য পরিমণ্ডলে আপাতত কোনও তারতম্য না

থাক, তাদের বিশ্ববীক্ষায়, তাদের জীবনবেদে, তাদের শ্রেয়োবোধে সারূপ্যের কোনও আভাস মেলে না ; এবং তৎসত্ত্বেও টয়েন্‌বি প্রভৃতিতে আস্থাবান এই জন্যে যে তাঁর বিচারে সভ্যতার মশাল বারংবার হাত বদলেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক আলোকপ্রাপ্ত জাতি তাকে আপন আগুনে জ্বালেনি, উদ্বর্তনের কুটিল পথে অগ্রগামীরা বয়সোচিত অবসাদে যখন ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে, তখন কোনও পশ্চাদ্বর্তী তরুণদল ছুটে এসে তাদের বোঝা আরও দু-এক পাক এগিয়ে দিয়েছে। অতঃপর অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এই অজ্ঞাতকুলশীল স্বেচ্ছাসেবকেরা পরমায়ুতে ও পরাক্রমেই পুরশ্চারীদের সমকক্ষ, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ অগ্রজদের চেয়ে অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক ; এবং তাই ক্ষিপ্রতার প্রতিযোগিতায় এদের সাময়িক উৎকর্ষ হয়তো বা অনিবার্য। পক্ষান্তরে স্থিতিসাম্যেরও সীমা তথা প্রকারভেদ আছে ; এবং সম্প্রতি জেরাল্‌ড্‌ হর্ড্‌ যদিও লিখেছেন যে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে পেরেই মনুষ্যেতর প্রাণিজগতের প্রাগ্রসর শাখা এখন মনুষ্য-পদে প্রতিষ্ঠিত, তবু কীথ্‌-এর ন্যায় সাধারণিক নৃতত্ত্ববিদ্‌ও সৌজাত্যবিদ্যার ঠেলায় আজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানুষের জাতিগত বিভাগ প্রাঙ্‌মানুষিক অনৈক্যের পরিণাম।

ওই প্রভেদ ভৌগোলিক নয় ; এবং নিসর্গের নির্দেশ এত নেতিবাচক যে দ্বৈপায়ন জাতি-মাত্রেই নৌবহরে ইংলণ্ডের প্রতিযোগী নয়, শুধু যে-দেশের ত্রিসীমানায় জলের নাম-গন্ধ নেই, সেখানে পোতনির্মাণের প্রয়োজন স্বভাবত অনুপস্থিত। এমনকি শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত— এই তিন মহাজাতির বিশেষ বিশেষ দৈহিক দোষ-গুণও যে অন্তর্বিবাহের পরে একাকার হয় না—এ-রকম নিরুক্তি শুধু নাৎসী-দের সাজে ; এবং যদি তর্কের খাতিরে মানি যে নীল চোখ, কটা চামড়া, সোনালী চুল ইত্যাদি উপলক্ষণগুলো মেণ্ডেলীয় নিয়মের আজ্ঞাধীন, তবু আমাদের বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তি, আমাদের মেধা ও মনীষা যে প্রকৃতির দান নয়, পালনের ফল, সে-বিষয়ে আজ অধিকাংশ পণ্ডিত বোধহয় একমত। তথাচ সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রসঙ্গেও বিশেষজ্ঞদের বিবাদ নেই যে রক্তের চাতুর্বর্ণ্যে সঙ্করের উদ্ভব অসম্ভব ; এবং যে-পুরুষানুক্রমিক রোগ মাথার গড়ন বা চ্যাপ্টা নাকের মতো

একাধিক ক্রোমোসোম্‌-এর বশবর্তী, বহির্বিবাহের দ্বারাও তার প্রতিকার দুঃসাধ্য। উপরন্তু সন্তানপোষণের রীতি-নীতি শুধু পিতা-মাতার ইচ্ছা-সাপেক্ষ নয়, তার উপরে প্রতিবেশীদের প্রভাবও যথেষ্ট; এবং যে-নিগ্রোর মার্কিনে জন্ম, সে যেমন বর্ণবৈষম্য সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদের কুটুম্ব, তেমনই মিশনারী প্রচেষ্টা যেহেতু কাফ্রিদের এখনও সাহেব বানাতে পারেনি, তাই তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে-পরিমাণে অনুপকারী, স্বদেশী ইন্দ্রজাল সেই অনুপাতে মঙ্গলময়। অবশ্য আবহ সকল ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতাশালী নয়; এবং বর্তমান জগতে পশ্চিমের প্রতিপত্তি পরিব্যাপ্ত ব'লে, প্রবাসী য়ুরোপীয়দের ছেলে-মেয়েরা আপাতত স্বধর্মানু-সারেই বেড়ে ওঠে বটে, কিন্তু আজীবন প্রাচ্যে কমঠবৃত্তি বজায় রেখে তারা যখন শেষ বয়সে স্বজনের মাঝে ফেরে, তখন তাদের অনেকে আর স্বস্তি পায় না, নিজ বাসভূমিতেও কাল কাটায় বিদেশিসুলভ সঙ্কোচে।

হয়তো সেই জন্যে জীববিদ্যার পূর্বাচার্যেরা পারিপার্শ্বিককে কুলসংক্রামের উপরে স্থান দিয়েছিলেন; এবং যান-বাহনের ক্ষিপ্রতায় আর যন্ত্রপাতির আশীর্বাদে পৃথিবীর প্রাথমিক বৈচিত্র্য ক্রমেই মিলিয়ে আসছে বটে, কিন্তু মানুষের শরীরে যত দিন জল-বায়ুর প্রভুত্ব খাটবে, তার চারিত্র্যে যত দিন আত্মীয়-বন্ধুর স্বাক্ষর থাকবে, তার ব্যবসা যত দিন সামবায়িক সঙ্কল্পের মুখ চাইবে, তত দিন সে যে কী উপায়ে গোষ্ঠীর গণ্ডি খণ্ডাবে, তা অন্তত আমার কাছে দুর্বোধ্য। অবশ্য আমার বোধশক্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ; এবং আমি বুঝি বা না বুঝি, ভূমাবাদী হেগেল্‌-এর মতো ভূয়োদর্শী মার্ক্‌স্‌-ও নির্ভাবনায় রটিয়েছিলেন যে গুণ তো গণনার অমোঘ পরিণতি বটেই, এমনকি পরস্পরবিরোধী পদার্থের সমন্বয় সেধেই সৃষ্টি কৈবল্যের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু মর্যাদাবিচারে আমার স্থান উক্ত তত্ত্বজ্ঞদের যত নীচেই হোক না কেন, তাঁদের সিদ্ধান্তও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা অক্ষমতার ফল: অন্ততঃপক্ষে তার পিছনে কোনও সর্ববাদিসম্মত যুক্তির সমর্থন নেই; এবং বিপরীতধর্মী পিতা-মাতার সঙ্গম সন্তানসম্ভাবনার একমাত্র উপায় ব'লে, যদি অ্যারিস্টটেলী তর্কশাস্ত্র অর্বাচীনদের কাছে অস্বীকার্যই ঠেকে, তবে অশ্বতরের ক্লৈব্যও নিশ্চয় ডায়ালেক্‌টিক্‌ ন্যায়দর্শনের

পরিপন্থী। হয়তো এ-আপত্তির আশঙ্কা মার্ক্স্-এর মনেও সতত জাগরূক ছিল ; এবং তাই তিনি কখনও আন্বীক্ষিকী নিয়ে মাথা ঘামাননি, সেই শ্রেণীসংরক্ষিত রহস্যের সামান্যীকরণ শিষ্যদের স্কন্ধে চাপিয়ে নিজে ডায়ালেক্‌টিক্-এর ঐতিহাসিক নিদর্শন-সংগ্রহে প্রাণপাত করেছিলেন। তবে অত গবেষণার পরেও ডায়ালেক্‌টিক্-এর ঐকান্তিক প্রগতি অদ্যাবধি অপ্রমাণিত রয়েছে ; এবং গত পাঁচ শ বছরের পাশ্চাত্ত্য ইতিবৃত্তে তার সাক্ষ্য যেমন নিঃসন্দেহে মেলে, তেমনই তৎপূর্ববর্তী যুগ, তথা অত্যাধুনিক কাল, স্পষ্টতই মার্ক্সীয়দের বিপক্ষে।

তাছাড়া ইতিহাস একা য়ুরোপেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, তাতে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডেরও স্বত্ব আছে ; এবং উন্নতিসূচক নির্দ্বন্দ্বের দাবি যখন রোম্ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেই অশোভন, তখন অন্যত্র সে-আদর্শের গুণ-গান ভূতের মুখে রামনামের চেয়েও শ্রুতিকটু। আসলে মানুষের বয়স এত অল্প যে তার মতিগতি-নিরূপণের সময় এখনও আসেনি ; এবং ইতিমধ্যে তার সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জেনেছি, তাতে তার উদ্বর্তন আর পরিবর্তন, এ-দুটোর কোনওটা নিঃসংশয়ে ধরা পড়ে না—কেবল এই পর্যন্ত বিনা প্রশ্নে মানা যায় যে স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতার প্রতিবিধান-কল্পে সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাত্রায় পৌঁছেও সে যেহেতু শ্রমবিভাগ ব্যতীত সামাজিক শক্তির অপব্যয় আটকাতে পারেনি, তাই তার বিধিলিপিতে সঙ্কলনের প্রবৃত্তি যত না প্রবল, বিকলনের প্রয়োজন ততোধিক প্রকট। আমার অনুমানে মানুষের জাতিগত বৈষম্য উক্ত শ্রমবিভাগের ফল ; এবং প্রকৃতিপূজার আধিক্য আমার চোখে হাস্যকর ঠেকুক বা না ঠেকুক, প্রাণিমাত্রেই শ্রেয়োবোধের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় তো দেয় বটেই, উপরন্তু শ্রমবিভাগের বৃহত্তম সংস্করণ বোধহয় বহুলাঙ্গ জীবলোকে। এমনকি জড়জগতেও কেউ কেউ শ্রম-বিভাগের সন্ধান পেয়েছেন ; এবং অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে অভিব্যাপ্ত বস্তুর আদিম অবিচ্ছেদ কেবল আয়তনগুণেই আজ অসংখ্যাত নীহারিকায় বিদীর্ণ। কিন্তু শুধু বিশ্লেষ শ্রমবিভাগের সার কথা নয়, যোগ-বিয়োগের তাৎকাল্যেই তার প্রতিষ্ঠা ; এবং বস্তুবিশ্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতিসাম্য ঘটলেও, তার দুর্নিবার বিস্ফোটন শেষ পর্যন্ত যদি সত্যই প্রত্যেক

তারাপুঞ্জকে নিঃসঙ্গ ক'রে তোলে, তাহলে জড়ের রাজ্যে সংযোগপ্রসূত শ্রমবিভাগের সুব্যবস্থা খোঁজা আমার বিবেচনায় পণ্ড শ্রম। কারণ শ্রমবিভাগ আর গৃহবিবাদের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান বর্তমান; এবং যে-আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখে, সে নিজের তথা সমাজের শত্রু।

স্বাবলম্বীর সময়নষ্ট যেহেতু অবশ্যম্ভাবী, তাই সমাজভুক্ত জীব বিভিন্ন বৃত্তির স্বাতন্ত্র্য মানে; এবং অনধিকার চর্চার লোভ সে সামলায় শুধু এই প্রত্যাশায় যে আপনার গতর খাটিয়ে অপরের একটা প্রয়োজন মেটালে, অন্যেরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার সকল অসুবিধা ঘোচাবে। অর্থাৎ যথোচিত শ্রমবিভাগে অন্যায় প্রতিযোগের স্থান নেই; এবং মোটর চালাতে পারে না ব'লে, কৃষক লাঙল ধরে না, হলচালনায় নিজেকে স্বভাবত ব্যুৎপন্ন ভেবেই সে যখন স্বেচ্ছায় মাটি চষে, তখন চীন-জাতি শৌর্যের অভাব-বশত তিতিক্ষার মন্ত্র জপে না, অন্তঃপ্রেরণার প্ররোচনায় সৌজন্যকে পৈশুন্যের চেয়ে শুভঙ্কর জেনেই তারা বর্বরদের আস্ফালন যথাসাধ্য সয়। তবে নিরুপায় কবি তো সওদাগরী অফিসের খাতা লিখতে বাধ্য বটেই, চীনেরাও বন্দুক ছুঁড়তে অপারগ নয়; এবং সে-অবস্থায় ডায়ালেক্‌টিক্ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যতই সহজ ঠেকুক, সভ্যতা যে প্রাগ্রসর এ-রকম মন্তব্য কেমন যেন বেসুর শোনায়। ফলত আজকাল অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে মার্ক্‌স্ হয়তো হেগেল্-কে ঠিক পায়ের উপরে দাঁড় করাতে পারেননি, বরং সেই চেষ্টায় আপনি উল্‌টে পড়েছিলেন; এবং সম্ভবত সেই জন্যে তিনি বোঝেননি যে জগতে সত্যই যদি ডায়ালেক্‌টিক্ খাটে, তবে তার গতি বিরোধ থেকে সমন্বয়ে, অথবা দুই থেকে একে, নয়, তার শ্রেঢ়ী অখণ্ড থেকে খণ্ডে, শৃঙ্খলা থেকে সংঘাতে, স্বভাব থেকে অভাবে। অর্থাৎ যে-নিয়মে জীবকোষ নিরন্তর বাড়তে পায় না, একটা প্রাঙ্‌নির্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছে দু ভাগে ভেঙে পড়ে, সেই বিধির অনুসারেই জাতি তথা ব্যক্তির প্রাথমিক একাগ্রতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধির জন্ম দেয়; এবং সেই দ্বন্দ্বের দোষে জাতির বেলা বর্ণাশ্রম যেমন শ্রেণীসংঘর্ষে বদ্‌লায়, তেমনই ব্যক্তির—বিশেষত শিল্পী ব্যক্তির—ক্ষেত্রে কল্পনা হারায় সঙ্কল্পে।

কেন এমন ঘটে, তার নৈয়ায়িক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার অজ্ঞাত; এবং আমি যেকালে স্বয়ং হেগেল্-এর অপ্রমেয় প্রত্যয় মানতে অসম্মত, তখন আমার স্বপক্ষে সোরেল্-এর সাক্ষ্য নিশ্চয়ই কেউ শুনতে চাইবেন না। কিন্তু সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, সুখ-শান্তির প্রলোভনে চোখ বুজে, ধনিকদের চক্রান্ত-প্রসূত রামরাজ্যের মায়া কাটিয়ে, রূপকথার নিয়োগে প্রতিনিয়ত মাতিয়ে বেড়ানো শ্রমিকদের কর্তব্য হোক বা না হোক, ক্ষীয়মাণ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রোগনিদানে সোরেল্-এর মতামত খুব সম্ভব অকাট্য; এবং স্টালিন্-ভক্তির আতিশয্যে দু-চার জন সম্প্রতি সোরেল্-কে উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেলেও, গত কয়েক বছরের রুষ রাষ্ট্রদ্রোহীদের নাম, সংখ্যা ও স্বীকারোক্তি দেখার পরে অন্তত বস্তুনিষ্ঠেরা আর বলবেন না যে ত্রিভুজই জীবযাত্রার যথাযথ প্রতিকৃতি, অথবা তার ধর্ম বাদী ও বিবাদীর বিসংবাদ-মোচন। কারণ প্রাণপ্রবাহ আসলে একটা ঘূর্ণাবর্ত, যার কেন্দ্রে অবস্থিত নাস্তি আর পরিপার্শ্বে বর্তমান অসেতু শূন্যতা; এবং চক্রচর সমাজ শুধু অর্ধপথে গন্তব্যবিমুখ নয়, এমনকি অন্তর্বিক্ষোভের প্রাবল্যে তার খানিকটা যদিও মাঝে মাঝে ছিটকে যায়, তবু সে-ছিন্নাংশ যেহেতু ভ্রমিমূলক, তাই তার কলামাত্রেই একাধারে আত্মস্থ ও আত্মবিস্মৃত। সম্ভবত সেই জন্যে ক্যাথলিক্ ও প্রটেস্ট্যাণ্ট্-এর প্রাথমিক মনান্তর কালক্রমে ব্যাপকতর ধর্মানুষ্ঠানে সন্ধি পাতেনি, তাদের ব্যবধান যুগে যুগে এত বেড়েছে যে ইদানীং তারা পরস্পরের অস্তিত্ব ভুলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে নব নব সংঘাতের সৃষ্টি করছে; এবং ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক আজ তো বিলুপ্তপ্রায় বটেই, উপরন্তু সমানাধিকারে উভয়ের সমন্বয় দূরের কথা, সম্প্রতি ধনতন্ত্র যেমন অবাধ প্রতিযোগ ও একচেটিয়া ব্যবসার দোটানায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তেমনই সমাজতন্ত্র আবার ট্রট্স্কি-স্টালিন্-এর দ্বৈরথযুদ্ধে কণ্ঠাগতপ্রাণ।

সুতরাং নাৎসী পাশবিকতা হয়তো চির দিন টিকবে না; এবং আজ অন্ধ বা অসবর্ণ উদারনৈতিকেরা না বুঝে তাকে যতই প্রশ্রয় দিন, কাল পুনরুজ্জীবিত রোয়েম্ নিশ্চয়ই তার সর্বনাশ সাধবে। হয়তো তার পর আসবে কোনও কনিষ্ঠতর ব্যষ্টির পালা; এবং সে-আপদ চুকতে না চুকতে

ঘুণ ধরবে পশ্চাদ্বর্তী পর্যায়ের সর্বাঙ্গে। কারণ বুঝি বা এণ্ট্রোপি-ঘটিত তাপমৃত্যুতে শুদ্ধ এ-বৈকল্যের শেষ নেই; এবং সংসারের বিশ্লেষ অব্যবস্থার চরমে পৌঁছেই থামবে না, এমনকি বৌদ্ধ সংবর্তের মহাশূন্যেও ঘুরে বেড়াবে নিরবলম্ব বৃত্তি। ইতিমধ্যে সেই অবশ্যম্ভাবী পরিনির্বাণের অকালবোধন যাঁদের অনভিপ্রেত, পরের স্বভাব শোধরানোর বৃথা চেষ্টায় প্রগতিও তাঁদের প্ররোচিত করবে না: তাঁরা জানবেন যে জনসাধারণকে এক ছাঁচে ঢেলে সাজালেও, যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘোচবার নয়, তখন আত্মম্ভরিতার চেয়ে আত্মচিন্তাই নিশ্চয় বেশী লাভজনক; এবং প্রতিবেশীর উপরে গায়ের জোর ফলিয়ে তাকে যদিও দাবানো যায়, তবু তার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত আপন স্বায়ত্তশাসনের আশা বিড়ম্বনা। আমার বিশ্বাস সাযুজ্য নয়, এই দ্বৈতবোধেই সাম্যবাদের উৎপত্তি; এবং যে-মানুষ সত্যই নিজেকে চেনে, তার কাছে যেমন স্বীয় ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সে এ-জ্ঞানেও বঞ্চিত নয় যে জীবমাত্রেই বৈশেষিক ব'লে, তার বৈশিষ্ট্যও অবশ্যস্বীকার্য। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই সম্পূর্ণ একক, আমরা অদ্বিতীয় শুধু নাতিসামান্য ক্ষমতার জোরে; এবং ক্ষমতাবিশেষ যেহেতু বিশেষ অক্ষমতার প্রতিবাদী, তাই সর্বত সকলের মূল্য সমান, ব্যষ্টিও আসলে সাধারণ দোষ-গুণের দেশ-কালগত সমষ্টি। পক্ষান্তরে আত্মদর্শন আত্মাধিকারের পরিপন্থী; এবং তার কারণ এই যে যত ক্ষণ পর্যন্ত আত্মপ্রসাদ না চোকে, তত ক্ষণ যথার্থ আত্মপ্রত্যয়ের উপলব্ধি অসম্ভব।

মানুষ যখন দেখে যে তার ইন্দ্রিয়ার্থ আর অন্য সকলের ইন্দ্রিয়ার্থ তুল্য-মূল্য, পার্থক্য শুধু অবস্থানে, সে যখন জানে যে তার জন্মসংস্কার আর অন্য সকলের জন্মসংস্কার মুখ্যত অনুরূপ, প্রভেদ কেবল সেই সংস্কারসমূহের পদবিন্যাসে, এবং এই রকম বিশ্লেষণে একটার পর একটা উপসর্গ খসাতে খসাতে সে যখন আপনার মূল ধাতুতে গিয়ে পৌঁছায়, তখন আর তার সন্দেহ থাকে না যে সে এমন একটা অনির্বচনীয় আদিভূতের সম্মুখীন যা তার আয়ত্তের বাইরে, যাকে সে কোনও দিন মানেনি, অথচ যার বাধা তাকে আজীবন যথেচ্ছাচারে বিরত রেখেছে। অতঃপর তার চোখে প্রকৃতি-পুরুষের একাকার ঘটে, স্বরূপ বিশ্বরূপে বদ্‌লায়; এবং সে

বোঝে যে এ-দুটোর একটাও যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকে অন্যোন্য-নির্ভর, তাই ব্যক্তির পক্ষে অর্জন-বর্জন সমান, এমনকি শুধু মরমী সাধক কেন, মানুষমাত্রেই ম'রে বাঁচে। কিন্তু এই আত্মবিসর্জনজাত আত্মোপলব্ধি যদৃচ্ছার দান নয়; এবং তাতে যদি কায়মনোবাক্যের সমর্থন না থাকে, তাহলে সে-ত্যাগ যেমন বৃদ্ধের চিত্তবৃত্তিনিরোধের মতো শোচনীয়, তেমনই ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির পরিণাম ম্রিয়মাণ সভ্যতার মতো লজ্জাকর। বলা বাহুল্য যে ফাশিস্ট্ রাষ্ট্র যেহেতু একাধারে বহির্জগতের প্রতিপালন-সাপেক্ষ ও অন্তর্জগতের দৌর্বল্য-সূচক, তাই তার সংস্রবে পৃথিবীর বিসংবাদ কমছে না, বরং অনৈক্য বাড়ছে; এবং কম্যুনিস্ট্-রা নিত্যের মর্যাদা দেয় না, মিথ্যা মিথ্যা ভাবে যে নিমিত্তের তারতম্য ঘুচলেই, ব্যক্তিত্বের বিষ ফুরাবে। তবে তারা হয়তো জানে যে স্বভাবারোপিত সাম্যও অবিবেকীর প্রাপ্য নয়, সামবায়িক সঙ্কল্পের পুরস্কার; এবং তৎসত্ত্বেও সার্বভৌম প্রভুত্বের মায়া কাটিয়ে, স্বাবলম্বনে ব্যক্তি ও জাতির জন্মগত অধিকার তারা স্বীকার করতে পারে না বোধহয় এই জন্যে যে তাদের বিবেচনায় তারাই অনিবার্য প্রগতির অভ্রান্ত অগ্রদূত। কিন্তু বিশ্বমানবের দীক্ষা মনুষ্যধর্মের অমর জপমন্ত্রে; এবং মানুষের মধ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ শুধু উভবলী নয়, একটার বাদে অন্যটা নিরর্থক।

[ ১৯৩৮ ]

সমাপ্ত